ছদ্মনাম

গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর

প্রাপ্তিস্থান
দি বুক হাউস
১৫ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৯

ছদ্মনাম

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক

চণ্ডীচরণ সেন

পূর্বাচল প্রকাশনী

১৫, কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান

দি বুক হাউস

১৫, কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ

পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

সমর গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রাকর

পি. বি. প্রেস

৩২ই, ল্যান্সডাউন রোড

কলিকাতা-২০

মূল্য

চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

অনেক কাল আগেকার কথা।

ঘাটবাজারের কবরখানার পাশ দিয়ে ফিরছিলাম।

রাত্রি তখন গভীর।

নোনাতলার ডিপোয় ফিরতি ট্রামগুলো অনেক আগেই ফিরে এসেছে।

মল্লিকবাজারের গায়ে-লাগা পানের দোকান—যেটা অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে—তারও ঝাঁপ বন্ধ।

তাহলেই বুঝতে পারছেন রাতের বহর কতখানি!

কবরখানার ফুটপাথে আমিই বোধহয় একমাত্র পথিক।

তাই বা বলি কেন?

সারা লোয়ার সার্কুলার রোডে জনমানব নেই। একটি হ্যাক্‌নি গাড়ীও নয়।

আমি যে হ্যাক্‌নির খোঁজেই ছিলাম; তাই হলপ করে বলতে পারি একটি গাড়ীও ছিলনা লোয়ার সার্কুলার রোডের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত।

ট্রাম কোন্ কালে বন্ধ হয়ে গেছে।

রাত্রি অনেক।

গাড়ী ছাড়া ফেরারও উপায় নেই!

মাঝপথে ঠিকে গাড়ীটা ছেড়ে দেবার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিলাম।

রিক্‌সার কথা মনে করিয়ে দিতে চান বুঝি?

দেখুন, রিক্‌সায় আমি চড়ি না।

এর হেতু কি, তাই জানতে চান?

এইটুকু জেনে রাখুন তাহলে, বর্তমান কাহিনীর জমিতে এই হেতু তার শেকড় গাড়েনি; আর তা থেকে গজিয়েও ওঠেনি।

তবে—? এই প্রশ্ন তো!

ওটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার! এর যথাযথ কারণ আজ গোপন করতে হবে আমাকে—তবে আরও একটু বলতে বাধা নেই; ওই ঘটনার সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের একটা বড় বাজি হারজিতের কাহিনী জড়িয়ে আছে। সেটা অবশ্য বর্তমান ঘটনার অনেক আগেকার কথা; তখন থেকেই রিক্সায় চড়া ছেড়ে দিয়েছি।

দেখলেন তো—বয়স বাড়ার দোষ কি?

বয়স বাড়লেই মানুষ কেমন মুখ-আলগা হয়ে পড়ে। এত কথা বলার কোনো প্রয়োজনই ছিলনা;—এর কারণ যে আগেই বলা হয়ে গেছে!

সার্কুলার রোড জন মানবহীন।

রাস্তার দুপাশে কেবল আলোর সারিগুলো জেগে আছে, রাত্রি শেষ হওয়ার অপেক্ষায়!

তাহলেই বুঝতে পারছেন, পথে একটিও রিক্সা ছিল না, আর সেই কারণে এ প্রসংগ তুলে আমাকে খোঁচা বা বাধা দেওয়ার কোন হেতুও ছিলনা।

হ্যাঁ, মূল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক এবার।

বাটবাজারের বেরিয়্যাল গ্রাউণ্ডের পাশ দিয়ে চলেছি; ফেরার কোনো তাড়া নেই।

রাত্রি গভীর; ফেরার তাড়া নেই তবু!

কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

তা—না হবারই কথা!

তবে শুনুন, রাত্রির একটা নির্ধারিত প্রহর পর্যন্ত দেরী হওয়ার কারণ অপরকে দেওয়া বা দেখান চলে। কিন্তু সেই প্রহর যখন অতিক্রান্ত হয়ে রাত্রি নিজেই ঝিমিয়ে পড়েছে, সেই জাতীয় কোনোও এক প্রহরে আপনার রাত্রিবাসের জায়গায় আপনি ফিরলেন—ভাগ্যক্রমে যদি বা জবাবদিহি করার মত কোনো আপন জন

থাকে আপনার, এ ধরণের বিলম্বের ওজুহাত দেখাতে যাওয়া একেবারেই মুখ্যুমি; কারণ, কোনো ওজুহাতই যে এর নিরাকরণ করতে পারে না!

ঠিক এমনি ঝিমিযেপড়া এক রাতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম।

কোনোও তাড়া নেই, কোনোও উদ্‌বেগ নেই কারো জন্যে! যে সব ওজুহাতেব কথা বললাম, তার যত গণ্ডী আছে, মাত্রা আছে—তাদেব নাগালেব বাইরে চলে গেছি একেবারে।

মন একেবারে উদ্‌বেগমুক্ত। কোনোও সংকোচ নেই, দ্বিধাও নেই! ইচ্ছে হলে নির্বিকাবও বলতে পারেন, তাতেও আপত্তি করার কিছুমাত্র কারণ নেই আমার!

কল্পনা কবার চেষ্টা ক'বে দেখুন একবার—একটি গভীব রাতের ভেতব দিয়ে, সম্পূর্ণ উদ্‌বেগমুক্ত নির্বিকার মন নিয়ে এই মহানগরীর একটি ইতিহাস জড়ানো পথ ধবে এগিয়ে চলেছি; কোনো মানুষ নেই, প্রাণী নেই—সেই দীর্ঘ পথে!

সম্পূর্ণ একা।

পথেব ল্যাম্প-পোষ্টগুলো কেবল নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটিকে পেরিয়ে অপরটির কাছে এলাম; সেটিও পেছিয়ে পড়ল এক সময়ে—কারণ, মন্থর গতিতে যে আমি এগিয়ে চলেছি।

এভাবে নিঃসংগ পথ চলায় যে এত অদ্ভুত মাদকতা আছে সেই দিনই তা প্রথম অনুভব করি।

এই যে মাদকতা, এবই যেন মিঠে স্বাদ পাচ্ছিলাম; শুধু মনে নয় —দেহেও! সমস্ত স্নায়ু, শিরা, পেশী, ত্বক, অস্থি-মজ্জা—মানে, দেহের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগে; এক বুক জুড়োনো আরাম—এক নিবিড় তৃপ্তি!

হঠাৎ অনুমান হল, আমি যেন এগোচ্ছি না আর; এক পা ও এগোইনি এতক্ষণ ধরে। স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আছি।

ঘাটবাজারের কবরখানার রেলিং আঁকড়ে, সার্কুলার রোডের পুব ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নির্বিবাদে এতক্ষণ সময় কাটাচ্ছি।

বিস্মিত হলাম নিজের ব্যবহারে।

বিরক্তও হলাম নিজের ওপরে!

বিদ্রূপ করে প্রশ্ন করলাম নিজেকে

—কি হে, এত রাত্তিরে এখানে দাঁড়িয়ে আছ; ব্যাপার কি? মতলবই বা কি তোমার?

মনে হল, মতলব নিশ্চয়ই কিছু আছে, নয়তো কেনই বা এখানে আসতে যাব? আর দাঁড়িয়েই বা কেন থাকব এখানে এসে!

তবে, সেই মতলবকেই ঠাহর করতে পারিনি; কিন্তু পারিনি বললেই তো চলে না!

পারতেই হবে; ধরতেই হবে তাকে!

বোঝাপড়া না করে তাকে পালাতে দিলে চলবে না!

তাই তলব করতে হল মতলবকে। তাকে হুকুম করলাম

—আব দেরী নয়, রাত অনেক হয়ে গেছে; তাড়াতাড়ি বলে ফেলো তোমার উদ্দেশ্যটা!

নিজের মতলবের সংগে কি আপনার কোনো দিন মুখোমুখি দেখা হয়েছে?

হয়নি তো!

আমি জানতাম তা হয়নি।

কারণ সহজে আর সচরাচর এমনটি ঘটে না!

আমার জীবনেও এর আগে বা পবে ঘটেনি ঠিক এমন ধারা ব্যাপার।

এমন সুযোগও সারা জীবনে পাইনি আব। কেবল সেই দিনই এই অভূতপূর্ব সুবিধে ঘটেছিল!

সুবিধে নয়তো কি?

আপনার মতলবকে আপনি চেনেন না।

আপনার খেয়ালকেও আপনি জানেন না; তাই নয় কি?

এরা যদি তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খোলাখুলি কথা কইতে থাকে—তাকে অভূতপূর্ব সুযোগ বা অকল্পিত সুবিধে ছাড়া কি বলতে পাবেন আপনি?

তবে একটা কথা আগে থেকেই জেনে রাখা ভাল,—তা হল এদেব প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত, তা ছাড়া আর কিছু নয়।

এদেব প্রকৃতি কিন্তু ভারি বেয়াড়া!

কাবণ সব সময়েই এরা জানে যে কারও কেনা গোলাম নয় এরা।

আপনি হাঁক দিলেন,—আব এবা এসে হাজির হল—তা হয় না; কোনো দিন হয়নি; আর কোনো কালেও হবে না তা আমি হলপ করে বলতে পাবি।

আমাব মতলব কোনো তোয়াক্কাই কবল না আমার হুকুমের।

কোনো সাড়া নেই।

হ্যাঁ ও না—হুঁ ও না।

উদ্‌বেগমুক্ত ঝরঝবে মন আমার, তাই চট করে গলদটা ধরে নিতে পারলাম।

নিজেব মতলবকে উদ্দেশ কবে তাই বললাম

—বাবা মতলব, তুমি খুবই খেয়ালী মানুষ! তোমাকে হুকুম করি কেমন করে? তবে সম্বোধন যে ভাবে করে ফেলেছি তাতে বেয়াদপি আব বেয়াকুফি দুই-ই হয়েছে—কোনো সন্দেহ নেই তাতে! তুমি যদি গোসা করে থাক—মাপ চাইছি; আর নিজগুণে যদি না-ই করে থাক, তাহলেও বেয়াদপির জন্যে মাপ করো আমাকে।

কাজ হয়েছে মনে হল!

মাখনে-কথায় কি না হয়?

এমন গুছিয়ে প্রাণ-জল-করা কথা বলেছি, ফল নিশ্চয়ই পাব।

পেলামও তাই!

কানের কাছে অস্ফুট গুনগুন আওয়াজ শুনতে পেলাম যেন ; তবে শব্দগুলো মোটেই স্পষ্ট নয়।

অস্পষ্ট কথায় মনের দ্বন্দ্বই বাড়ে।

সারা জীবন ধরে দ্বন্দ্বের হাতে কত নাকানি-চোবানিই না খেলাম।

ওতে রাজী নই আর।

খাড়া, পরিষ্কার, স্পষ্ট কথা শুনতে চাই।

একটু ভারিক্কি গলায় বললাম

—আওয়াজ পাচ্ছি, ঠিক ধরতে পারছিনে কিন্তু! কথাগুলো পরিষ্কার করে বলো। তোমার কথাই যদি শুনতে না পাই, বুঝতে না পারি, তাহলে তোমার উপস্থিতির প্রয়োজনই বা কি থাকতে পারে ? দেখো, এছাড়াও আরও একটি অনুরোধ আছে আমার,—যদি অভয় দাও তো বলি।

উত্তর পেলাম এবার।

সে বললে

—বল, কি বলতে চাও তুমি !

কথা বলার ভংগী আর তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠতে হল।

এ যেন আমি নিজেই কথা কইছি !

সামঞ্জস্য ঘনিষ্ঠ হলেও পরে অবশ্য পার্থক্য ধরতে পেরেছিলাম ; আত্মপ্রতীতির পার্থক্য, সেই পার্থক্যই ছিল তার স্বরে।

খানিক ভেবে নিয়ে বললাম

—কেন যে তুমি আমাকে এখানে টেনে এনেছ, সেইটাই হল মূল জিজ্ঞাস্য বিষয় ; তবে আরও একটি প্রশ্ন আছে।

সে বললে

—বল কি প্রশ্ন তোমার।

—তোমার সংগে পরিচিত হবার সুযোগে নিজেকে ধন্য মনে করছি, সে কথা আগেই জানিয়ে রাখা ভালো ! যে পরিবেশে এই আলাপ, তা যেমনি অপূর্ব তেমনি বিস্ময়কর। তবে ঠিকভাবে বলতে

গেলে বলতেই হয়, ব্যাপার কিছু পরিমাণে তরল আছে এখনও ; একে দানা বেঁধে উঠতে সাহায্য কব না কেন।

—কেমন করে ?

প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত হলেও তাব জিজ্ঞাসার ধরণের আড়ালে এতখানি ওজন ছিল যে নিজেকে কেমন বিব্রত আর অসহায় মনে হল। উত্তবে বললাম

—পরস্পরের মধ্যে দেখা হলে তার সম্ভাবনা ঘটে না কি ?

উত্তব এল

—দেখা আমি দিতে পাবব না। তাতে আলাপ দানা বেঁধে উঠুক আব না-ই উঠুক। তোমাব খেয়াল-খুশী আব তাবই হরেক রকম হাংগামাব সংগেই তো সাবাটা কাল ধরে তাল দিয়ে চলেছি। চাক্ষুষ দেখা হলেই তুমি চিনে ফেলবে আমাকে। তাতে তোমাব সমূহ লাভ থাকতে পাবে—কিন্তু আমাব ক্ষতিব পবিমাণ খতিয়ে দেখেছ কি ?

একেবাবে জবর সওয়াল এ যে ?

ঠিক এভাবে জীবনে তো খতিয়ে দেখিনি কোনো কিছুই !

সত্যি কথা বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হয়, অপরের লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে আমবা নিতান্তই উদাসীন। সমাজে বাস করি বলে সামাজিক নিয়মে কিছু কিছু ভান করাব প্রবৃত্তি যোগাড় কবে নিয়েছি। আব, তাবই প্রয়োগ চালাচ্ছি প্রয়োজন মাফিক। অন্যের ক্ষতির কথা কতটুকুই বা চিন্তা কবি আমবা ? নিজেব লাভের সংগে অপবের ক্ষতি-বৃদ্ধি যতটুকু জড়িয়ে আছে, তারই মান বা মাপ এইটাই হল একমাত্র মাপকাঠি যাব সাহায্যে জীবনকে অনবরত মেপে চলেছি। বাইরে থেকে এর হদিস পাওয়া শক্ত—কারণ এ যে মনের চোরা কুঠুরির ভেতরে অহরহ ঘটে চলেছে—যে চোরা কুঠুরির খবর আমরা জেনেও জানিনে—আর জানলেও জানতে চাইনে।

এই তো গেল মনের খবর।

বাইরে তাকিয়ে দেখি, যাটবাজারের কবরখানার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

পরক্ষণেই মনে হল, এই নিশুত রাতে অবান্তর অবাস্তব আত্মবিশ্লেষী চিন্তা করতে নিশ্চয়ই আসিনি এখানে।

এই যে জীবন যাকে অবলম্বন করে বেঁচে আছি ; এই যে দেহ, যাকে অবলম্বন করে জীবন নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, তার কোনো চিহ্নই থাকবে না একদিন। কবরখানার এক প্রান্ত থেকে অপব প্রান্ত পর্যন্ত টানা রেলিংগুলোই তো তাব প্রমাণ—তারই সাক্ষী হযে দাঁড়িয়ে আছে এখানে।

এ দেহের চিহ্ন থাকুক আব নাই থাকুক তাতে বর্তমানেব কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই,—তবে মৃত মানুষদের জন্যে তৈবী এই সহবেব প্রান্তে কেন এলাম? কি করতেই বা এসেছি এখানে ?

সে জিজ্ঞেস করলে

—চুপ করে রইলে কেন ? তোমাব তলবেই এলাম এখানে আর তুমিই বোদা মেরে গেলে !

খোঁচা ছিল তার কথায়।

হজম করে নিতে হয়—নিলামও তাই ! জবাবে বললাম

—তোমাব কথাগুলো শুনতে হালকা হলেও আসলে ঠিক তাব উল্টো। জানো তো, মাথায় ভাবনাব জট নিয়ে ঘুবে বেড়াই সর্বদা। তোমার কথায় সেগুলো পাকিয়ে আবো জটিল হযে উঠছিল ; সে ভাব অবশ্য কিছু পবিমাণে কাটিয়ে নিয়েছি বৈকি !

সে খানিক চুপ করে বইল। তাবপবে আবাব কথা কইলে

—অমিতাভ, তুমিই যে উল্টো কথা কইলে ! ওই জটগুলোই তো তোমার শত্রু, তোমাব বুদ্ধির চোখে ঠুলি পরায়, দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়ায়—তুমি পথ ঠিক করতে পার না তখন। ওবাই দিক্-ভ্রান্ত করার, দিক্-ভ্রষ্ট করার বড় বড় এক একটি গেরো ! এদের উৎপাতে তুমি যখন বিপর্যস্ত, কে সাহায্য করে তোমাকে ? আমি ছাড়া আর কেউ

নয়! আমিই তোমাকে বুদ্ধি যোগাই, তোমার কাছে নতুন উপায়ের দরজা খুলে দিই; আমার কাছ থেকেই নতুন নতুন পথের ইংগিত পাও তুমি। তোমার কূটবুদ্ধি-জীবনে আমি কত বড় সংগী আর সহায় তাকি তুমি জান না?

কথা শুনে মনে হল আত্মসচেতন ভাব তার কমে এসেছে; তাকে খুশী করাব জন্যে বললাম

—তাই তো তোমাকে এই গভীব রাতে স্মবণ কবেছি'

সেও খুশী হয়ে বললে

—তোমাব ডাকে আমিও সবাসবি হাজির হলাম তাই!

আমি জবাব দিলাম

—সে কথা ঠিক! তবু চেয়ে দেখ একবার, সামনেব এই এত বড় সার্কুলাব বোড ছেড়ে মৃত মানুষদের জন্যে তৈবী করা—মৃত আর পুরোনো এক সহবেব প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। কেন যে এসেছি এখানে তা ঠিক কবাব শক্তি নেই। সন্দেহ হচ্ছে, ওই পথ আমাকে আর টানতে পারছে না—তাই সবিয়ে দিয়েছে ওব চৌহদ্দি থেকে।

কাছাকাছি কোনো গাছেব ওপর থেকে অপ্রীতিকব শব্দ শোনা গেল; কথাব গতিতেও তাই ছেদ পডল হঠাৎ।

সে আশ্বাস দিয়ে বললে

—ভয় পাবাব মত কিছু নেই অমিতাভ! এখানে জীবিত মানুষ বাস কবে না; এ যে মৃতের বাসস্থান! নিশাচব মানুষ এদিকে আসে না। আলাদা উদ্দেশ্য তাদের; তাই গন্তব্যও আলাদা—কথাব খেই হাবিও না তুমি; বলে যাও যা বলতে চাইছ।

নিজেকে শক্ত কবে নিয়ে বললাম

—শংকিত হবাব কি-ই বা আছে জীবনে? তাছাড়া শংকাহরণ তুমি যখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছ তখন তো আর কথাই নেই! কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এই এত বড় পথ আমাকে ঠেলে দিয়েছে তার সীমানা থেকে বাটবাজারের মরা সহরের প্রান্তে; আর এদিকে

দেখি—সে সহরেরও কপাট বন্ধ। এখন তুমিই পথ বল: তোমার ইংগিত শান দেওয়া ছোরার মত তীক্ষ্ণ করো,—স্পষ্ট করে দাও তোমার ইশারা।

সে চুপ করে রইল।

কিন্তু সে যে খুশী হয়েছে এ অনুমানে ভুল নেই; তাই তো সে কোনো প্রতিবাদ করেনি—এতক্ষণ চুপ করে আছে!

আমাদেব নির্বাক মুহূর্তগুলোর ফাঁকে সময় এগিয়ে চললো।

অনেক পরে সে কথা কইলে আবাব।

—আমি তো চিবকালই যোগান দিয়ে চলেছি। মনে করে দেখ একবাব তোমাব সেই ছেলেবেলার দিনগুলো! সেখান থেকে আবম্ভ কবে বর্তমানেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এগিয়ে এস,—পরিস্কাব হয়ে যাবে, স্বচ্ছ হয়ে যাবে অতীত আব বর্তমান।

চুপ করে বইলাম। সে অতীতেব পর্দাখানাব দিকেই যেন আঙুলেব ইংগিত দিয়ে বয়েছে; বর্তমানকে নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই তার।

সে আবাব বললে

—ভেবে দেখ না একবাব, কোথা থেকে কি হল? কেমন কবে এমন হল? ভেবে দেখ কথাগুলো! নিজেই বুঝতে পাববে সব। মনে পডে না সেদিনেব কথা? সেই প্রকাণ্ড বাড়ীব নির্জন ছাদ; তুমি ছাদের আলসেব ধাবে দাঁড়িয়ে আছ—গলিতে দাঁড়িয়ে গান গাইছে শশী বোষ্টুমী। আশ্বিনেব আকাশে অগুনতি ছেঁড়া আর তুলোট মেঘেব টুকরো—সেই সংগে ভাগীরথীর কূলছাপানো কলোচ্ছ্বাস!

নীববে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার আঙুলেব ইংগিত যে অতীতের দিক থেকে সে সরিয়ে নেবে না—তা তো অনুমান করেছি আগেই।

সে বহুকালের ফেলে আসা জীবনের কথা কইতে আরম্ভ করেছে; বর্তমানের সংগে ওই জীবনের খেই জুড়ে দেবার উদ্দেশ্যেই বোধহয়! কিন্তু সেকাল আর একালের মধ্যে এই যে এত বড় ফাঁক

হাঁ করে আছে, তা কি পুরোনো আর সূক্ষ্ম সুতোর খেই টেনে ভরাট করা চলে ? সে কি জানে না বা বোঝে না একথা ?

অস্পষ্ট গলায় আবার সে কথা কইতে আরম্ভ করলে

—তারপরে, সেই অন্ধকার রাত্রি। সেই খোয়াওঠা পথ। পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছ্যাকড়া গাড়ীর কর্কশ আওয়াজ—আর বুকের ভেতরে ব্যথার নির্মম আলোড়ন ; মনে পড়ে না অমিতাভ ?

তাকে বাধা দিয়ে বললাম

—কোনো দরকার করে না , কোনো প্রয়োজনও নেই পুরোনো কবর খোঁড়ার। বর্তমানের সাথে ও কাহিনীর কোনো যোগই নেই ; নিরর্থক কথার জের টানায় ছেদ টেনে দাও তুমি।

তার গলার স্বরে চাপা হাসির শব্দ উঠল , সে বললে

—বেশ, তবে তাই হোক। ওখান থেকে সরাসরি বদরিকার কাছেই এগিয়ে এস তাহলে।·· কে বদরিকাকে তোমার সামনে এনে দিলে সেদিন ? ভেবে দেখো ! অতবড় বেহেড আর পাঁড় জুয়াড়ী, অমন দিলখোলা মানুষ, অমন বেপরোয়া গোঁয়ার—এর আগে কি দেখেছিলে কখনও ?

এ প্রশ্নেরও উত্তর যোগাল না, চুপ করে রইলাম।

সে কিন্তু নিজের খেয়ালেই বলতে লাগল

—কখনও না ; তুমি কখনই দেখনি এমন একটি জীব। কি বুদ্ধি যুগিয়ে দিলাম তোমাকে ? কোন্ অস্ত্র তুলে দিলাম তোমার হাতে ? কি ইশারা করে ছিলাম সেদিন ? ভেবে দেখ একবার অমিতাভ !

কানের কাছে প্রশ্নগুলো ঝনঝন করে উঠল। এতগুলো তেতো আর তীক্ষ্ণ আওয়াজ এক সাথে জড়ো হয়ে কানের কাছে আর কখনও বেজে ওঠেনি। কি শান দেওয়া জিজ্ঞাসা তার !

সে বললে

—কথা কইছ না যে অমিতাভ ?

বললাম

—কি বলব বল !

সে বললে

—মনে নেই ? জুয়াব ছোবাখানা তুলে দিলাম তোমার হাতে ; কানে কানে বললাম—বদরিকাব মাবণ অস্ত্র দিচ্ছি, কাজে লাগিও ; অপব্যবহার করো না যেন।

এলোমেলো কথাগুলোব খেই হারিয়ে গিয়েছিল ; কিংবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়াও অসম্ভব নয়—চটক ভাঙলে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস কবলাম

—কাব ?

রূঢ় গলায় সে ধমক দিয়ে বলে উঠল

—বদরিকার !

আবার বদরিকাব কথা ?

বিষিযে উঠল, বিবক্ত হয়ে উঠল সারা মন।

কেনই বা তা হবে না ?

এই যে অবক্তব্য মানসিক যন্ত্রণাব মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, এর মূলে তো বদবিকাই বয়েছে। তাবই নির্লজ্জ শঠতায় একান্ত বিব্রত হয়ে ঠিকে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে এই নির্জন কববখানাব প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি।

কিন্তু সত্যিই বদবিকার নামে যাদু আছে !

ওই নামেব শব্দটুকু কানে বেজে উঠতেই চোখের ওপবে ভেসে উঠল তাব মুখের ছবিখানা। রুক্ষ, তামাটে বাবরি-ছাঁটা চুল, তাতে পাক ধরেছে। খাড়া নাক—তাবই ফুঁপ্‌নি দুটোব পাশ থেকে দুটো গভীর রেখা চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরিষ্কাব ক্ষৌরিত মুখ ; এক ফোঁটা লাবণ্যের বালাই নেই তাতে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় আর চকচকে। ওর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে জুয়ার হাপর চলে। মুখে উর্দু বয়াতের ছড়াছড়ি ; আর ঠোঁটে লক্ষ্ণৌ-ই গানের শিস্।

সে জিজ্ঞেস করলে

—আবার চুপ মেরে গেলে কেন, এত ভাবছই বা কি ?

উত্তর দিলাম

—বদরিকার চোখ দুটোর কথা।

বদরিকার চোখ ?

ভারি শক্ত অনুমান করা—কি আকর্ষণ লুকিয়ে আছে তার চোখে।

চুম্বক জড় পদার্থ লোহাই টানতে পারে ; বদরিকার চোখে কিন্তু মানুষ টেনে নেওয়ার শক্তি লকিয়ে আছে—আপাত দৃষ্টিতে যদিও সে চাহনি ঘোলো, ভ্যাপসা আর অর্থহীন বলেই মনে হয়।

অতিরঞ্জন বলে এ কথা উড়িয়ে দেবেন না যেন !

প্রথম দিনের সাক্ষাতেই এ সত্যটুকু আবিষ্কার করেছিলাম বারাকপুরের টার্ফে।

বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে দিন সেটা আমার জীবনের।

আপসেটের উটকো খেলায় পকেটে মোটা অংকের মুনাফা ঢুকেছিল ঠিকই ; তবে বাইরের জগতে কুয়াশা আর মেঘের জাল কাটিয়ে সূর্য যেমন সতেজ হয়ে উঠতে পারেনি, তেমনি জোরদার আপসেটের লাভজনক ফলও মোটেই তাজা করে দেয়নি আমার মনকে।

কেমন বিষণ্ণ আর ঘোলাটে ভাব !

পরের খেলার কথাই বোধহয় চিন্তা করছিলাম।

মনে কিন্তু সাড়া নেই কিছুরই। এ অবস্থায় নতুন খেলার উৎসাহ খুঁজে পাওয়া শক্ত বৈকি ! কেমন যেন এক ঝিমনো ভাবের মধ্যে আটকা পড়ে গেছি।

পেছন থেকে কে তার উপস্থিতি জানালে।

জিজ্ঞাসু ভাবে ফিরে দেখতে হল। দেখলাম, আগন্তুক কিন্তু অপরিচিত। তার মুখে চোখে জড়তার ছাপমারা।

জিজ্ঞেস করলাম

—কিছু বলবেন নাকি ?

জড়তা মেশানো সুরেই আগন্তুক বললে

—অকারণে বিরক্ত করবার জন্যে মাপ করবেন।

বললাম

—বিরক্তির কি আছে ?

সে যেন আশ্বস্ত হল, আর বললে

—কনগ্র্যাচুলেশনস্ জানাতে এসেছিলাম—

বাকি কথাটুকু জড়তার জন্যেই বোধহয় শেষ করতে পারলে না।

আমি বললাম

—ভাল, ধন্যবাদ আপনাকে।

নিজের পরিচয় দিয়ে সে বললে

—বাড়ী আমার লক্ষ্ণৌয়ে ; নাম বদরিকা উপাধ্যায়।

নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে।

হাত ধরে আবার সে মাপ চাইলে উপযাচক হয়ে আলাপ করতে আসার জন্যে ; তারপরে জিজ্ঞেস করলে

—আপনিই তো মিষ্টার চ্যাটার্জি ?

এযে দেখি আমার নামেরও খোঁজ নিয়েছে ! খবরাখবর জোগাড় করেই তাহলে হাজির হয়েছে এখানে ? ব্যাপার সুবিধের নয় নিশ্চয়ই !

মুখে কিন্তু নকল হাসির ভাব টেনে বললাম

—হ্যাঁ ; খুশীই হলাম মিষ্টার উপাধ্যায় আপনার সংগে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে ··

এগুলো তো সামাজিক ভদ্রতার মুখোশ ! বলতে হয় তাই বলা ; খুশীর ভাব টেনে দেখাতে হয়—তাই দেখানো ; এর বেশী কিছুই নয় !

মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে দিনের সেই স্যাতসেঁতে ভাব ঢুকে কেমন বেতরো করে দিয়েছিল। জানিনে, এর তলায় কোনো লুকানো চিন্তার স্রোত বইছিল কি না, তবে এক উৎসাহহীন আচ্ছন্নতা মনের চারিদিকে দেওয়াল খাড়া করে দিয়ে বাইরের সব কিছুতেই

একটা অনাসক্তি আর উদাসীনতা এনে দিয়েছিল। তাই আমল দিতে খেয়াল হয়নি: মনও খুঁটিয়ে দেখতে চায়নি—কে-ই বা পরিচয় প্রার্থী হয়ে এল, এসে কনগ্র্যাচুলেশনস্ জানালে বা করমর্দন করলে। এত চুলচেরা বিচারের দরকার ছিল না; কারণ, আগন্তুক আগন্তুকই—তার বেশী কিছুই নয়!

দৃষ্টি আটকে গেল হঠাৎ।

ভাল করে চেয়ে দেখতে হয়!

কি দেখলাম জানিনে, তবে এটুকু বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি সেদিন যে অত বড বড়, ভাসা ভাসা আর নির্জীব চোখ ইতিপূর্বে পুরুষ মানুষের মুখে আমি দেখিনি।

সত্যি দৃষ্টি টেনে রাখার মতই চোখ দুটো।

কিন্তু নিশ্চেষ্ট ভাবেই তাকিয়েছিল বদরিকা। ওই দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করাই ছিল যে কোনো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; দ্বিতীয় দফে নজর ফেলে বুঝে নিলাম কোনো ভাষাই কিন্তু বলে না ওই ভাসা-ভাসা দুটো চোখ।

মুখ বুজে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বাড়ে বৈ কমে না।

বদরিকাই এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে অব্যাহতি দিয়ে কথা কইলে

—খেলা ঠিক করেছেন কিছু? কোন্ ঘোড়ার ওপরে খেলবেন মিষ্টার চ্যাটার্জি?

এক কথাতেই ধরা পড়ে গেল আগন্তুক; ঢাকা-চাপার পথ রইল না আর! অনুমানে কোনো অসুবিধে নেই যে আগন্তুক সংকেত-লোভী। তাই নিজের উদ্দেশ্য গোপন করে বলতে হল

—খেলব কি না তা-ই ঠিক করে উঠতে পারিনি এখনও।

বদরিকার ভাসাভাসা চোখে পলকের জন্যে তরংগ খেলে গেল; তা খেলাই স্বাভাবিক—কারণ বদরিকারই চোখ তো! বদরিকাও যে বিস্মিত হয়েছিল আমার কথা শুনে।

কিন্তু পলকের মধ্যে সেই স্বল্লায়ু তরংগ মিলিয়ে গেল আবার। বদরিকার গলার আওয়াজও নিস্তেজ শোনাল; সে জিজ্ঞেস করলে

—কেন? র‍্যাফিকে ব্যাক্ করছেন না আপনি?

ছোট 'না' এর ভেতর দিয়ে জবাব শেষ করে দিলাম। বাড়ালেই কথা বাড়ে; তখন আবাব তা বন্ধ করাব পথ মেলা শক্ত! দরকাব নেই উড়ো আপদ জুটিয়ে।

বদরিকা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। এই রূঢ় প্রত্যাখ্যান গায়েই মাখলে না সে। উদ্দেশ্য কিন্তু এবই মধ্যে হাসিল হয়ে গিয়েছিল তার; আমার উৎসাহ-হীন মনে সে কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছে। তাব জোলো আর ভ্যাপসা চোখ দুটোর ওপরে—তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও কৌতূহল আব আকর্ষণ দুই-ই জাগিয়ে নিয়েছে বদবিকা এই অল্প সময়েব মধ্যে।

মৌন মুহূর্তের ফাঁকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম তার চোখে। মনে হল, একেবারে নির্জীব চোখ তার—এতটুকু প্রাণ নেই; মরা মাছের দৃষ্টি ফুটে আছে তাতে।

কৌতূহল থেকে উৎসাহ আর উৎসাহের আড়ালে করুণা উকি দিতে আবম্ভ করল এবার। মনে হল; ভারি দমে গেছে বেচারা! কতকটা উৎসাহ দেবাব জন্যেই বললাম

—ভালই হিট্ করেছেন তো; খেলুন না কেন, র‍্যাফির ওপরেই খেলুন, মিস্টার উপাধ্যায়!

সংক্ষিপ্ত 'না' বলেই বদরিকা তার জবাব সেরে দিলে। যেন তৈরি হয়েই ছিল সে। ভাবখানা যেন—আপনার 'না' এর জবাব—আমার 'না' দিয়েই সেরে দিলাম মিষ্টার চ্যাটার্জি; তার গলার স্ববে কিন্তু রূঢ়তার কোনো আভাষই প্রকাশ পেল না।

উৎসাহ কিন্তু সত্যিসত্যিই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এতক্ষণে, আর তারই তাগিদে বদরিকার চোখের দিকে আবার তাকাতে হল—শুধু

এইটুকু বুঝে নিতে যে, 'না' এর কোনো বিশেষ রঙ খেলে কি না ওই ভ্যাপসা চোখ দুটোয়।

সরাসরি তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু কোনো ভাষারই আঁচড় নেই। নির্জীব চোখ দুটোতে কেবল মরা মাছের দৃষ্টি ফুটে আছে।

স্বল্পমেদ, পাতলা গড়নের তামাটে রঙ বিশিষ্ট বদরিকা উপাধ্যায়, নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল; তার দিকে চেয়ে বোঝার কোনো উপায় নেই—তার ভাবধারার, তার ভাবনা-চিন্তার রকম-সকম।

আজ অবশ্যই বদরিকা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না!

সেদিন যা সম্ভব ছিল; আজ তা অবশ্যই নয়। অনেক পার্থক্যের ছাপ পড়ে গেছে একাল আর সেকালের মধ্যে!

বদরিকার চেহারার বেলায়ও ঠিক তাই-ই; অনেক পরিবর্তনের দাগ পড়েছে তাতেও।

দেখতে দেখতে, এক এক করে কত দিন কেটে গেল! কোনো হিসেব নেই—অবশ্য হিসেব রাখার কোনো দায়ও নেই কারুর; কেবল বয়সটাই বার্ধক্যের দিকে গড়িয়ে চলেছে এই যা!

সেদিন অবশ্য এমনটি ছিলাম না আমিও। অনেক তাজা-তাজা ভাব ছিল আমাব—আর বদরিকারও কাঁচা বয়স তখন; তার মুখের চামড়ায় এত ভাঁজ পড়েনি, কর্কশও হয়ে যায়নি। গালের ওপরে অমন লাঙলের ফালার দাগও ছিল না। চুল অবশ্য তার কোনো কালেই কালো নয়, তবে এমন খাপছাড়া বিশ্রী পাক ধরেনি, আর মেটে-পাটকিলে যে রঙটি এখন দেখা যায় তার চুলে তাও হয়নি। মুখে তার কিছু কমনীয়তা ছিল বৈ কি! একেবারে নির্লজ্জ মরুভূমির মত ন্যাংটো নয়। কাঁচা বয়সের চেকনায়ে বদরিকাও ছিল অনেক উজ্জ্বল।

এই যে বৈশিষ্ট্যের ছাপমারা বদরিকা, এর উপস্থিতিতে কিছু-পরিমাণে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়; আর ঠিক সেই কারণেই অনেক সন্দেহ যেন এক সংগে জড়ো হয়ে মনের

ফোকরগুলোয় উঁকি দিতে স্থুরু করল। তাছাড়া র‍্যাফিই যে আমার খেলা, এই অপরিচিত মানুষটিই বা তার সন্ধান জোটালে কি করে? মাত্র গত রাতে যে এ খেলার সিদ্ধান্ত আর হদিস সংগ্রহ হয়েছিল!

অতএব, সন্দেহ জাতীয় কোনো বস্তু যদি মনের আনাচে কানাচে দেখা দেয় তাকে দোষ দেওয়া চলে না!

নিছক এই কারণেই সন্দেহের কবলে বাঁধা পড়ে গেলাম।

এতবড় মাঠ!

চারিদিকে অগুনতি মানুষের জটলা।

উট্‌কো টাকা রোজগারের কি সুষ্ঠু আব ফেলাও ব্যবস্থা।

আপনি আমিও উট্‌কো রোজগারের উমেদার এখানে!

কথাটি 'উমেদারী'—প্রার্থী নয় কিন্তু!

কারণ, ওই প্রার্থনা শব্দটির সংগে কেমন যেন সাধু সাধু ভাব জড়িয়ে থাকে; কতকটা নিরীহ চাওয়া, দুর্বল ভাবে কিছু আশা করা বা প্রার্থনা কবা—যেন এমনিই ওটির চবিত্রগত ধরণ। তাই এই জুয়ার আড্ডায় ও শব্দটি একেবারে অচল।

এখানে মানুষে টাকা পাওয়ার উমেদারী করতে এসে টাকা দিয়ে যায়; নষ্ট করে, ছিনিমিনি খেলে, আবো কত কি-ই না করে; এর পুরো হিসেব-নিকেশ আজও আমার জানা হয়নি।

দেওয়া নেওয়ার যে খোলা-মেলা ভাব দেখছেন এখানে, ও কিছু নয়; নিছক পোষাক ওটা! আর পোষাক তো চিরকাল পোষাকই থাকে; মানে, বস্তু বিশেষের আবরণ ছাড়া তা আব কিছু নয়। আর সেই আবরণের আড়ালে অনেক লুকোচুরি, অনেক গুপ্ত রহস্য, অনেক ঠগবাজি এখানে ঢাকাচাপা দেওয়া আছে।

চেনা অচেনায় পার্থক্য নেই এখানে।

পার্থক্য হল—দেওয়া নেওয়ায়!

এগুলো কিন্তু একজনের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মতামত; ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীতে যে টুকরো টুকরো ছবিগুলো ধরা পড়েছে তারই

ভগ্নোক্তি বিশেষ। আর, ঠিক সেই কারণেই এতে ভুলচুক থাক অসম্ভব নয়; যদি বা তা থাকে, তা পাত্রেরই দোষ—স্থানের অবশ্যই নয় সে কথা বলে রাখাই ভাল।

এই যে জটিল আবহাওয়া, এরই মধ্যে বদরিকা একটা নেহাৎ সাদা-মাঠা প্রশ্ন করে বসল।

এত সাদা কথা যে এ পরিস্থিতির ধাতে সয় না।

এই উদার মাঠে ইতিপূর্বে এ ধরণেব সওয়ালের মুখোমুখিও হতে হয়নি আমাকে।

তবে কি যুক্তি থাকতে পারে এ প্রশ্নের পেছনে ?

আপাত দৃষ্টিতে কিছুই নেই।

তবু বদরিকা এই প্রশ্নই করলে ?

নিয়ম হল এখানকার নিজের টাকায় নিজের খেলা বেছে নেওয়া। কানা-ঘুষো, দোনা-মনা করার কত জায়গাই তো পড়ে আছে সারা দুনিয়ায়—ওসব তুচ্ছ জিনিসকে এখানে টেনে আনা কেন বাপু ?

সওয়াব আর ঘোড়া এরা যে আমাদেরই নিজস্ব সম্পদ ; বরাবরের জন্যে অবশ্যই নয়। তবে জীবনের কয়েকটা সাংঘাতিক আর গূঢ় মুহূর্তে এরাই যে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা !

ধর্ম মোক্ষ আর কাম জীবনেব সেই পরম মুহূর্তে একাকার হয়ে অর্থের সম্ভাবনায় নিজেদের বেবাক হারিয়ে ফেলেছে—তিন-তিনটে অনর্থ বস্তু অর্থের সম্ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে তখন।

ভেবে দেখুন, কি উৎকট উন্মাদনা—কি শ্বাসরোধ-করা উদ্বেগ !

একমাত্র বর্তমান ছাড়া আর কিছু নেই তখন।

আবার সেই বর্তমানকেই ফালাফালা করে ছিঁড়ে দিয়ে টাকার উল্কাগুলো ছুটে চলেছে !

এই যে একাধিপত্যের রাজত্ব, এরই ভেতর বদরিকা এসে ঢুকল জীবনের সেই স্যাঁতসেঁতে দিনটায়।

হঠাৎ ছেদ পড়ে গেল একাধিপত্যের ওপরে।

ছেদের সেই ছোট্ট অকিঞ্চিৎকর দাঁড়িটি দেখতে দেখতে মহীরুহের মত বড় হয়ে উঠল। সন্দেহই যেন খোরাক যুগিয়ে একে এত দ্রুত বাড়িয়ে তুললে। সেই ছোট দাঁড়িটি আর সন্দেহপুষ্ট মহীরুহ যেন একই সংগে বলতে লাগল—র‍্যাফিই যে তোমার খেলা বদরিকা তার সন্ধান করে নিয়েছে—তুমি বুঝতে পারছ না অমিতাভ ?

পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে বদরিকা বললে

—আপত্তি নেই আশা করি ?

ধন্যবাদ জানিয়ে একটা সিগারেট তুলে নিতে হল।

বদরিকাই ধরিয়ে দিলে সেটা ; তারপরে নিজেও একটা সিগারেট ধরালে সে।

বদরিকা যে কিছু ঘনিষ্ঠ হতে চায় তাতে সন্দেহ করার কি আছে আর ? যখন পাকাপোক্ত ভাবে র‍্যাফিকে ব্যাক্ না কবার সিদ্ধান্ত এঁটে নিয়েছি, তখন বদরিকার সংগে আলাপ করতে বাধা নেই।

তাকে প্রশ্ন করলাম

—শাওয়ারেব বাজিতে আপনিও ছিলেন বুঝি ?

মাথা নাড়ালে বদরিকা ; বললে

—না।

—তাই নাকি ?

জিজ্ঞেস করলাম তাকে। সে আকাশেব দিকে নজর তুলেদিয়ে বললে

—খবর ছিল আমারও।

—তবে ?

—খেলিনি ; এই আর কি !

অবাক হবারই কথা ! এমন আপ্‌সেট্ কটাই বা ঘটেছে এই টার্ফে ? অবাক হলাম তাব কথা শুনে।

তবে একথাও অনুমান করা অসমীচীন নয় যে বদরিকার সাহস এই আপ্‌সেটের খবরকে হজম করতে পারেনি, বিশ্বাসও করতে পারেনি সে। তা না পারাই তো স্বাভাবিক ; কারণ উড়ো সংকেতের ওপরে নির্ভর করে মুঠোমুঠো টাকা জলে ফেলা তো যার তার কর্ম নয় !

নিজের মনগড়া এই অনুমানগুলোকে বাড়তে না দিয়ে বদরিকার চোখের দিকে তাকালাম আবার। তার সেই জোলো চোখের ভেতরে, আমার বুদ্ধির নাগালের অনেক বাইরে যেন একটা ক্ষীণ হাসির ঝিলিক দেখা গেল; সে এক অদ্ভুত হাসি!

সাপের হাসির কথা কানেই শোনা যায়, তা চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি কখনো। বদরিকার জোলো দৃষ্টির আড়ালে যেন সেই হাসিরই ঝিলিক দেখা দিলে; দীর্ঘকাল থেকে মানুষ একেই সাপের হাসি আখ্যা দিয়ে এসেছে। এ হাসি কিন্তু সাপের মুখে মানায় না; এ যে বদরিকার মত মানুষদের নিজস্ব সম্পদ!

সেই স্বল্পায়ু হাসি নিমেষেই মিলিয়ে গেল। তার জোলো দৃষ্টিতে নির্জীবতার ছায়া দ্রুত ঘনাতে আরম্ভ করল; মনে হল অল্পকালেই তা মরা মাছের চোখের মতই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

সে কি ভাবলে জানিনে; হঠাৎ চোখ বুজে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওগ্‌রাতে লাগল।

তীব্র কৌতূহল হল জেনে নিতে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই জীবটি আবির্ভূত হয়েছে আমার সামনে।

কিন্তু তারই বা প্রয়োজন কি?

না, কোনো প্রয়োজনই নেই; উদ্দেশ্য জানাতেই তো এসেছে সে।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে আমিও নিজেকে সংযত করলাম আর নিজের অহেতুক কৌতূহলও গুটিয়ে নিলাম সেই সংগে। যা বলার বদরিকাই বলুক; খবর দেওয়া নেওয়ায় কোনো ঔৎসুক্য নেই—তা থাকতেও পারে না আমার।

আকাশে মেঘের চাপ তখনও হালকা হয়নি।

মেঘলা আকাশের নোংরা-নিস্তেজ আলো, বদরিকার উপস্থিতি, তার হাসির ঝিলিক আর অনুক্ত জিজ্ঞাসার তেড়ছা খোঁচা যেন এক হয়ে এক অবক্তব্য অস্বস্তির সৃষ্টি করলে!

মুক্তি চাই এ থেকে। এ অবস্থায় যে শ্বাস রোধ হয় মানুষের ; কিন্তু কোথায় সেই মুক্তি ?

মাঠের চৌহদ্দির বাইরেও যে ওই একই অবস্থা। সেখানেও উট্‌কো রোজগারের জন্যে মানুষের ভীড়। পুঁজি কম, তাই গণ্ডীর বাইরে ওরা আর এক সীমানা টেনে নিয়েছে। ওখানেও মুক্তি নেই। একই উত্তেজনায়, একই লাভ-লোকসানের সীমানা দিয়েই যে ওদের অবস্থানও নির্দিষ্ট। আপ্‌সেটের খেলায় আমার মুনাফাব স্ফীত অংকে হয়তো ওদের অনেকেই ক্ষতির হিসেব লিখে নিয়েছে।

নতুন খেলার সূচনায় আবাব জীবন্ত হয়ে উঠেছে বাইরের জনতা ; নতুন আশা জেগেছে ওদের প্রাণে। আশাই যে খোরাক যুগিয়ে প্রতি নিয়ত প্রাণবন্ত করে রাখে মানুষকে !

ভাগ্যের ঘোড়াগুলো এখনই ছুটতে আবম্ভ করবে ; তাই এই আশা, তাই এই চাঞ্চল্য ! এবও অপমৃত্যু ঘটবে অনেকের কাছেই জানি—তা ঘটুক, তাতে কোনো ক্ষতি নেই ; আবার নতুন আশা বহু শাখা প্রশাখা মেলে গজিয়ে উঠবে, প্রাণবন্ত কবে তুলবে সকলকে। আশা যে মরেও মরে না, আর মরলেও তখুনি বেঁচে ওঠে !

বদরিকাও চঞ্চল হয়ে উঠল।

সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো ফেলে সে এগিয়ে এল আমার কাছে। একগাল হেসে বললে

—মিষ্টার চ্যাটার্জি, শাওয়াবের মূল খেলওয়াড়কেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল বদরিকা ; ঈশ্বর তার ইচ্ছে পুরিয়ে দিয়েছেন !

হঠাৎ যেন চৈতন্য ফিরে পেয়ে নিজের বেয়াকুফির জন্যে নিজের ওপরেই তিরিক্ষি হয়ে উঠলাম। কি দরকার ছিল গায়ে পড়ে শাওয়ারের উল্লেখ করতে যাওয়ার ? বিরক্তি আসারই কথা ; তাছাড়া এই বিরক্তিকর মানুষটির সান্নিধ্য বাঁচিয়ে চলাই দরকার,

কারণ কোনো সৌভাগ্য বয়ে আনার জন্যে এই অদ্ভুত মানুষটির আবির্ভাব হয়নি আজকের এই স্যাঁতসেঁতে দিনে।

বদবিকার পেছনে সত্যিই রহস্য লুকোনো ছিল, সেদিন সে কথা পরিস্কার না বুঝলেও পরে তা দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু জীবনের বহু সাধু সংকল্প যেন ভেঙে পড়ার জন্যেই গড়ে ওঠে ; বদরিকার সান্নিধ্য বাঁচিয়ে চলার সংকল্প কিন্তু দৃঢ় হবার আগেই ছত্রখান হয়ে গেল—কাবণ বদরিকাব আকর্ষণের ক্ষমতা যে তার অনেক আগেই দৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

তাব দৃষ্টিব অনুশাসনে এক সময়ে নিশ্চল হয়ে গেলাম, আব বুঝেও নিলাম যে যতকাল সে এভাবে তাকিয়ে থাকবে—এক পাও নড়ার শক্তি থাকবে না আমার।

তাবপরে সে আবো কাছে এগিয়ে এল।

সংকোচেব কোনো বালাই থাকল না তার ; বহু কালেব পুরোনো বন্ধুব মতই কাঁধে হাত বেখে সে বললে

—ব্যাফিব ওপরেই খেলা ঠিক করলাম মিষ্টার চ্যাটার্জি ; প্রথম আলাপেই জুটির খেলা চাইছে বদরিকা, না বলবেন না যেন !

মন্ত্রমুগ্ধ মানুষেব মতই এগিয়ে চললাম তার সংগে ; প্রতিবাদ করার, আত্মপ্রতিরোধ করার শক্তিই যখন খুইয়ে বসেছি—তখন এগিয়ে যাওয়াই একান্ত সমীচীন !

বদবিকা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এল ; কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে

—শাওয়ার আর ব্যাফি ; এছাড়াও আরো কিছু তথ্য জানে বদরিকা !

জিজ্ঞেস করলাম

—কি বললেন মিষ্টার উপাধ্যায় ?

বদরিকা আবার আকাশের দিকে নজর তুলে দাঁড়িয়ে রইল

মুক্তি চাই এ থেকে। এ অবস্থায় যে শ্বাস রোধ হয় মানুষের ; কিন্তু কোথায় সেই মুক্তি ?

মাঠের চৌহদ্দির বাইরেও যে ওই একই অবস্থা। সেখানেও উট্‌কো রোজগারের জন্যে মানুষের ভীড়। পুঁজি কম, তাই গণ্ডীর বাইরে ওরা আর এক সীমানা টেনে নিয়েছে। ওখানেও মুক্তি নেই। একই উত্তেজনায়, একই লাভ-লোকসানেব সীমানা দিয়েই যে ওদের অবস্থানও নির্দিষ্ট। আপ্‌সেটেব খেলায় আমার মুনাফার স্ফীত অংকে হয়তো ওদের অনেকেই ক্ষতির হিসেব লিখে নিয়েছে।

নতুন খেলার সুচনায় আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে বাইরের জনতা ; নতুন আশা জেগেছে ওদের প্রাণে। আশাই যে খোরাক যুগিয়ে প্রতি নিয়ত প্রাণবন্ত করে রাখে মানুষকে !

ভাগ্যের ঘোড়াগুলো এখনই ছুটতে আরম্ভ কববে ; তাই এই আশা, তাই এই চাঞ্চল্য ! এবও অপমৃত্যু ঘটবে অনেকেব কাছেই জানি—তা ঘটুক, তাতে কোনো ক্ষতি নেই ; আবার নতুন আশা বহু শাখা প্রশাখা মেলে গজিয়ে উঠবে, প্রাণবন্ত কবে তুলবে সকলকে। আশা যে মরেও মবে না, আর মরলেও তখুনি বেঁচে ওঠে !

বদরিকাও চঞ্চল হয়ে উঠল।

সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো ফেলে সে এগিয়ে এল আমার কাছে। একগাল হেসে বললে

—মিষ্টার চ্যাটার্জি, শাওয়াবেব মূল খেলওয়াড়কেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল বদরিকা ; ঈশ্বর তার ইচ্ছে পূরিয়ে দিয়েছেন !

হঠাৎ যেন চৈতন্য ফিরে পেয়ে নিজের বেয়াকুফির জন্যে নিজের ওপরেই তিরিক্ষি হয়ে উঠলাম। কি দরকার ছিল গায়ে পড়ে শাওয়ারের উল্লেখ করতে যাওয়ার ? বিরক্তি আসারই কথা ; তাছাড়া এই বিরক্তিকর মানুষটির সান্নিধ্য বাঁচিয়ে চলাই দরকার,

কারণ কোনো সৌভাগ্য বয়ে আনার জন্যে এই অদ্ভুত মানুষটির আবির্ভাব হয়নি আজকের এই স্যাঁতসেঁতে দিনে।

বদরিকার পেছনে সত্যিই রহস্য লুকোনো ছিল, সেদিন সে কথা পরিস্কার না বুঝলেও পরে তা দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু জীবনের বহু সাধু সংকল্প যেন ভেঙে পড়ার জন্যেই গড়ে ওঠে; বদরিকার সান্নিধ্য বাঁচিয়ে চলার সংকল্প কিন্তু দৃঢ় হবার আগেই ছত্রখান হয়ে গেল—কারণ বদরিকাব আকর্ষণের ক্ষমতা যে তার অনেক আগেই দৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

তাব দৃষ্টিব অনুশাসনে এক সময়ে নিশ্চল হয়ে গেলাম, আর বুঝেও নিলাম যে যতকাল সে এভাবে তাকিয়ে থাকবে—এক পাও নড়ার শক্তি থাকবে না আমার।

তাবপরে সে আরো কাছে এগিয়ে এল।

সংকোচেব কোনো বালাই থাকল না তার; বহু কালের পুরোনো বন্ধুর মতই কাঁধে হাত রেখে সে বললে

—র‍্যাফির ওপরেই খেলা ঠিক কবলাম মিষ্টার চ্যাটার্জি; প্রথম আলাপেই জুটির খেলা চাইছে বদরিকা, না বলবেন না যেন!

মন্ত্রমুগ্ধ মানুষেব মতই এগিয়ে চললাম তার সংগে; প্রতিবাদ করার, আত্মপ্রতিরোধ করার শক্তিই যখন খুইয়ে বসেছি—তখন এগিয়ে যাওয়াই একান্ত সমীচীন!

বদরিকা আবো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এল; কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললে

—শাওয়ার আর র‍্যাফি; এছাড়াও আরো কিছু তথ্য জানে বদরিকা!

জিজ্ঞেস করলাম

—কি বললেন মিষ্টার উপাধ্যায়?

বদরিকা আবার আকাশের দিকে নজর তুলে দাঁড়িয়ে রইল

কিছুক্ষণ, তারপরে আমার চোখের ওপরে তার ভাসা ভাসা চোখদুটো স্থির করে বললে

—মিস্ ওমেরান, সুসানা ওমেরান।

—সুসানা ?

চমকে উঠলাম তার কথা শুনে! আর সেই সংগে অনেক অজ্ঞাত জিজ্ঞাসা, অনেক অজ্ঞাত ভয়—যেন এক সাথে মাথা চাড়া দিয়ে সেই স্যাঁতসেঁতে দিনে সারা মনকে আরো স্যাঁতসেঁতে আরো ভারাক্রান্ত করে দিলে।

॥ দুই ॥

গলার স্বর তার অনেক নরম শোনাল।

আরো কাছে এসে মতলব কথা কইতে আরম্ভ করলে

—অনেকক্ষণ চুপ করে আছি; তুমি নিজের খেয়ালেই ভেবে চলেছ,—তোমার পুরোনো দিনের কথা। নিজের পেছনে-ফেলে-আসা কালের স্মৃতি রোমন্থন করে নিচ্ছ। আমাকেও কিছু খোরাক দাও; কিছু শুনি—বলিও কিছু তোমাকে।

তার কথার ভংগী এখন বেশ মিঠে; মন খুশী হয়ে ওঠে! উত্তর দিলাম

—দেখলে তো ব্যাপার ?

সে জিজ্ঞেস করলে

—কি ব্যাপার ?

—স্থুরু হল কোথা থেকে আর এসে ঠেকলাম কোথায় !

—কিসের ?

আমি বললাম

—ভাবনার। দেখলে না, আরম্ভ হল বদরিকাকে নিয়ে আর

তারই সুতো ধরে এসে পৌঁছলাম সুসানার দোর গোড়ায়; ব্যাপার বুঝলে তো?

সে খুশী হয়ে বললে

—খাসা হয়েছে! বদরিকার জোলো, ভ্যাপসা আর অর্থহীন চোখের পরিবর্তে একজোড়া অর্থভবা, ভাব-মশগুল চোখ জুটে গেল; ও চোখে সত্যিই গভীরতা আছে অমিতাভ; ইচ্ছে হলে গাহনও করে নিতে পার ওই অতল নয়ন-সাগরে!

আমি কোনো কথা কইলাম না।

সেও খানিক চুপ করে রইল; তারপরে কি যেন ভেবে নিয়ে হালকা স্বরে বললে

—সত্যিই খাসা হয়েছে, অমিতাভ! কোথাকার কাঠখোট্টা পুরুষ এক; না জানে রকম সকম—না আছে লাবণ্য শ্রী!—ওকে বাদ দাও, একেবারে হটিয়ে দাও মন থেকে। এখন এসে পড়েছ রক্ত-মাংসে গড়া এক রমণীয় মেয়েমানুবেব কাছে; তোমাকে হিংসে করাব কাবণ ঘটলেও এখন দোষ দিতে পারবে না আমাকে! কি, ঠিক বলিনি?

তার কথায় উৎকট শ্লাঘার গন্ধ ছিল—সত্যও যে ছিল না তাও নয়।

সুসানা যে আমার কাছে রমণীয় তাতে সন্দেহের কি থাকতে পারে? কিন্তু সে যে ঘষা পয়সার মতই আটপৌরে হয়ে গেছে! নতুন করে ভেবে দেখার, নতুন ভাষায় পুরোনো কাহিনী বলার প্রয়োজনই বা কি? তাতে কবর খুঁড়ে কেবল কংকালই বার করা হবে।

তবে সুসানার আয়ত চোখের অতলতায় জীবনের বহু পরম মুহূর্তে যে গাহন করিনি তাও নয়; কিন্তু সে যে একেবারে ব্যক্তি-গত ভাল-মন্দ, মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগের কথা! তাতে কারো লাভ-ক্ষতি জড়িয়ে নেই; সে কেবল দুটি নর নারীর জীবনের নানা আলো ছায়ায় একই দান গ্রহণের উপাখ্যান! নিজের দিকে যখনই

দৃষ্টি টেনে আনি, নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চাই—এই সত্যটুকুই তখন পৃথিবীর আর সব সত্যকে আড়াল করে দাঁড়ায়।

একদিন এ জীবন আরম্ভ হয়েছিল ; শেষও হয়ে যাবে একদিন। সুরু আর শেষ—এরই মাঝখানে যেটুকু উদ্‌বৃত্ত সময় তাই নিয়েই তো জীবনের যত জারিজুরি, কারিকুরি ! ওই সময়টুকু ধরেই তো যত আশা-আকাঙ্ক্ষা, যত লেনা-দেনা—যত ঘোরা-ফেরা !

ঠিক তাই-ই !

ভুল নেই এতে।

আবাব, এইটুকু সময়কে আঁকড়ে ধবেই জীবন এগিয়ে চলেছে। কখনও সদরে আবার কখনও বা গলি-ঘুঁজি ধরে। এরই মধ্যে কত উত্থান-পতন, কত আলো-অন্ধকাব এসেছে, চলে গেছে—আবাবও হয়তো আসবে এই উদ্‌বৃত্ত সময়ের পরিসরে !

তবে চলার যেটুকু পথ— তা সামনেই পড়ে আছে ; যদি এগোতে ইচ্ছে হয় স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাও ; যদি না থাকে, তাহলেও এগোতে হবে—এ পথের এই-ই নিয়ম !

এ পথও যেন বেড়া-দেওয়া রেসের ট্র্যাকেব মতই সংকীর্ণ পরিধি দিয়ে আটকানো। চারিদিকে আঁটসাঁট ভাব ; গতিকে অনবরত নিয়ন্ত্রিত করে দিচ্ছে ওই নিয়মেব বেড়াগুলো।

কত সময়ে ইচ্ছে হয়েছে, বেড়ার ওই শক্ত শক্ত খুঁটিগুলোকে মূল থেকে টেনে ফেলে দেবার ; সংকীর্ণ পরিধি, সংকীর্ণ গণ্ডীর বাধাগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দেবার কত সংকল্পই না এসেছে। এক-পথচারী জীবনের শেষ জানতে চেয়েছি বহুবার।

আবার হঠাৎ নতুন মানুষ এসে জুটেছে সেই পথে। সংকীর্ণতার কথা বিস্মৃত হয়েছি তখন। নতুন করে জানতে পেরেছি—অগণিত পথ ধরে জীবন এগিয়ে চলেছে ; এ জীবন তো এক-পথচারী নয় !

আবার কখনো বা কৃপণের সঞ্চয়ের মত সব কিছুকে জড়ো করে

দেখার বাসনা হয়েছে ; জমা-খরচের খতেন তৈরী করেছি। হিসেব করেছি কি পেয়েছি, আর পাইনিই বা কতখানি। যতই হিসেব তৈরী হয়েছে, যতই কষাকষি দিয়ে যাচাই কবে নিতে চেয়েছি ততই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে ; তৃপ্তিব দেখা মেলেনি কোনো কালেও।

এলোমেলো হয়ে এসেছিল মন ; নিজের বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো গুটিয়ে নিতেই আবার তাব উপস্থিতি অনুভব কবলাম। বুঝলাম আমারই অপেক্ষা করে বয়েছে আমাব মতলব ; তাই বললাম তাকে

—তুমিই বা পুবোনো খবর নতুন করে শোনার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন ? এতকাল পবে সুসানাব ভেতরে নতুন কি-ই বা দেখলে বল ? তাব রূপেব খালে যে জল শুকোতে আবম্ভ করেছে ; সে টলটলে ভাব নেই—প্রাণেব উচ্ছলতাও নেই আর।

সে বললে

—তা হোক না ; তবু তো সে মেয়েমানুষ ! তাছাডা তোমার প্রেমেব খালে তো আব জল শুকোয়নি অমিতাভ। তা যদি হতো, অমন কবে কি শুকনো খালেব সংগে তুলনা কবতে পাবতে তার ? না হে না ; তাজা আছে—এখনও বেশ তাজা আছে তোমার প্রেম। বলো না তাবই কথা ; জানই তো—বসেব কথা কইতে গেলে মেয়েমানুষেব কথা কইতে হয়……তাছাড়া তোমার আবার এত কালের ধোপ-সওয়া প্রেম !

তাব কথা শুনে নিজের কাছেই কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে নিজের ; তাই কিছু বিব্রত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম

—কি শুনতে চাও তুমি ? মনের এক বিশ্রী আচ্ছন্ন আর ধোঁয়াটে অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি বর্তমানে ; কি যে বলি তার কিছুই ঠিক করতে পারছি নে ; তুমিই সাহায্য কর না আমাকে !

হঠাৎ তার গলার আওয়াজ ভারী হয়ে উঠল। ইয়ার-বক্সি ধরণের কথাবার্তা এক নিমেষে পালটে দিয়ে সে যেন কড়া আর জবরদস্ত মালিকের মত হুকুম করে উঠল

—তোমার মনের ডায়েরীর পাতা খুলে দেখ অমিতাভ; যা লেখা হয়ে ফুটে আছে সেখানে—পড়ে যাও!

মনের ডায়েরীর খবর কোনো কালেই জানা নেই, রাখিও নি কোনোদিন। সে ডায়েরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহালও নই। তাছাড়া মন তো আর বস্তু নয় যে তার পাতা উলটে যাব? স্পর্শাতীত মন; সে মনের ডায়েরী কোথায় খুঁজে পাব? এ যে একেবারে আজগুবি খেয়াল; ভারি বিপদের কথা হল! তাই কতকটা তাচ্ছিল্য ভরেই বললাম

—মনের ডায়েরীর খবর-টবর জানা নেই আমার। কোথায় খুঁজতে যাব সে ডায়েরী? তোমার এ বেয়াড়া খেয়াল—

কথা শেষ করতে না দিয়ে সে চীৎকার করে বললে

—তোমার কোন্ খবরটাই বা তুমি রেখেছ এতদিন ধরে? চোখের আগে—একেবারে নাকের গোড়ায় সে ডায়েরীর পাতা খোলা রয়েছে; তারিখটা হল উনিশশো উনিশ সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারী। তুমি পড়ে যাও—যা লেখা হয়ে আছে ওই পাতাগুলোয়; কান পেতে রাখলাম আমি।

চোখের সামনে সত্যিই লেখাগুলো জ্বল জ্বল করে উঠল; মনে হল, এ যেন অতি সাধারণ ঘটনা। কোনো আকস্মিকতা নেই, কোনো বিস্ময় নেই—ভুলচুকও নেই কোথাও!

যে ডায়েরীর অস্তিত্ব স্পর্শাতীত মনের গোচরে ছিল না—যাকে বস্তু বলে গ্রাহ্য করতেও রাজী হইনি এই কয়েক মুহূর্ত আগে; সেই অবাস্তব ডায়েরীর নিজেই পাঠক হয়ে গেলাম।

সে আরো কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল।

মেটকাফ ষ্ট্রীটের সেই অন্ধকার বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি।

সুসানা দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ।

সিঁড়ি অন্ধকার, তাই দেখতে পাইনি তাকে।

সাড়া পেলাম এবার ; সে ডাকলে

—অমিতাভ !

উত্তর দিলাম

—কি ? ওখানে দাঁড়িয়ে যে একা ?

সে বললে

—তোমারই অপেক্ষা করছি, অমিতাভ।

বললাম

—ব্যাপাব কি ?

হালকা প্রশ্ন ; আত্মগোপন করার জন্যেই। নিজের উদ্বেগ-গুলোকে ঢেকে রাখতে হবে তো !

সুসানা আমারই প্রতীক্ষা করছিল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। উদ্বেগ ছিল বলেই এ প্রতীক্ষা ; তার নীবব আগ্রহে অনেকখানি তৃপ্তি পেলাম !

বাইবে থেকে এসেছি। দিনের আলো নিস্তেজ হয়ে এলেও তখনও একেবারে মুছে যায়নি ; সে আলোর ধাঁধা ছিল চোখে। সিঁড়ির এদিকটায় দিনের আলো পৌছয় না, বাইরে থেকে এলে চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। আশে পাশের দেওয়ালে আলো আসার কোনো পথ নেই ; পুরোনো ধরণের বাড়ী কি না !

ইদানীং অবশ্য বাতির ব্যবস্থা হয়েছে একটা।

ব্যবস্থা হলেই যে সারা দিন রাত সিঁড়ির মাথায় আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে—এমন প্রতিশ্রুতিও দেওয়া নেই কাউকে !

গ্যাসের লাইন টেনে আলোব মুখটা সিঁড়ির মাথায় বসানো হল যেদিন—মনে আছে সে কথা।

সুসানাই খবর দিয়ে বললে

—অমিতাভ, সিঁড়ির মাথায় একটা আলোর ব্যবস্থা করলাম ; জানো ?

—তাই নাকি ? ভালই তো।

—তোমার জন্যেই এই হাংগামা!

—ভাল, আমাকে নিয়ে কি হাংগামা বাধল আবার?

সুসানা বললে

—মনে নেই সে রাতের কথা? দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামার রকম তোমার? আমার তো ভয়ই হচ্ছিল বাপু! সিঁড়িগুলো একে কাঠের, তায় ভীষণ পুরোনো হয়ে সামনের দিক ক্ষয়ে ঢালু হয়ে গেছে—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম

—ভালই তো হত!

সে জিজ্ঞেস করলে

—মানে?

—মানে আর কি? নিরাশ্রয়ের আশ্রয় জুটে যেত সে রাতে!

সে খানিক চুপ করে রইল; তারপরে ঠোঁট উলটে বললে

—ভারি গরজ আমার ঠাঁই দিতে! গাড়ী তো দাঁড়িয়েই ছিল নীচে, সহিসের কাছে জিম্মা করে দিতাম—তা জেনে রেখো!

—তাতেও লাভ বৈ লোকসান হত না—তাই না?

তার চোখের পাতা জোড়া, সে ভ্রূর কাছে ঠেলে দিয়ে তাকিয়ে রইল; তার চোখের তারায়ও জিজ্ঞাসা উপচে পড়ছে। সে প্রশ্ন করলে

—কেন?

কথার জবাব না দিয়ে পকেট থেকে তারই উপহার দেওয়া সিগারেট কেস বার করলাম।

সে বললে

—জবাব দাও।

আমি কেসের ঢাকনা খুলে সিগারেট বার করলাম।

আরো এক পর্দা গলা চড়িয়ে সে বললে

—শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা?

আমি নির্বিবাদে সিগারেট ধরালাম।

ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে—আড় চোখে এক ঝলক দেখে নিলাম কপট রাগ আর অনুরাগের রঙে তাকে সত্যই রূপসী দেখাচ্ছে!

সে আরোও গলা চড়িয়ে বললে

—অবাধ্য হয়ো না বলছি অমিতাভ ; জবাব দাও কথার!

সুর চড়া হলেও ঝংকার মিঠে শোনাল।

অন্যমনস্কতার ভান করে একদৃষ্টে সিগারেটের কেসের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে ছোঁ মেরে কেসটা কেড়ে নিয়ে বললে

—চাইনে, চাইনে শুনতে তোমার ন্যাকা ন্যাকা কথা ; কেউ জবাব চায়নি তোমার কাছে—

পরক্ষণেই গলার সুর পালটে গেল তার ; সে আবার বললে

—ভারি ঝগড়াটে স্বভাব তোমার! চল সিঁড়ির আলোটা দেখিয়ে আনি তোমাকে—আলোর ব্যবস্থা যে তোমার জন্যেই অমিতাভ!

এখন সুসানাই সিঁড়িতে অপেক্ষা করে আছে ; নিজেই সিঁড়িতে আলো জ্বালায়নি আজ।

সে-ই কথা কইলে আবার

—তোমারই জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছি ; খবর আছে কিছু অমিতাভ?

স্বরে তার উৎকণ্ঠার আভাস ছিল।

আমি বললাম

—না, কোনো খবর নেই, সুসানা।

সে বললে

—এত দেরী হল কেন? পার্টি ছিল বুঝি? ডগডগে ফুল এঁটেছ তাই 'বাটন হোলে'! কি বিশ্রী রঙ! সইতে পারিনে ওই চড়া রঙের গোলাপগুলো।

যে ল্যাণ্ডিংএ সে দাঁড়িয়েছিল সেই ল্যাণ্ডিংএ এসে পৌঁছলে 'বাটন হোল' থেকে নিজেই ফুলটা তুলে নিলে আর জিজ্ঞেস করলে

—কোনো খবর নেই কেন, অমিতাভ ?

বললাম—নেই বলেই !

আমার কথায় বিষণ্ণতার আভাস প্রকাশ পেল ; কিন্তু এতক্ষণ ধরে যে নিজেকে শক্ত করেছি যাতে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ না পায়।

সে জিজ্ঞেস করলে

—উপায় ভেবেছ কিছু ?

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললাম

—না।

সুসানার গলার স্বরে দৃঢ়তা প্রকাশ পেল ; সে বললে

—গা এলিয়ে দিলে চলবে না অমিতাভ ! কোনো না কোনো উপায় করতেই হবে।

কিন্তু উপায় উদ্‌ভাবনের যতগুলি পথ ছিল তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে ; তাই চুপকরে থাকতে হল আমাকে।

সুসানা কি যেন ভেবে বললে

—সোজা তেতালায় চলে যাও তুমি। নীচে প্রেয়ার মিটিং ডেকেছি আজ—এখুনি লোকজনের ভীড় সুরু হবে। চিল-কোঠায় অপেক্ষা কোরো—চলে যেওনা যেন !

সিঁড়ি বেয়ে তেতালায় চলে আসতে হল তাই।

সহরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাতে আরম্ভ করেছে।

আলোর সারিগুলো একে একে পথে জ্বলে উঠল। বৌবাজার ষ্ট্রীটের গ্যাসের বাতিগুলো সবজেটে-সাদা আর অনুজ্জ্বল মনে হয় ; অন্ধকার আরো গাঢ় হলে ওদের উজ্জ্বলতা বাড়বে। পশ্চিমে, নদীর অপর পারে সূর্যাস্তের আকাশে গাঢ় রক্তিমে ছাপ। দিনের শেষ আলোটুকু দেখে নেবার জন্যে ছাদের আলসের ধারে এগিয়ে গেলাম।

বহুকাল সূর্যাস্তের আকাশ এমন ভাবে নজরে পড়েনি!

বহুকাল যেন নিজেকে জগতের সহজ নিয়ম আর তারই গতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছি। সূর্য ওঠে আর অস্ত যায় এ সত্যও যেন ভুলে বসেছি। দিন রাত্রির ভেতরে যে প্রাত্যহিক সত্য আছে, আর তার সাথে জীবনের বৈচিত্রময় যোগাযোগের যে সুতো—তারও খেই হারিয়ে গেছে যেন। খাপছাড়া, কৃত্রিম জীবনে কেবল অসংলগ্নতার বোঝা বয়ে চলেছি। পিঠের ওপর সেই বোঝা—মুখ ব্যাদান করে ভবিষ্যতের পথটুকুকে গিলে ফেলতে চায়; হয়তো ভবিষ্যতই থাকবেনা একদিন! ওই বুভুক্ষু দানব ও-সম্পদটুকুও বোধ হয় গিলে নেবে।

তাতেই বা দুঃখ কিসের?

কৃত্রিমতার সকল বোঝার হাত থেকে সে-দিন হয়ত রেহাই পাব; নকল আবরণের সমস্ত জঞ্জাল দূর করে দিয়ে সে-দিনই হয়তো আবার নতুন করে নতুন জাবনের সুর বেঁধে নিতে পারব। বেসুরো যন্ত্রে যে সুব ফোটে না! কৃত্রিম জীবনই বেসুরো জীবন।

রাত্রির কপালের টিপ বৃহস্পতি দক্ষিণ আকাশে ফুটে উঠল। উর্ধ্বাকাশের জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে; আর মাটির কোলে—পৃথিবীর বুকে ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকার ধোঁয়ার সংগে মিশে ওপরে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। চতুর্দিক অন্ধকারের আবরণে ঢাকা পড়ে যাবে এখুনি। ওখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই, তাই এত স্বাচ্ছন্দের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী আলো থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার তোড়জোড় করছে।

সুসানা ওপরে এল।

তখনও আলসের ধারে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। সে বললে

—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন অমিতাভ? চল কোঠায় তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা ঠিক করা আছে তো।

তারদিকে না ফিরেই বললাম

—কলকাতা শহরের সন্ধ্যা দেখছি, ধোঁয়া আর কুয়াশা মেশা সন্ধ্যার রূপ !

সুসানা কান দিলে না এ কথায়। বাড়ীতে সে উপাসনা সভা ডেকেছে—সেই কথাই ভাবছিল বোধহয় ! সে বললে

—কফি নিয়ে আসছে ইদরীশ ; চিল কোঠায় বসে খেয়ে নিও, বুঝলে ?

—তার পরে ?

—অপেক্ষা করে থাকবে আমার জন্যে।

—তার পরে ?

—অধৈর্য হয়ে চলে যেও না কিন্তু !

কথা শেষ করেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল সুসানা।

কি বলে গেল সে ? অধৈর্য হয়ে চলে যেও না ! কিন্তু ধৈর্য কোথায় ?

এই যে নিশ্চিন্ততার পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছি, এর মেয়াদ কাল দুপুর পর্য্যন্ত ; তার বেশী নয়। এই যে ধৈর্য, যাকে আঁকড়ে ধরে আছি এখন—এযে ভেঙে পড়ার পূর্ব লক্ষণ !

পকেটে হাত চালিয়ে দেখলাম জল-ছাপ তুলে নেওয়া চিঠি ঠিকই যথাস্থানে পড়ে আছে—নতুন করে ও চিঠি পড়ে দেখার দরকার নেই ; ওর প্রতিটি হরফে চ্যাটার্জি কোম্পানীর পতনের নোটিশ সাজিয়ে দেওয়া আছে। পকেটেই পড়ে থাক ওটা—নতুন করে পড়ে দেখবার প্রয়োজন নেই আর !

ইদরীশ কফি নিয়ে ওপরে এল।

চিল কোঠায় গ্যাসের আলো নেই ; দেওয়ালে একটা কেরসিনের দেওয়াল-গিরি আঁটা। আলো জ্বালিয়ে দিলে ইদরীশ।

ছোট ঘর। পরিচ্ছন্ন আর নিরিবিলি। পৃথিবীর মুখর জন-কোলাহলের বাইরে একটি নির্ভরশীল আশ্রয়।

সারা দিন ধরে যেন এমনি একটি আশ্রয় খুঁজে ফিরেছি, হঠাৎ আবিষ্কার হল এখন। বহুকাল আগে আরো একটি নির্ভরশীল আশ্রয় ছিল আমার। কিন্তু তার বিশালত্বের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। এ আশ্রয় অনেক ছোট ; কিন্তু অনেক বেশী ঘরোয়া।

এইতো, স্প্রিংএর গদিতে খুরো আঁটা একটি শয্যা রয়েছে এখানে—সাদা সুতোর নকসা তোলা ফিকে সবুজ সুজনী দিয়ে ঢাকা। বেতের মোড়া একটি। মোড়াব গদি চামড়ায় ছাওয়া। একটি ছোট টি-পয়—তাতে কটি বই রাখা আছে। দেওয়ালে কাপড় রাখার একটি ব্র্যাকেট ; আর ওই কেবসিনে জ্বালা দেওয়াল-গিরি আলো। এই আসবাবগুলি নিয়েই মেটকাফ ষ্ট্রীটের এই চিল কোঠার ঘরখানিতে একটি নির্ভরশীল পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

ইদবীশ টি-পয় থেকে বইগুলি সবিয়ে মোড়ার ওপরে রাখলে। এবার সে কফির ট্রে রাখতে পারবে টি-পয়ে।

এই তো ট্রে নামিয়ে রাখলে ইদরীশ। এবাব পারকোলেটর থেকে কফি ঢালা হবে।

কিছু খাবারও পাঠিয়েছে সুসনা।

ভালই কবেছে। পার্টিতে খাওয়া হয়নি কিছুই। সে কথা ভাববারই বা অবসর পেলাম কোথায় তখন ? সারা দিন ধরে যেন এক নির্মম ঝড় বয়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে !

আবার পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম—জল ছাপ তোলা চিঠি নিজের জায়গায় নির্বিবাদে পড়ে আছে।

আপিসে থেকে বেরোবার মুখেই হাজির হল ওই প্রতিটি হরফের ছাপ-তুলে-নেওয়া চিঠি—আইনের ফাঁক নেই কোথাও ওর মধ্যে ! এক টুকরো কাগজে রসিদও তলব করা ছিল। সময় লিখে সেই টুকবো কাগজটি সই কবে তবে একে হাতে নিয়েছি—দ্বিধা সংকোচের সময়ও ছিল না ; সে সুযোগও হাতে ছিল না তখন। এখনও কোন সংকোচের বা দ্বিধার দংশন নেই মনে। ভবিষ্যতকে স্বীকার করে নিয়েই তো এই ধৈর্যের পোষাকে

নিজেকে মানান সই করে নিয়েছি। তবু প্রশ্নের হাত থেকে নিস্তার নেই! একই কথা বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে;—এ পার্টি ডাকার সার্থকতা কোথায় তোমার; অমিতাভ? কেনই বা সোহন লালকে দিয়ে এ পার্টি ডাকাতে গিয়েছিলে তুমি?

নিজের কাছে এর জবাব আছে! মাত্র সাতদিন সময়ের প্রয়োজন ছিল; সাত দিনের মধ্যে কি গলদটুকু শুধরে নেওয়া সম্ভব হতো না? এই সুযোগটুকু ঘটিয়ে নেবার জন্যেই যে সোহনলালকে দিয়ে এই আমন্ত্রণের আয়োজন!

কিন্তু সে নিজেই বান-চাল করেছে। সুযোগের সমস্ত সম্ভাবনাকে নিজেই পণ্ড করেছে সোহনলাল! কোনো দাম নেই তার কথার। উদ্দেশ্য সে নিজেই ব্যর্থ করে দিয়েছে—জল-ছাপ তোলা চিঠিই তো তার প্রমাণ।

—কোট খুলে নিই হুজুর?

ইদরীশের কথায় চমক ভাঙল।

কোটের বোতাম আলগা করে দিলাম। আলতো হাতে কোট খুলে ইদরীশ ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রেখে বললে।

—নাস্তা তৈরী হুজুর।

তাকে নীচে যাবার নির্দেশ দিয়ে বললাম

—আচ্ছা; ঠিক আছে তো সব?

কফির পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে; কিন্তু হঠাৎ আকর্ষণ কমে গেল কফির পেয়ালা থেকে! ওটা তুলে নেওয়ার উৎসাহ নেই, সে শক্তিও নেই শরীরে···আগামী কালের দুশ্চিন্তাই কি মনকে এমন বিব্রত করে দিলে?

চ্যাটার্জি কোম্পানীর একাউণ্টে অনেক টাকার ঘাটতি··· কাল বেলা দুটোর মধ্যেই সেই ভয়াবহ অংকের চেক ব্যাংকে হাজির হবে। টাকার ব্যবস্থা নেই···কিছু সময় বাড়িয়ে নেবার জন্যেই না সোহনলালকে দিয়ে এই পার্টি ডাকানো!

তবে একথাও জানি, যে ডুবো জাহাজ কিনেছি—তার কেনা-বেচায় মার নেই, লোকসানের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই ; কেবল অর্থাভাবই এই পতনের কারণ হয়ে রইল ! এই তো, এখনও নিজের গলদগুলোই খুঁজে দেখার চেষ্টা করছি ; কিন্তু কোথায় গলদ ? এ স্পেকুলেশনের কোথাও ফাঁক নেই ; গলদও নেই ! একেই মানুষ ভাগ্য বলে—ভাগ্য নয়, আত্মঘাতী দুর্ভাগ্য !

এই তো, এক নিমেষেই আগাগোড়া বিশ্লেষণ শেষ হল ; কিন্তু দুরাশাকে নাগালের মধ্যে টেনে আনার শক্তি কোথায় খুঁজে পেলাম ?

একটা প্যাটি তুলে নিলাম থালা থেকে।

দুর্বল শরীরে দুর্বল চিন্তারই আক্রমণ হয় ; তাই না ? এই দুর্বলতা দেহের গ্রন্থিগুলোকে পঙ্গু করে দিয়েছে ; শরীরের শক্তি চাই—সোজা হয়ে, শক্ত হয়ে দাঁড়াবার শক্তি।

প্যাটি স্বাদু মনে হল।

কিন্তু দেহের শক্তি কি অর্থের শক্তি বাড়ায় ? বর্তমানে যে একমাত্র অর্থের শক্তিই চাই ! সোহনলালের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে শুধু টাকারই প্রয়োজন—আর কিছুরই দরকার নেই এখন।

সুসানাকে এই পার্টি ডাকার খবর দিই নি। কিন্তু তার কথায় মনে হল সে নিজেই এ খবর জুটিয়ে নিয়েছে আর উদ্দেশ্যও জানে ! 'বাটন হোল' থেকে গোলাপের কুঁড়িটা তুলে নেওয়া কি অর্থপূর্ণ নয়,—কোনো অর্থই কি নেই তার এই লঘু আচরণের আড়ালে··· ?

তাকে এ খবর কে-ই বা জুটিয়ে দিল···আর তা জুটিয়ে দেওয়ার আড়ালে কি উদ্দেশ্য নেই কোনো ? যদি সেই অজ্ঞাত লোকটি সোহনলাল হয়—তাতেই বা বিস্মিত হবার আছে কি ? কারণ ডুবো জাহাজের কেনা-বেচা বান চাল হওয়ার পেছনে সোহনলালই তো দাঁড়িয়ে আছে··· !

শুধু সাতটি দিনের সময় দরকার ছিল....সেই জন্যেই তো এই পার্টি ডাকা···খরচ যা হবার তা হয়ে গেছে ঠিক-ই; শুধু হয়নি আমার উদ্দেশ্য সফল! আর তা হয়নি বলেই তো অমিতাভ চ্যাটুয্যে এক অবশ্যম্ভাবী পতনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই পতনকে স্বীকার করে নেবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে; টাকার প্রয়োজন ঘুচে গেছে....তাই তো ধৈর্যের আড়ালে অমিতাভ চ্যাটুয্যে মেটকাফ ষ্ট্রীটের এই বাড়ীর চিল কোঠায় বসে আত্ম বিশ্লেষী চিন্তায় মগ্ন।

বুভুক্ষু শরীর ....।

নিজের অজ্ঞাতেই প্যাটি শেষ হয়ে গেছে কখন!

ইদরীশ কফিতে চিনি দিতে ভুল করেছে নাকি?

কি বিশ্রী আর তেতো স্বাদ কফির?....কফি খাওয়ার প্রয়োজনও ঘুচে গেল···তাই আর একটা প্যাটি তুলে নেওয়াই যুক্তি-যুক্ত!

পোস্ট ডেটেড চেকের কথাই বা ভাবতে যাই কেন? ডুবো জাহাজ কেনার খাতে যে পোস্ট ডেটেড চেক দিয়েছি, তা তো মন থেকে বিলকুল হটিয়ে দিয়েছি! সে কথা ভাবার কোনো দাম নেই; কারণ ফাঁকা একাউন্টের চেকে কোনো কেনা-বেচা হয় না.... সোহনলালই তা প্রমাণ করেছে।....চেক বইয়ের শেষ দিকের একখানা পাতায় লেখা....হ্যাঁ, নম্বরও মনে আছে; আঠারশো বাইশ—ওই নম্বরই সেই পাতাখানার। আঠারোই ফেব্রুয়ারীর তারিখ দেওয়া চিঠির সংগে ওই চেক প্রমাণ জোরাল করবে। তা করুক, তাতেও ক্ষতি নেই আর··· !

ইদরীশের তৈরী তেতো কফির চেয়ে এ চিন্তাগুলো আরো অনেক বেশী তেতো!

তেতো কফির পেয়ালাই তুলে নিলাম তাই।

কিন্তু সুসানারই বা এত দেরী হওয়ার কারণ কি ?

তার প্রার্থনা সভা ?

তুচ্ছ প্রার্থনা সভার কারণকে অমিতাভ চাটুয্যে কোনো দাম দেয় না। সুসানার অপেক্ষায় কাল গোনার সময় নেই তার ; মেটকাফ ষ্ট্রীটের চিল কোঠায় বসে কোনো অভিসারিণীর প্রতীক্ষা করা অহেতুক !

এখুনি আপিসে যাওয়া দরকার—'কার কোম্পানীর' চিঠিতে কি ফাঁক নেই ? আছে বৈ কি ! এ দুনিয়ায় সর্বত্রই যে ফাঁকে ফাঁকে ফাঁপরা ধরে গেছে....'কার কোম্পানীর' চিঠিতেও ফাঁক আছে নিশ্চিত···পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়ে তারই হদিস বার করে নেব।

সুসানার এত দেরী করার কোনো কারণ নেই ; তার অপেক্ষায় কালক্ষেপেও কোনো যুক্তি নেই—তাই তার অনুপস্থিতি তেতো মনে হচ্ছে....।

ইদরীশের তৈরী কফিও তেতো···।

জীবনের আগাগোড়াই বুঝি তিক্ততায় ভরা ?

নীচ থেকে প্রেয়ার মিটিংএর শব্দ ভেসে আসছে। ওরা গান গাইছে এখন ; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েই গান গাইছে ওরা।

সুসানাও গাইছে বোধ হয় !

সমবেত গানে তার নিজস্ব সুরটুকু হারিয়ে গেছে। ওই সমবেত গানেই ওরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে—এ অনুমান অসংগত নয়।

নিজেকে প্রশ্ন করলাম—কে এই ঈশ্বর ? কোথায় এর অস্তিত্ব ?

কোনো উত্তর পেলাম না। কোনো চেতনার সাড়াও এল না মনে। মনে হল, মানুষ এই মূঢ় অজ্ঞানতাকে অবলম্বন করে যুগ যুগ

কাটিয়ে দিলে। যার কোনো অস্তিত্ব নেই, যার কোনো চেতনা নেই—তারই অস্তিত্ব, তারই চেতনা কল্পনা করে তার কাছেই আত্মনিবেদন করে চলেছে দিনের পর দিন। এ মূঢ়তার শেষ নেই! এ অজ্ঞান অন্ধকারে একটি আলোর বিন্দুও কোনো দিন ফুটে উঠবে না?

মানুষের মূঢ়তায় চঞ্চল হয়ে স্প্রিং এর গদি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এ-বিশ্বাসের ভিত নেই…যদি বা থাকে তা অত্যন্ত দুর্বল… একেবারে শক্তিহীন…একেবারে যুক্তিহীন.... !

হ্যাঁ, এ-গদির-স্প্রিংগুলোও যে শক্তিহীন হয়ে গেছে!

ইস্পাতের শক্তি নিস্তেজ হয়ে দেবে গেছে জায়গায় জায়গায়।

এ-গদি আরাম দিতে অক্ষম; একে ত্যাগ করাই শ্রেয়… এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে…। তাড়াতাড়ি ব্র্যাকেট থেকে কোট টেনে নিলাম।

'কার কোম্পানী'র চিঠিতে গলদ আছেই। সে চিঠি পড়ে এখুনি তার করে দিতে হবে; নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। অপরের ভুলের সুযোগ নিয়ে কি অমিতাভ চাটুয্যে নিজের বাঁচার পথ খুঁজে পাবে না?

উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো ফেরৎ নিতেই বুঝি ইদরীশ ওপরে এল? না, বাসন গুছিয়ে সে তো দাঁড়িয়ে আছে! কিছু বলার জন্যেই অপেক্ষা করছে ইদরীশ।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম

—কি চাও তুমি ইদরীশ?

নির্বিকার ভাবে সে বললে

—হুজুর মেম সাহেব আপনাকে জানাতে বললেন, তিনি গাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন।

ইদরীশ কি যন্ত্র চালিত? এতবড় দুঃসংবাদ দিতে একটুও

বিচলিত হল না। নিজের কাজ সেরে নিরাসক্তের মত উচ্ছিষ্ট বাসন নিয়ে সে নীচে নেমে গেল।

কিন্তু এ ছাড়া কি-ই বা করার আছে তার? মেম সাহেবের হুকুম তামিল করার উপকরণ হওয়া ছাড়া তার নিজের অস্তিত্ব কোথায়? সুসানার ইংগিতে ওঠা-বসা করাই যে তার পেশা। অন্ন-বস্ত্র, রুজি-রোজগারের জন্যে সুসানার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় তাকে। সুসানাকে খুশী করে তার জীবনের জীবিকা জোটাতে হয়!

কিন্তু আমার সংগে পরামর্শ না করে সুসানা কোন্ অধিকারে গাড়ী ছেড়ে দেয়? এ দু:সাহসের অধিকার কে দিলে তাকে? সে কি নিশ্চিত জেনে নিয়েছে যে, অমিতাভ চাটুয্যে আর ইদরীশের ভেতরে কোনো পার্থক্য নেই! একই ভাবে সে তার কর্তৃত্ব জাহির করে যাবে এদের কাছে?

এছাড়া কি আরও কোনো গূঢ় কারণ থাকা অসম্ভব নয়?

ঠিক কথাই! কিছুই অসম্ভব নয় এ পৃথিবীতে।

সোহনলালের সংগেই বা সুসানার সম্পর্ক কিসের? সে-ই বা কেন তাকে পার্টি ডাকার খবর জুটিয়ে দেয়? তাদের এই গোপন যোগাযোগের প্রয়োজনই বা ঘটে কোন কারণে? তবে কি সোহন-লালের নীচতার পেছনে, তার বেইমানীর আড়ালে সুসানাও আত্মগোপন করে আছে?

নির্ভরশীল ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম একবার; এ ঘরের আনাচে কানাচেও নির্ভরতার চিহ্ন নেই আর। এ যেন সোহনলালের তৈরী কোনো এক অসাধুতার গহ্বরেই দাঁড়িয়ে আছি। ঘরের সারা পরিবেশও তাই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে; এখানে আর মুহূর্তকাল দেরী করা উচিত নয়—এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে এই অসাধুতার গহ্বর থেকে।

ঘরের দেওয়ালে আঁটা আলোর দিকে চোখ পড়ল হঠাৎ। দেওয়ালে আঁটা আলো জ্বলছে ঠিকই, তবে ও-আলো আর স্বচ্ছ নয়,

পলতের কোন থেকে কালি উঠতে আরম্ভ করেছে। চিমনির এক পাশে ভুসো কালির ছাপ…এ ঘরের রোশনায়ে কলংক ধরেছে…. ভুসো কালির কলংক….!

ওপরে এল সুসানা। ওড়নায় তার মাথা ঢাকা। প্রার্থনা সভার জন্যেই বোধহয় এই বিশেষ সাজ তার। সে বললে

—নিরিবিলিতে একটু বিশ্রাম করে নিলে না কেন আমিতাভ সারা দিন এত ধকল গেছে তোমার!

বিরক্তিতে বিষিয়ে ছিল মন; উত্তর দিলাম না তার কথার।

—একি করেছ! আলোর এ দশা হল কেন? চিমনির ওধারে কালির ছাপ! পলতে কমিয়ে দাওনি, অমিতাভ?

এ যে বিপরীত কথা বলে সুসানা। এ ঘরের রোশনায়ে আমিই কালি মাখালাম নাকি?

সে নিজেই এগিয়ে গিয়ে পলতে কমিয়ে দিলে। চিমনির গায়ে ভুসো কালির ছাপ আর লাগবে না।

তার আত্মসংযত ভাব দেখে উত্তেজিত হয়ে বললাম

—স্ট্র্যাণ্ড রোডে যেতে হবে এখুনি; জরুরী কাজ আছে আমার।

সে বললে

—চলে যে যাওনি, তাই আমার ভাগ্য!

স্মিত হাসি ফুটল তার মুখে। সে জিজ্ঞেস করলে

—ইদরীশ তোমাকে বলেনি? 'কুক কম্পানীর' আস্তাবলে গাড়ী ফেরত পাঠিয়েছি!

বিরক্তিকর প্রসংগ সুসানাই তুলেছে। নিজেকে শক্ত করে বললাম

—না জানিয়ে একাজ করা অনুচিত হয়েছে তোমার।

এই প্রসংগের সুতো ধরে তার চোখে সোজাসুজি তাকিয়ে দেখবার সুযোগ হল এতক্ষণে। তার সংগে চরম বোঝাপড়াও করে

নিতে হয় এখুনি—মেকি ভালবাসার ঝুঠো আবরণ খসে পড়ুক তাতে কোন দুঃখ নেই।

পলকে তার মুখ পাঁশুটে হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত আঘাত বিস্ময়ে ফুটিয়ে তুললে তার চোখে। দেওয়াল-গিরির ভুসো কালি মাখা টিমে আলো, কিংবা তার মাথা-ঢাকা ওড়নার ছায়া এই বিবর্ণতার কারণ নয়। এ অন্য জিনিষ; অন্য কারণ আছে এর পেছনে!

ওই বিবর্ণ, ভয়ার্ত মুখের সাথে কোন কালে পরিচয় হয়নি আমাব। জীবনের যে আতংকগুলোকে সে গোপনে রাখে, কারো গোচরে আসতে দেয় না; তারাই মুখ ব্যাদান করে দিয়েছে এখন। কিন্তু কার্য আর কারণ এই নিয়েই তো দুনিয়া! সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এর পেছনেও তো কার্য কারণেরই খেলা চলেছে; তবে কি সুসানার আতংকের আড়ালে সেই কার্য কারণের রহস্যই লুকিয়ে আছে? আত্ম প্রকাশের ভীতিই কি এই বিবর্ণতা এনে দিয়েছে তার মুখে! তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে দেখতে কোনো সংকোচ এল না এবার; কিন্তু কি দেখলাম নিজের সরাসরি দৃষ্টিতে? সে যেন একটা জীবন্ত আয়না; যেন একটা জীবন্ত আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি—নিজের গোপনতম আতংকের বিবর্ণ রেখা আর রঙ সেই আয়নায় ধরা পড়ে গেছে। দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম তার চোখ থেকে।

সুসানাও কোনো কথা কইলে না নীরবে তাকিয়ে রইল। তার মনের পুঞ্জীভূত শব্দ অবাঙময় ভাষায় সেই অপরিসর ঘরের নির্জনতার সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে সারা পরিবেশকে দুর্বিষহ বোঝার ভারে বিব্রত করে দিলে; শ্বাসরোধ-করা একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল চারিধারে। সেই নির্জনতাই যেন আমার তুচ্ছ অস্তিত্বের দিকে আঙুল দেখিয়ে বারংবার বলতে লাগল—অমিতাভ, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ একবার! তোমারও যে একটা কালো অতীত আছে—সে কথা ভুলে

যেওনা তুমি! ভ্রান্ত পথ বেছে নেওয়ার অনেক খেসারৎ গুনেছ এক কালে—নতুন করে সে খেসারৎ গুনতে যেওনা আবার।

এগুলো কি দুর্বল মনের প্রলাপ নয়? অবশ্যম্ভাবী পতনের মুখে দাঁড়িয়ে সত্যকে পাশ কাটাবার অপচেষ্টা ছাড়া এই দুর্বল উক্তি আর কিই-বা হতে পারে?

নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বললাম

—ইদরীশকে খবর দাও; একটা ঠিকে গাড়ী ডেকে আনুক এখুনি। স্ট্র্যাণ্ড রোডে যাওয়া দরকার···নষ্ট করার মত সময় নেই আমার হাতে।

মোড়ার ওপরে-রাখা বইগুলির ভেতর থেকে একখানি বই তুলে নিয়ে সুসানা শান্তস্বরে ডাকলে

—অমিতাভ।

তার দিকে চেয়ে দেখলাম—কি করুণ, কি পাণ্ডুর হয়ে গেছে মুখ তার! সে বললে

—আমার একটি মাত্র বাসনা পূর্ণ করে দেবে না তুমি?

জিজ্ঞেস করলাম

—কি সেই বাসনা তোমার?

বইখানা এগিয়ে দিয়ে সে বললে

—এটা ধর তুমি!

তাকে বিদ্রূপ করে জিজ্ঞেস করলাম

—এ পুঁথিতেই কি তোমার বাসনা লুকোনো থাকে?

সে বললে

—একটি মাত্র শপথ চাই তোমার কাছে।

—শপথ?

মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল; কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম তাকে

—কিসের শপথ? কার জন্য?....তোমার ধর্মের পুঁথি ধরে আমাকে শপথ করতে হবে কোন দুঃখে?

সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পাঁশুটে মুখ তার আরো মলিন হল। তবু নিজেকে সংযত করে সে বললে

—অমিতাভ, আমাকে বিশ্বাস করতে দাও; নিজের জন্য কোনো বিশ্বাস চাইনে আমি। অপরের সন্তুষ্টির জন্যেই এ অনুরোধ তোমার কাছে। বিশ্বাসের একটা ভিত তুমি পেতে দাও—যার ওপরে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আমি সমস্ত বিপদকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি!

একেই বুঝি নির্জলা মেয়েলি ন্যাকামি বলে মানুষে? বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে কোনো পুরুষের পক্ষেই এ জাতীয় উচ্ছ্বাস সহ্য করা সম্ভব নয়। নিজেকে সংযত করে বললাম

—সুসানা, আইনের চোখে দেউলিয়ার শপথের কোনো মূল্য নেই; তা জান তো?

নিজের কানেই কথাগুলো অর্থহীন শোনাল। নকল হাসি হেসে নিজের দুর্বলতা গোপন করতে চাইলাম তাই; কিন্তু তার আগেই সে এক আত্মগত ভাবের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললে।

অনেকক্ষণ পরে অস্ফুট গলায় সে কথা কইলে

—আমার পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নিওনা, অমিতাভ। আমাকে বিশ্বাস করতে দাও। আমার জীবনের সব ভালমন্দ, সব শুভাশুভ যে এই পুঁথির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে! তুমি বিশ্বাসের ভিত শক্ত করে দাও অমিতাভ! যেন নির্ভয়ে আমি তোমার কাজে সাহায্য করতে পারি এই দুঃসময়ে।

কছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সেই পুরানো বিদ্রূপ-ভরা সুরেই তাকে জবাব দিলাম

—সে শক্তি নেই আমার। তাছাড়া, তোমার বিশ্বাস আমার শপথে কোনো কালে শক্ত হব না; আর তা না হওয়ায়ই বাঞ্ছনীয়!

সে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আত্মবিশ্বাসের রেখায় তার দুই চোয়াল দৃঢ় হল। তার চোখ থেকেও ধীরে ধীরে দুর্বলতার রঙ মুছে গেল এক সময়।

নিজের বিশ্লেষী দৃষ্টি দিয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম;

দুর্জ্ঞেয় মনে হল তাকে—তার আপাদমস্তক যেন এক রহস্যের আস্তরণে ঢাকা। ব্যবধানের এই আস্তরণকে সরিয়ে দেবার কোনো ক্ষমতা নেই; আমার কাছ থেকে সে নিজেকে হঠাৎ অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

ওড়নার আবরণে তবু সে মনোরমা! তাব মাথার ওই টুকরো কাপড়টুকু যেন তাকে অনেক দায়িত্বশীল করেছে, অনেক গাম্ভীর্যও এনে দিয়েছে তার চরিত্রে।

পুঁথি ফেরৎ নেবার জন্যে সুসানা হাত বাড়িয়ে বললে

—বেশ, তাহলে খুলেই ফেরত দাও পুঁথি।

ভূয়ো শপথেব দুর্বিষহ বোঝা নেমে গেল মাথা থেকে; মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে ফেরত দিলাম তার পুঁথি।

সে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল খানিক, তাবপরে পুঁথি কপালে স্পর্শ করে সুর করে পড়তে আরম্ভ করলে

"শত্রুর সাথে সমতার অস্ত্রে যুদ্ধ কর।
বন্ধুর সাথে অপর বন্ধুদের পরামর্শ নিয়ে কাজে
প্রবৃত্ত হোয়ো।
ঈর্ষাপরায়ণের সাথে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ায়
বা তার ব্যর্থতার কারণ হওয়ায়
নিজেকে বিরত রাখ।
লোভীর সাথে যৌথকার্যে, তার লভ্যাংশ গ্রহণে
অথবা তার দ্বারা চালিত হওয়ায় বিরত থাক।
মদ্যপের সহযাত্রী হওয়ায় বিরত হও।
নীচমনার কাছে ঋণগ্রহণ দুঃখের কারণ হয়।
পার্থিব বৈভব যেন তোমাকে আনন্দিত বা
উদ্ধত না করে—কারণ বর্ষার মেঘের
মতই তা ক্ষণস্থায়ী।
জীবন তোমাকে যেন উদ্ধত না করে—
কারণ মৃত্যুতে জীবনের সকল ভঙ্গুরতা
প্রমাণিত ও সকল ঔদ্ধত্য ধূলিসাৎ হয়॥"

পাঠ শেষ হলে পুঁথি আবার কপালে স্পর্শ করিয়ে নিলে সুসানা।

নির্জন ঘরে শব্দের তরংগ তুলে দিয়েছে বহু পুরোনো কালের ওই কথাগুলো। জীবনের ভঙ্গুরতা আর তারই বৈভবের চাকচিক্য নিয়ে যত নিষেধ-বাণী মানুষ উচ্চারণ করেছে, ততই নিজের মূলগত দুর্বলতা দিয়ে মানুষ তার উচ্চ মূল্যই নির্ধারণ করেছে। কথাগুলি নিতান্তই পুরোনো, তবু জীবন দর্শন আছে—তাই মাধুর্যের অভাব নেই।

ইদরীশ ওপরে এল।

সুসানা জিজ্ঞেস করলে তাকে

—ল্যাঙো হাজির হয়েছে ?

ইদরীশ এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে

—গাড়ী এনেছে ওরা—এই কাগজে সই চায় সহিস।

কাগজের টুকরো এগিয়ে দিয়ে সুসানা বললে

—সময় লিখে কাগজে সই করে দাও অমিতাভ।

সই করা কাগজ ইদরীশকে ফেরৎ দিয়ে তাকে নীচে যাবার নির্দেশ দিয়ে পাকা ব্যবসায়ীর মত কথা কইলে সুসানা

—অমিতাভ, ডুবো জাহাজ কেনার খাতে তোমার দেনা কত ?

পাশ কাটাবার জন্যে পালটা প্রশ্ন করলাম তাকে

—কেন ?

সে বললে

—জাহাজটা যে আরো দশদিন ধরে রাখতে হবে তোমাকে !

বিরক্ত হয়ে বললাম

—এ তো পুরোনো উপদেশ। আগেই তো জানিয়েছি, সে পথ একেবারে বন্ধ ; কাল বেলা দুটোর পরে এ কাহিনীতে ছেদ পড়ে যাবে চিরকালের জন্যে।

সুসানা আত্মস্থ হয়ে চিন্তা করতে করতে কথা কইলে

—তবুও চেষ্টা করতে হবে তো !

এ ধরণের অযৌক্তিক কথা মানুষের উদাসীনতা প্রকাশ করে, তাই মনে আঘাত পেয়ে চুপ করে রইলাম।

সুসানাই কথা কইলে আবার ; সে বললে

—আর সেই সংগে যে তোমার মোট-মাট দেনার অংকটাও জানা দরকার, অমিতাভ !

আত্মসম্মানে আঘাত লাগল ; তবু জিজ্ঞেস করলাম

—হঠাৎ কি দরকার পড়ল তার, জানতে পারি কি ?

· সে সহজভাবে বললে

—দ্বিধা করার সময় নেই এখন। 'কার কোম্পানী' কতদূর পর্যন্ত উঠতে পারে এই ডুবো জাহাজের খরিদ দামে ; কি অনুমান কর তুমি ?

—আটত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আশা করা চলে।

—জাহাজ কেনার বাবদে তোমার দেনা কত ?

—আঠারো হাজার—কিংবা কিছু কমও হতে পারে !

—তোমার বাকি দেনা মোট-মাট হাজার পনর টাকা হবে, তাই না ?

বিরক্তি গোপন করে আমি বললাম

—দশ হাজার টাকার ওপরে যাবে বলে তো মনে হয় না··· ।

সুসানা কি যেন ভেবে নিলে এক নিমেষে, তারপরে বললে

—বেশ, আটত্রিশ হাজারেই তুমি ডুবো জাহাজ বিক্রী কর তাহলে।

—কাকে ?

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

নির্বিকার ভাবে সে বললে

—কেন, আমাকে ?

—তুমি কি করবে ওই জাহাজ কিনে ?

—দশ দিন পরে তোমাকে ফেরৎ বিক্রি করে দেব।

—মানে ?

—দশদিন পরে তুমিই ওটা বেচে দিও 'কার কোম্পানীকে'।

—তোমার লাভ ?

—তা জানিনে।

হঠাৎ যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল। সুসানা কোনো কথা কইলে না অনেকক্ষণ। তার পরে, ধীরে ধীরে এক সময়ে সে কথা বলতে সুরু করলে

—সোহনলালের দালালী চুক্তির মেয়াদে আর দশ দিনবাকী আছে। জাহাজেরও দরকার আছে 'কার কোম্পানীর'। এই দুয়ের সমন্বয় করলেই তো পরিস্কার দেখা যায় কোথায় গিয়ে ঠেকে পড়েছ তুমি।

যুক্তি তো আছেই, অনুশীলনেও বিচক্ষণতা আছে—তার সঠিক তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা দেখে চুপ করে রইলাম। নিজেকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম একবার—কিসের শপথ তোমার কাছে চেয়েছিল সুসানা তা জানতে চেয়েছিলে কি ··কিসের নির্ভরতা চেয়েছিল সে ?

আড় চোখে চেয়ে দেখলাম—ওড়নার আচ্ছাদনে তার মুখের অনেক খানি ঢাকা, পরিস্কার কিছুই ঠাহর হয় না। তার সারা দেহও যেন রহস্যের আবরণে সে ঢেকে ফেলেছে। এ রহস্য ভেদ করার কোনো উপায় নেই আর !

সুসানা বললে

—নীচে চল অমিতাভ, ল্যাণ্ডো অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।

সিঁড়ি বেয়ে দুজনেই নীচে নামতে আরম্ভ করলাম, পথে ল্যাণ্ডো দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্যে—তাই দেরী করার সময় নেই আমাদের !

সিঁড়ি এখন আর অন্ধকার নয়, জ্বলজ্বল করে গ্যাসের আলো জ্বলছে সিঁড়ির মাথায়। ধাপ-ক্ষওয়া সিঁড়ি বেয়েও নামতে কোনো অসুবিধে নেই। আড়চোখে সুসানার মুখের দিকে তাকালাম আবার, তার মুখ তখনও ওড়নার আবরণে ঢাকা ; সিঁড়ির জ্বলজ্বলে আলোও ওই আবরণ ভেদ করতে পারেনি।

॥ তিন ॥

মফস্বল সহরের থামের সারি লাগান সেই পুরোনো বাড়ীর ছাদে ছেলেবেলায় একদিন বাজ পাখির শিকার কৌশল দেখছিলাম।

এক গোলা পায়রা ছিল তার লক্ষ্য।

চিড় খাওয়া বিদ্যুতের আঁকা বাঁকা রেখার ক্ষিপ্রতায় শিকারী বাজ পাখি ছুটে গেল গোলা পায়রার কাছে। দৃষ্টি আর গতি অদ্ভূত কৌশলে এক হয়েছিল লক্ষ্যভেদ করতে, তবু শিকার ফসকে গেল!

প্রাণ ফিরে পাওয়া গোলা পায়রা নীচে নেমে ছাদের আলসের ধারে বসল। পাখিটা নির্জীব হয়ে গেছে, প্রাণ থাকতেও প্রাণ নেই যেন! হাত বাড়িয়ে ধরতে চাই যদি, ও এখন নির্বিবাদে ধরা দেবে—শক্তি নেই, কোনো সামর্থ্যও নেই ওর আত্মরক্ষা করার।

ওর গলার বাঁ দিকের অল্প একটু জায়গা ধক্‌ধক্‌ করে উঠা-নামা করছে। প্রাণ গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে বোধহয়, আর একটু ভয় পেলেই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

ভীরু পাখিটাকে সত্যিই ভয় দেখাতে সাহস হয়নি সে দিন।

আজ এতকাল পরে সেই গোলা পায়রার কথা মনে পড়ল এই গাড়ীতে বসে।

নিজেও যেন ওই গোলা পায়রার মতই নির্জীব হয়ে বেঁচে আছি, কোন্ শিকারীর শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে তা কিন্তু অনুমান করতে পারছিনে, কারই বা শ্যেন দৃষ্টি এসে পড়েছিল এই আমার মত আধ-মরা মানুষটির ওপরে!

সে কথা থাক এখন।

ভবিষ্যত জীবনে বেচা-কেনা, লেন-দেনের চক্রান্তের কথা ভাববার অনেক সময় পাওয়া যাবে, এখন গাড়ী এগিয়ে চলুক।

গাড়ী এগিয়ে চলার সাথে পথে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে। সেই শব্দ থেকে উঠছে তারই রেশ - আবার খুরের ঠোকরের আওয়াজ, আবার আওয়াজের রেশ ...ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি! তারই ভেতর দিয়ে গাড়ী এগিয়ে চলেছে।

আমার নির্জীব মনে ওই শব্দের তরংগ এসে নাড়া দিয়েছে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি! এরই ফাঁক দিয়ে সময় গলে যাচ্ছে। যেন আমাদের মুখোমুখি এগিয়ে আসছে সময়ের স্রোত। ভবিষ্যত বর্তমানের মুখোমুখি এগিয়ে এসে কোন অতর্কিতে মিশে যাচ্ছে বর্তমানের সংগে, আর বর্তমান তার অজস্র মুহূর্ত নিয়ে আমাদের সংস্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠছে। তার পরেই সে-বর্তমান আবার পুরোনো হয়ে আর এক নতুন বর্তমানকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। অগ্রগামী জীবনে পুরাতনের মূল্য কমে গেল; চলতি পথে যা পেছিয়ে পড়েছে তার আর দাম কোথায়?

গাড়ী কিন্তু এগিয়ে চলেছে।

সেই সংগে গাড়ীর সরু ছিপ্‌ছিপে চাকাগুলো যেন ঘুরেঘুরে সময়ের আর পেছনে ফেলে আসা পথের হিসেব লিখে নিচ্ছে। যাওয়ার পথের খোতেন টানা হয়ে গেছে আগেই—এখন চলেছে ফিরতি পথের জাবদা হিসেব!

গাড়ীতে বসে নিজেও যেন গতির হিসেব, সময়ের হিসেব আর জীবনের উঠা-পড়ার হিসেব খতিয়ে দেখছি।

ওপরে চামড়ার লাগাম হাতে কালের গতি নিয়ন্ত্রণ করছে কোচ-ম্যান; তার পায়ের তলায় পথচারীদের হুঁসিয়ার করার যন্ত্রে মাঝে মাঝে কর্কশ শব্দ তুলে সে খবরদারি ঘোষণা করে যেন বলছে—পথ পরিস্কার কর, আমার এগিয়ে চলার পথ আমাকে ছেড়ে দাও!

গতি আর শব্দের তরংগ তুলে ল্যাণ্ডো গাড়ী এগিয়ে চলছে!

সুসানাও বসে আছে গাড়ীতে। তার মাথায় এখনো ওড়না চাপানো। সে স্থির হয়ে বসে আছে। তার চোখের পাতা খোলা না বন্ধ—তা ঠাহর হয় না। কে জানে হয়তো বা গাড়ীতে বসেই সে

ধর্মের জটিল সূত্রগুলো আবার নতুন করে আবৃত্তি করে নিচ্ছে কি না! কারো শ্বাস প্রশ্বাস বওয়ারও শব্দ নেই গাড়ীতে, কেবল পথ থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ভেসে আসছে। অনুমানে মনে হচ্ছে সুসানার হাতে এক ছড়া রোজারি আছে। ওড়নার এক প্রান্ত এসে পড়েছে সেই হাতের ওপরে—তারই আড়ালে সেই মালাখানি তার তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের ফাঁকে ধীরে ধীরে ঘুরে চলছে। প্রতিটি পুঁতির ওপরে তার আঙ্গুল দুটি কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকছে, তারপরে সরে যাচ্ছে সেই পুঁতিটি—আর একটি নতুন পুঁতি এসে জায়গা নিচ্ছে সেই অপসৃত পুঁতিটির।

মনে হয়, ওই পুঁতিগুলি যেন টুকরো টুকরো আকাঙ্ক্ষা আমার—হঠাৎ এক সুতোয় জড়িয়ে গেছে, আঙুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুসানা সেগুলি পরখ করে নিচ্ছে।

এ কি অবাস্তব চিন্তা জুড়ে বসল মনে?

কল্পনা বিলাসের সময় নেই এখন; কাজ স্তূপাকার হয়ে চারিধারে জমা হয়ে আছে। সারা জীবন ধরেই বুঝিবা এই স্তূপীকৃত জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে, তাই কল্পনা বিলাসের অবসর কোথায় এই স্বল্প পরিসর জীবনে!

গাড়ীতে বসে কাজের একটা ক্রমিক হিসেব তৈরী করে নিই—সুসানাকে মেটকাফ ষ্ট্রীটে নামিয়ে আপিসে ফিরে বিক্রিনামার একটি মোসাবিদা তৈরী করে ফেলতে হবে। আজ রাতেই খসড়া-দলিলে সই দিয়ে পৌঁছে দেব সুসানাকে, কারণ আশ্বাসের চেয়ে নগদ বিদায়ের দাম অনেক বেশী মানুষের কাছে!

কাল সময় মত ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার জন্যে এ কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এখানে বসে এ ভাবনার দামই বা কতটুকু? সুসানা তো সামনেই বসে আছে···তাকে জিজ্ঞেস করলাম

—চুপ করে কি ভাবছ এত?

সে বললে

—কই কিছু না ! তুমি কি ভাবছ শুনি ?

—স্ট্র্যাণ্ডরোডে যাবার কথা।

সে জিজ্ঞেস করলে

—কেন, স্ট্র্যাণ্ডরোড যাবার কি দরকার পড়ল এখন ?

—আপিসের সংগে তো সম্পর্ক চুকিয়েছি সেই বেলা দুটোয়.... কিছু দরকারী কাজ ছিল যে !

আশ্চর্য হয়ে সে বললে

—কি আবার জরুরী কাজ পড়ল তোমার অমিতাভ ?

কাজ ছিল তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু কোনটা যে জরুরী আর কোনটা নয়, তার ফিরিস্তি নেই হাতের গোড়ায়, তাই বলতে হল

—বিক্রিনামার খসড়া ছকে ফেলতে চাই আজই।

সুসানা বাধা দিয়ে বললে

—কোনো তাড়া নেই, কাল তৈরী কোরো। মেহেবুব আলি সাহায্য করবেন তোমাকে।

স্ট্র্যাণ্ডরোডে ফেরার তাগিদ ফুরল এক কথায়। গাড়ী মেটকাফ ষ্ট্রীটেই চলুক তাহলে !

প্রার্থনা সভায় আহূত সকলেই চলে গেছে, এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথাও নয় তাদের। বাড়ীতে এখন থাকার মধ্যে আছেন সুসানার এক প্রৌঢ়া খুড়ি আর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী।

এঁদের দাম্পত্য জীবনের বৈচিত্র্য হল এঁদের বয়স নিয়ে, স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর বয়সই ঠেকে কম !

নিরীহ মানুষ এই স্বামীটি। ঢিলে-ঢালা ঝলঝলে পোষাক পরেন, তাতে আরো বেশী নিরীহ দেখায়—মনে হয়, স্ত্রীর তাঁবেদারী করার জন্যেই জন্ম এঁর। স্ত্রীর বর্তমানে আর কিছুর প্রতি উৎসাহ দেখান বা অপর কিছুর উমেদারী করা একেবারেই অসম্ভব !

জাঁদরেল খুড়ির তম্বি-তাউস চলছে হরদম আর তারই দাপটে

এই নিরীহ মানুষটি থতমত খেয়ে আছেন সদা-সর্বদা। প্রতিকারের কোনো পথ নেই, দুঃখও নেই তাই!

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সামনেই পড়ে পূব-পশ্চিমে টানা বারান্দা, বারান্দার এক কোনে একটি ক্যাম্পচেয়ারে বসে আছেন খুড়ি—পাশেই একটি ফরশে হুঁকো রাখা। চেয়ারে বসে হরদম তামাক টানছেন তিনি। ক্যাম্প চেয়ার আর ফরশে হুঁকো, এ দুটি যেন তাঁর দেহের দুটি অংগ বিশেষ, এই আনুষঙ্গিক দুটি বাদ দিয়ে তাঁকে কল্পনা করাই কঠিন!

চেয়ারে বসে গৃহস্থালীর তদারক চলছে—কত খুটিনাটি ব্যাপারের খোঁজ-খবর দেওয়া নেওয়া, কোনো ধরাবাঁধা হিসেব নেই তার; তবে ফরশে হুঁকোটি হাতের গোড়ায় থাকা চাই-ই, কলকেয় আগুন থাকুক আর নাই থাকুক!

খুড়ির নজর ভারি কড়া, তারই একটা ঝলক এসে পড়ল; কটা চোখের চাউনিই যেন জানিয়ে দিলে, মেজাজ মোটেই ভাল নেই—নিজের ভাল চাও তো সাবধানে সরে পড় বাপু!

এ ধরণের তিরিক্ষি মেজাজের কারণ অনুমান করতে কিন্তু কোনো অসুবিধে হয় না; তাঁর মনের ভাবখানা যেন—এই হাভাতের সংগে জুটে সুসানার ইহকাল একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল! পরকালের কথা না ভাবলেও চলে, কারণ সুসানার মত এমন ধর্মে মতি কজনেরই বা আছে আজ কাল?

খুড়ির যুক্তি কিন্তু সহজ পথে চলে না; তিনি বলেন—মানুষের ইহকাল না থাকলে পরকালই বা থাকে কেমন করে? এই বেজাত হতভাগার জন্যে দুকুলই খোয়ালে সুসানা; কি যে যাদু আছে ওর চোখে তা সুসানাই জানে!

যে ভাবেই পাশ কাটাও না কেন, খুড়ির আড় চোখের তেড়ছা নজর এসে পড়বেই! কখনো বা আক্রোশের গজরানিও কানে আসে; কিন্তু সুসানার ভয়েই ফেটে পড়ার উপায় নেই। চাপা আক্রোশ চাপাই থেকে যায়!

অমিতাভ চাটুয্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজী নন তিনি, তাতে কিন্তু কিছু যায় আসে না তাব। কারণ অনেক জোরালো স্বীকৃতি সে দখল কবে বসেছে এ বাড়ীতে।

এতক্ষণে ঝাঁঝাল স্বরে কথা কইলেন খুড়ি

—বেবিয়েছ তো সেই সন্ধ্যেয়, ফিবতে এত দেরী হল যে?

তাঁর কথা বলাব ভংগীতেই বিবক্ত হয়েছিল সুসানা। সে সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বললে

—তোমবা খেয়ে নাওনি কেন? আমাব অপেক্ষায় না থাকলেই হতো!

—সে কথা জানতে চাইনি, তোমাব দেরী হওয়াব কাবণ জানতে চাইছি।

কথায় আবাব ঝাঁঝ ফুটল।

চোখেব ইশাবায় সুসানা আমাকে তার ঘবে যেতে বললে। আমাবই বা কি দবকাব তাদেব ঘবোয়া কলহে উপস্থিত থাকার? ঘবে এলাম। কিন্তু বাইবেব স-তাপ কথা বার্তাব ছিটেফোঁটা যে কানে পৌঁছল না তা নয়—সেই ভাঙা কথাব টুকরো জুড়ে অনুমান কবতে পাবলাম, সুসানা গিয়েছিল তাদেব প্রধান ধর্মযাজকের কাছে, আর তাবই মুখ্য সাহায্য নিয়ে সে এই দুরূহ কাজটিব সমাধা করছে। এই কথাটুকু সরাসবি জেনে নিতে কত দ্বিধা এসেছিল মনে! সে প্রয়োজন নিজে নিজেই মিটে গেল।

বাইবেব বাক-বিতণ্ডা মিটিয়ে সুসানা ঘবে এল, অপ্রীতিকর আলোচনায় তার মুখে বিরক্তির ছাপ লেগেছিল। বাইরের লোকের সামনে গৃহ-কলহ সুরুচিব পরিচায়ক নয়, এক্ষেত্রে আবার সেই বাইরের মানুষটিই হল কলহের কারণ। ওদেব বিরক্তিকর প্রসংগ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি এই ভানটুকু সর্বাংগ-

সুন্দর করার জন্যে কাছের টেবিল থেকে সে দিনের দৈনিক কাগজখানায় আগে থেকেই মুখ আড়াল করে বসেছিলাম।

কোনো কথা কইলেনা সুসানা ঘরে এসে। হালকা প্রসংগের অবতারণা করে নিজের বিরক্তিও গোপন করার প্রয়াস দেখা গেল না তার হাবেভাবে। সে সরাসবি আলনার কাছে এগিয়ে গেল, তারপবে মাথা থেকে ওড়নাখানি তুলে নিয়ে আলনায় রাখলে। অনেকক্ষণ পরে তাকে আবাব হালকা দেখাল—তাকে যেন তার নিজের রূপে দেখতে পেলাম আবার।

আলনা থেকে ফিরে একটা চেয়ার টেনে বসে, মন থেকে বিরক্তির বোঝা সরিয়ে সে কথা কইলে

—অনেক জরুবী কাজ আজই তোমাকে সেরে নিতে হবে অমিতাভ! ইদরীশকে তাই খাবাব আনতে বললাম এখানে।

সত্যিই ক্ষিধে আর ক্লান্তিতে শরীব দুর্বল হয়েছিল। আমি বললাম

—ভালই করেছ।

ইদরীশ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে এল।

আজকের এ ব্যবস্থাটি নতুন, খাবার ঘর থেকে শোবার ঘরে এই আয়োজন আজই প্রথম টেনে আনলে সুসানা।

এই নতুন ব্যবস্থার সুতো ধরে, মন অতীতের দিকে অনেকখানি পেছিয়ে গেল—যে অতীতে অনেক আশা নিরাশার স্রোত বয়ে ছিল মনের তলায়—তারই টুকরো টুকরো স্মৃতি ছবির মত হঠাৎ ভেসে উঠল চোখের সামনে।

ব্রহ্মপুত্রের ধারালো স্রোত কেটে সেদিন আমাদের স্টীমার পাণ্ডুঘাট থেকে আমিনগাঁওয়ের দিকে এগিয়ে চলেছিল; ডেকে বসেছিল সুসানা ওমেরান। চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোতের সাথে পাল্লা দিয়ে আকাশের এলোমেলো হাওয়া ডেকের চারিধারে দিশাহারা ঘুরে মরছে, তারই

দুরন্ত উচ্ছ্বাস সুসানার গোছালো চুলে বহুবার অবিন্যাসের তরংগে ভেঙে পড়ল।

সারা দিনের ক্লান্তির পরে, অতর্কিতে সুখস্মৃতির একটি জানলা খুলে গিয়েছিল—তারই ফাঁকে অতীতের ঘটনাকে বর্তমানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম। সুসানার ডাকে চমক ভাঙল

—অমিতাভ!

আনমনে আমি বললাম

—কি?

সে বললে

—আজকের ঘটনায় নিশ্চয়ই বুঝেছ কি ভীষণভাবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমি?

তার দিকে ফিরে তাকালাম, মনে হল, স্থির বুদ্ধি আর অটুট ধৈর্যে গাঁথা পরিচিত সুসানা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে হঠাৎ। তার পোষাকি আচ্ছাদনগুলো সরে গিয়ে হঠাৎ আমার সামনে অন্য এক সুসানা দেখা দিয়েছে। বুঝলাম, গৃহ-কলহের কথাই বলতে চায় সে; তবু কিছু না বোঝার ভান করে জিজ্ঞেস করলাম

—কি হল আবার?

মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছিল সুসানা, সে বললে

—একেবারে সহ্যের বাইরে চলে গেছে আর সইতে পারি নে!

তাকে শান্ত করার জন্যে বললাম

—এক সাথে পাঁচ জন থাকলে অমন বাদ-বিবাদ হয়েই থাকে সুসানা; ও নিয়ে উতলা হলে চলে কি?

তার মনে কিন্তু অনেক দিন থেকে তিক্ততা জমেছিল—সংযতও সে করে রেখেছিল নিজেকে দীর্ঘকাল; আত্মপ্রতিরোধের বাঁধ একবার ভাঙতে সুরু করলে তাতে জোড়া-তালি দেওয়া সত্যিই কঠিন, তাই সে বিরক্ত হয়ে বললে

—ওই বুড়ি সারাদিন চেয়ারে বসে তামাক খাচ্ছে আর সকলের

ছুতো ধরছে ; নিজের গুণের তো শেষ নেই ! এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করলে আবার—আমি বাধা দিয়েছি তখন ?

এই অপ্রীতিকর প্রসংগ বন্ধ করার জন্যে বললাম

—থাক না সুসানা, আত্মীয় স্বজনের বিষয় অপ্রিয় আলোচনা··· হ্যাঁ, কি যেন কাজের কথা ছিল না তোমার ?

কিন্তু কোনো বাধা মানতে রাজী নয় সে—নিজের খেয়ালেই বলে চলল

—নিজের লোক তো ভারি ! মুখে খুড়ি বলি তাই আপন, নইলে কি সম্পর্ক আছে শুনি ? ওরা কেউ নয় আমার, কোনো আত্মীয়তা নেই আমার ওদেব সংগে ।

কথার মোড় ফেরাবাব জন্যেই এবার সোজা প্রশ্ন করলাম তাকে

—কি করতে চাও তাহলে ?

তার উত্তেজনা তখনও কিছুমাত্র কমেনি, তেমনি চড়া গলায় সে বললে

—এ বাড়ী ছাড়তেই হবে আমাকে, ওদের সংগ আর বরদাস্ত হবে না আমার !

আমি বললাম

—তা না হয় বুঝলাম ; কিন্তু কাব সংগ আপাতত তোমার বরদাস্ত হবে মনে কর ?

সে ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে

—তুমি আর জ্বালিও না আমাকে....যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাব একদিন ।

আমি বললাম

যদি চোখ আড়াল করে দাঁড়াই, যদি কোনো দিকে চোখ ফেরাতে না দিই ?

সে মাথা নীচু করে অস্পষ্ট গলায় বললে

—আমার কতটুকই বা জান তুমি ? আমার ঘর-দোর, দুঃখ-সুখ আর জীবন যাত্রার কতটুকু খবর রাখ ?

হঠাৎ ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠল ; আমি আর কথা কইলাম না। সুসানা আপন খেয়ালে বলে চলল

—জান, এ সংসার চলে কার টাকায় ? একটি কাণা কড়িও খরচ নেই ওদের। আমি বলে মুখ বুজে সহ্য করি ওই ব্যবহার ওদের, আর কেউ করত না, পারতও না।

সহানুভূতি জানিয়ে আমি বললাম

—তুমি তো এত উতলা হওনা কখনো—কি এমন ঘটল যাতে এত চঞ্চল হয়েছ আজ ?

সে বললে

—একদিনে কিছু হয় না, ব্যাপার অল্পে অল্পে বাড়ে, ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে বেঁচে থাকে, তার পরে একদিন মানুষের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়—তখন ঠেকা দেবার উপায় খুঁজে পায় না মানুষে। তাই, যা করতে হয় সময় থাকতেই কর অমিতাভ !

ওই ফরশেহুঁকো-টানা বুড়ি যে সুসানার অনাত্মীয়া এ খবর একেবারে নতুন আমার কাছে। ওদের সংগে তার মনের মিলও নেই, আত্মীয়তাও নেই ; তবে যারা সুসানার নিকটতম, যাদের সংগে তার রক্ত মাংসের সম্পর্ক তারাই বা কোথায় ? এই দীর্ঘ দিনের পরিচয়ের মধ্যে তাদের কোনো হদিসই জানা নেই আমার ! আমি তাদের চিনি আর নাই চিনি, তাতে কিছু যায় আসে না ; কিন্তু তারাই বা কেন এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন, আত্মীয়তাহীন, অশিষ্টাচারী এই অদ্ভুত মানুষ দুটির কাছে সুসানাকে ফেলে রেখেছেন ?

যে অদৃশ্য বাঁধনে নিজেকে সুসানার সংগে জড়িয়ে নিয়েছি তা শিথিল হবার নয় ; তাই, তার এই আত্মীয়তা-সম্পর্ক-শূন্য নিঃসংগ জীবন আমার মনকে পীড়িত করে দিলে। সারা দিনের নানা উদ্‌বেগের পরে এই অবসরটুকু নিশ্চিন্ততার তৃপ্তিতে হয়ে

উঠেছিল পূর্ণ; অকৃপণ হাতে এবই আয়োজন করেছিল সুসানা তার নিজের জীবনের তিক্ততাকে লুকিয়ে রেখে—সে বাঁধ এখন ভাঙে বুঝি!

অনাড়ম্বর খাওয়ার আয়োজন এলোমেলো ভাবনা আর কথা-বার্তার ফাঁকে শেষ হল। খাওয়া শেষ হতেই ইদরীশ উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। সুসানা এবার দেওয়াল আলমারি খুলে গালার সীল আঁটা একটা কড়ির বোতল বার করলে। বোতলের গলায় সবুজ সিল্কের ফিতে বাঁধা আর তার ছুট্ দুটো বোতলের মাথায় গালার সীলে জোড়া।

বুড়ো আঙুলের চাপে সীল ভেঙে বোতল আর একটি ছুরি এগিয়ে দিয়ে সুসানা বললে

—খুলে ফেল ঢাকনা। অনেকদিন থেকে পড়ে আছে এটা, বহুকাল আগে মরোক্কো থেকে ভেট এসেছিল—তোমার বিপদ-মুক্তির উৎসবে লাগুক আজ অমিতাভ!

ছুরির চাপ দিতেই ঢাকা আলগা হয়ে এল বোতল থেকে। বোতলের গায়ে একটি পুরু ছিপি বাঁধা—কড়ির ঢাকনা সরিয়ে ছিপিটা শক্ত করে এঁটে দিলাম বোতলের মুখে।

সুসানা দুটি পাত্র আনলে।

সিল্কের ফিতের মতই গাঢ় সবুজ রঙের পানীয় ভরে নিলাম দুটি পাত্রে—স্বচ্ছ তরল পানীয় স্বচ্ছ কাচের পাত্রে টল্‌টল্‌ করে উঠল।

নিজের পাত্রটি আমি তুলে নিয়ে বললাম

—তোমার অখণ্ড স্বাস্থ্য কামনা করছি সুসানা!

তার পাত্রের সংগে পাত্র স্পর্শ করিয়ে নিতে সে অস্ফুট গলায় বললে

—সকল দুঃখের অবসান হোক!

কার দুঃখের অবসান চায় সুসানা, তার নিজের না আমার? যদি আমার দুঃখের কথা স্মরণ করে একথা বলে থাকে, তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! সে নিজেই তো আমার সমূহ পতন এবং সেই পতনকে

কেন্দ্র করে যে দুঃখ উদ্ভূত হতে পারতো তার নিরাকরণ করেছে। এই দুরূহ কাজটি যে কি ভাবে সম্পন্ন করেছে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জানার সুযোগ হয়নি ; তবে যে ভাঙা-ভাঙা অংশগুলি আমার কাছে ধরা পড়েছে, তারই সমন্বয়ে অনুমান করতে পারি যে, কারো সঞ্চিত অর্থে হাত পড়েছে সুসানার।

যাঁর সঞ্চিত অর্থে টান পড়ল, তাঁর হদিস নেই কিন্তু!

আরো অনেক প্রশ্ন এই সূত্রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—প্রধান ধর্মযাজকই বা কেন মধ্যস্থ হয়ে এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন সুসানাকে? সেই অর্থশালী মানুষটিই বা কে, তাঁরই বা কি দায় পড়েছিল ধর্মযাজকের অনুরোধে সুসানাকে কৃতার্থ করার? এই ধনী মানুষটির সংগে সুসানার কিসের সম্পর্ক? সখ্যের না আত্মীয়তার? এঁর আত্মগোপন করে থাকারই বা হেতু কি? ইনি তো অনায়াসেই এই সুযোগে সামনে এসে নিজের বড়মানুষিয়ানার কিছু পরিচয়ও জাহির করতে পারতেন!

পান পাত্রের পানীয় সুমধুর ; কিন্তু ঝাঁঝ আছে, শক্তি লুকিয়ে আছে স্বচ্ছ সবুজ পানীয়ে। ক্লান্তি দূর করার শক্তি, এলোমেলো চিন্তার জাল বুনে যাওয়ার শক্তি, সুসানার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকার প্রেরণা—তার সাথে নিজের পরমাত্মীয়তার সম্পর্ককে অদৃশ্য বাঁধনে শক্ত করে নেওয়ার আকুলতা; ভাবচঞ্চল মনে প্রতিটি রমণীয় ভাবনার জোড় গেঁথে, জোড় বেঁধে এক ধারায় টেনে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা! এই পানীয় জীবনের সকল বিভেদকে নির্মূল করে দিলে—সুসানার সংগে কোনো কালে কোনো বিভেদ নেই ; আমাদের জীবন তাই কানায় কানায় ভরে গেছে—এই কাচের আধারে রাখা পানীয়ের মতই জীবন আমাদের কানায় কানায় ভরে উঠে টল্‌টল্ করছে!

তবে দুঃখ কোথায়! কার দুঃখের কথা বলতে চায় সুসানা, তার নিজের?

কিন্তু ওই ফরশেটানা বুড়ি নিশ্চয়ই তার দুঃখের কারণ নয়, তা হতেও পারে না। কোনো আত্মীয়তার সম্পর্কই তো নেই তার ওদের সংগে—তবে কোন সূত্র ধরে এই বিষময় বোঝার সম্পর্কই বা তার গড়ে উঠেছে এদের সাথে ?

আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল সুসানার কথায়। সে বললে

—দুর্ভাবনাব বুঝি কোনো কালে শেষ নেই তোমার ?

—কেন ?

—সন্ধ্যে থেকেই তো মুখ ভার করে বসে আছ ; বিপদের আরম্ভেই তো তাব গোড়া মেরে দিলে, এখন আবার চিন্তা কিসের ?

চেয়ে দেখলাম খুশী ঝলমল কবছে তার দুই চোখে। উত্তরে বললাম আমি

—তোমার কথাই ভাবছি।

—তাই না কি ! কি ভাবছ শুনি ?

ভারি মিষ্টি কথা তাব ! আমি বললাম

—ভাবা-ভাবির ওপরে কারো হাত নেই, যা ইচ্ছে হয় ভেবে যেতে পার ; কিন্তু তা বলতে গেলেই বাধে গণ্ডগোল !

সে হেসে বললে

—বুঝেছি, গণ্ডগোল পাকাবার কথাই ভাবছ তুমি ! আর কিছু পার আর নাই পাব, ওটি পাকাতে যে সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ তো হাতে-নাতেই পেলাম আজ।

তার হালকা সুরে সুর মিলিয়ে আমিও বললাম

—জোট খোলাব মানুষ থাকলে জোটপাকাতেই বা দুর্ভাবনা কিসের ?

খুশী হয়ে সে বললে

—বেশ, দেখে নিও, আর কোনো দিন তোমাব পাকানো জোট খুলি কি না ; কি ভোগান্তিই গেছে সারাদিন—খবর রাখ তার ?

হাসতে হাসতে আমি বললাম

—তুমিই বা সে খবর দিলে কই, খোঁটা দেবার জন্যে বুঝি সব জমা করে রেখেছ ?

—বেইমান !

হাসিতে ফেটে পড়ে বললে সুসানা,

—দেখে নিও, ভবিষ্যতে তোমার জন্যে আর কিছু করি যদি !

খুশীতে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমিও হালকা জবাব দিলাম

—ভবিষ্যতকে তোমার কাছেই গচ্ছিত রেখে দেব তাহলে।

দুটি পাত্রে পানীয় ঢেলে নিলাম ; সকল দুশ্চিন্তার বোঝা সরে গেছে মন থেকে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সুসানা যে তৃপ্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, সরস পানীয়ের সাথে তারইস্বাদ নিচ্ছি যেন।

খানিক চুপ করে থেকে সুসানা বললে

—জান অমিতাভ পুরুষ মানুষের মুখে ক্লান্তির ছায়া ভারি অস্বস্তিকর। তোমার ক্লান্ত মুখ দেখে সত্যিই উদ্‌বিগ্ন হয়েছিলাম ; এখন সে ক্লান্তি একবারে মুছে গেছে—আমার নিজেকেও তাই কত হালকা মনে হচ্ছে এখন !

তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম

—ক্লান্তি ঘুচেছে, কিন্তু দুঃখ ঘোচে কই, সুসানা ?

অবাক হয়ে কি যেন ভেবে নিয়ে বললে

—দুঃখ ! কোথায় দুঃখ তোমার অমিতাভ ?

আমি বললাম

—সারা জীবন ধরেই তো দুঃখের বোঝা বইছি, এক মুহূর্তের জন্যেও ব্যতিক্রম নেই তার !

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কি যেন বোঝার চেষ্টা করলে, তারপরে গাম্ভীর্যের ছায়া নামল তার মুখে। সে বললে

—দেখ অমিতাভ, দুঃখ নিয়ে কখন সত্যের অপলাপ করো না। এ তো দুঃখের ভান করছ তুমি ; নিজেই ভেবে দেখ না কেন ?

তার ভাবান্তর দেখে আমি আর কথা কইলাম না, নিজের খেয়ালেই সে বলতে লাগল

—দারিদ্র্য আর দুঃখের ভান কোরোনা কখনো, এর চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই পৃথিবীতে।

হঠাৎ ঘরের আবহাওয়া যেন ভারী হয়ে উঠল তার কথায়; তার মুখেও পরিবর্তনের ছায়া পড়ল। সে যেন অন্য ভাব-রাজ্যের ভেতরে ঢুকে পড়ে আত্মগত আচ্ছন্নতার মাঝ থেকে কথা কইলে

—যে বোঝার কোনো আদি অন্ত নেই—তাই তো আমি বয়ে বেড়াচ্ছি এতকাল; বিশাল পাহাড়ের মতই ভার এর। দিনের পর দিন তো সেই ভারই সহ্য করে বেঁচে আছি! টের পেয়েছ কিছু—আঁচ করেছ কোনো দিন? এই অসহ্য বোঝাকে দুহাতে ঠেলে রাখি, নিজের অস্বীকার দিয়ে একে উপেক্ষা করি, নয়তো নিজেই যে পঙ্গু হয়ে যাব এর চাপে! অমিতাভ, দুঃখ বিলাসকে কখনো ঠাঁই দিও না মনে—এর চেয়ে বড় বোকামি আর কিছু নেই।

ঘরের ভারাক্রান্ত আবহাওয়ায় মানুষের দুঃখ দুর্দশার, মনো-বেদনার যাতনা যেন থমথম করে উঠল। তার মনের ভার হালকা করার জন্যেই বললাম

—ভারি মূল্যবান কথা শোনালে, নিশ্চয় মনে রাখব তোমার কথা!

পানীয় শেষ হয়েছিল, পাত্রে আবার তা পূর্ণ করে নিলাম—কোনো দুঃখ নেই, কোনো অনুশোচনা নেই, এখন ক্লান্তিও নেই এতটুকু! এক অপূর্ব মাধুর্যের আলোয় চারিধার যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—অনাগত দুঃখের ভয়ে নিজেকে কুঁকড়ে রাখার আর দরকার নেই।

ঘড়ির কাঁটা পৌনে দশটার দিকে এগিয়ে এল; সময় দেখে সুসানা বললে

—তোমার বেরিয়ে পড়ার সময় হল অমিতাভ, কাজের কথাগুলো ঝালিয়ে নিতে হয় এবার!

বললাম—বল কি করতে হবে এখন।

—মেহেবুব আলির সংগে তোমার পরিচয় নেই?

—আছে, তোমার এটর্নি সাহেব তো ?

—হ্যাঁ, গাড়ী নিয়ে সোজা চলে যাও তাঁর কাছে, দশটার পরে তাঁর দেখা পাবে।

বুকের ভেতর থেকে সীল মোহর আঁটা একটি খাম বার করে আমার হাতে সেটি দিয়ে সে বললে

—ভারি জরুরী আর গোপন কাগজ পত্র আছে এই খামে, সাবধানে রেখো। মেহেবুব সাহেবকে পৌঁছে দিতে হবে এগুলি, নিজের হাতে তাঁকে দিও কিন্তু !

—বেশ, তার পরে ?

—রাতে তাঁর দেখা না পেলে কাগজ হাত ছাড়া করো না, কাল ভোরে তাঁর কাছে পৌঁছে দিও তাহলে। তিনি যেমন নির্দেশ দেবেন সেই মত কাজ করো—এই গেল একদিক।

—অপর দিকের কি নির্দেশ তোমার ?

—ইদরীশকে তোমার সংগে যেতে বলেছি।

—বেশ।

—মেহেবুব আলির বাড়ী থেকে ওকে এস্‌রারের কাছে পাঠিয়ে দিও ; এস্‌রার, আমার সেই পুরোনো চাপরাশি—মনে আছে তো ?

—আছে, তারপরে ?

—এস্‌রার এলে তোমার ওখানে ওকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিও।

—তাই হবে।

—শুধু তাই হবে নয় অমিতাভ। এস্‌রার না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থেকো। ওকে সংগে নিয়ে ঘোরাফেরা করো কিন্তু !

আমি হাসতে হাসতে বললাম

—তাই হবে গো, ভাবনা নেই তোমার !

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ আমার মুখে, তারপরে জিজ্ঞেস করলে

—দোয়ারকা প্রসাদ পার্টিতে এসেছিল কেন ?

এ প্রশ্ন সত্যিই আকস্মিক, অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম

—কেন বল তো ?

সে কঠিন হয়ে বললে

—আমার কথার জবাব দাও আগে—কোথা থেকে জোগাড় করলে এই মূর্তিটিকে ?

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে আমি বললাম

—সোহনলালই পরিচয় করিয়ে দেয় এর সংগে।

—তাই নাকি! কি সূত্রে ?

—ডুবো জাহাজের ব্যাপার নিয়েই।

—তাই বুঝি! কি বলে সোহনলাল ?

—লক্ষ্ণৌ, কানপুরের বড় কারবারী দ্বোয়ারকা, ও সাতখানা গদির মালিক

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুসানা বললে

—ব্যবসায়ে বহু টাকা খাটছে, এই তো ?

—তাই বটে!

—হাত মিলিয়ে নাও ওর সাথে ; তোমার সব দুঃখু আসান হয়ে যাবে, কেমন না ?

এ প্রশ্নের জবাব যোগাল না আমার মুখে। সেই ফাঁকে সোহন-লালের পরামর্শগুলোর পেছনে যে গুপ্ত তাৎপর্য ছিল তার যাচাই করে নিতে সুরু করলাম আমি। সুসানা আবার জিজ্ঞেস করলে

—কোনো লেখাপড়া করনি তো ওর সংগে ?

—না, লেখা পড়ার কোনো কথাই কয়নি সোহনলাল এখনও।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও অমিতাভ! তুমি যে ওর সংগে জড়িয়ে পড়নি সেই জন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও!

কথা পালটে নেবার জন্যে আমি হেসে বললাম

—তা না হয় দিলাম ; কিন্তু তোমার কাজের ফিরিস্তি শেষ কর এবার—দশটা বাজতে চলল যে!

সুসানা বললে

—হাসি নয় অমিতাভ; ওদের কোনো ব্যাপারে নিজেকে জড়িও না আর তোমার কোনো কাজেও কখনও ঘেঁষতে দিও না ওদের। লোক ভাল নয় ওরা, কাজও করে না ভাল জাতের।

—তারপরে?

—এস্‌রারকে দিয়ে বাড়ীতে খবর দিও সহরের বাইরে গেছ তুমি, ফেরার স্থিরতা নেই।

—তাহলে বাইরেই কোথাও থাকার ব্যবস্থাও করতে হয় আমাকে!

সুসানা বললে

—কাজের কথা শেষ হোক তারপরে থাকার ব্যবস্থা। এস্‌রারকে সংগে করে সোলেমান হোসেনের সংগে আজ রাতেই দেখা করো—সোলেমান হোসেন, সেই চামড়ার কারবারী!

সোলেমানের বাড়ী কলকাতার অপর প্রান্তে। মেহেবুব আলির সংগে কাজ-কর্ম সেরে অত রাতে তার কাছে যাওয়ার যুক্তি খুঁজে পেলাম না, তাই বললাম

—ও কাজটা বরং কালকের জন্যে তোলা থাক সুসানা—শরীরে এত ধকল সহ্য হবে না আজ!

আমার জবাব শুনে সে মাথা নেড়ে বললে,

—শরীরের কথা ভাববার সময় কোথায় এখন অমিতাভ? কালই সোলেমানকে দিয়ে চামড়ার রপ্তানী চুক্তি সই করিয়ে নিতে হবে তোমাকে! কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত ওকে আপিসে আটকে রাখা যে একান্ত দরকার তোমার!

—বেশী গরজে যদি কাজ বিগড়ে যায়?

সুসানা শক্ত হয়ে এবার বললে

—এতদিন কারবার চালাচ্ছ, কিসে কি হয় তাতো তোমাকেই ঠিক করতে হবে।

কি যেন ভেবে নিয়ে আবার সে বললে

—কাল সকাল সাড়ে দশটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত তোমার আপিসে সোলেমানের উপস্থিতি একান্তই জরুরী ; তা ঘটিয়ে নিও।

সোলেমানের উপস্থিতির গুরুত্ব না বুঝলেও এ কথা অনুমান করা শক্ত নয় যে, সুসানা বাইরে থেকে অনেক তথ্য জোগাড় করে একটা সঠিক পন্থা গড়ে নিয়ে কথা কইছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম

—কালই চামড়ার রপ্তানী চুক্তি কি সই না হলেই নয় ?

সে খানিক নীরব থেকে বললে

—লক্ষ্ণৌ থেকে চামড়া সরবরাহের খাতে দ্বোয়ারকা দাদন দিয়েছে সোলেমানকে। পরোক্ষ ভাবে এ কাজের ভেতরে সে ঢুকে পড়তে চায়—এই আর কি !

—তবে ?

—ডুবো জাহাজের বিক্রী শেষ করেই এই রপ্তানী চুক্তি ও হাতফের করে দিও ; সে কথাও মেহেবুব আলিকে আমি জানিয়ে দিয়েছি।

তার নির্দেশে দূরদর্শিতার আলো ছিল। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সে নিজের খেয়ালে বলতে লাগল

—প্রতিটি কাজ তুমি নিজে দেখে শুনে করো অমিতাভ। টাকাব জোরের সঙ্গে মানুষের লোক-বলও দরকার করে ; যদি ভাল মনে কর, এস্‌রারকে তোমার কাজে লাগিয়ে নিতে পার। ভারি বিশ্বাসী লোক এস্‌রার !

জবাবে আমি বললাম

—ঠিক কথাই বলেছ তুমি। বিশ্বাসী লোকের খুবই প্রয়োজন··· বিশেষ করে সোহনলালদের মত মানুষের পাল্লায় পড়লে···!

আমার কথায় সে যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে বললে

—জান অমিতাভ, আমার রক্তের অণুতে অণুতে কারবারের হিসেব লেখা আছে। এ বেদুইনের রক্ত নয়—তাই কোনো মতেই তোমার সাজানো কারবারের ক্ষতি সইতে আমি পারব না !

সে খানিক চুপ করে থেকে আবার বললে

—আমার মতামতের ভারে ভারাক্রান্ত করতে চাইনে তোমাকে। তোমার নিজের বিশ্বাস দিয়েই এই ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে; এই আমার বাসনা।

প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল তার কথায়। তবু তাকে খুশী করার জন্যে বললাম

—ভারি খাঁটি কথা বললে সুসানা! তোমার কথাগুলো ঠিক এই জন্যেই দামী আর গ্রাহ্য আমার কাছে।

আমার প্রশংসা কানেই তার গেল না, সে নিজের খেয়ালে বলতে লাগল

—কাজ শেষ করে তুমি এখানেই ফিরে এস আজ; এস্‌রারকে সংগে আনতে ভুল না যেন!

তারপরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে

—আর দেরী নয়, তুমি বেরিয়ে পড এবার। রাতে হয়তো আর দেখা হবে না তোমার সংগে—বড ক্লান্ত ঠেকছে নিজেকে এখন।

আমি সিঁডি বেয়ে নামতে নামতে তাকে বললাম

—তুমি ভাল করে বিশ্রাম কর—তাতে আমিও মনে মনে বিশ্রাম পাব আর নিশ্চিন্তও হব।

তবু তার সাথে দেখা হল। রাত্রি তখন গভীর।

সব কাজগুলি খুঁটিনাটি শেষ করেছি—সোলেমান হোসেনকে রাজী করিয়েছি চামড়ার রপ্তানী চুক্তি সই করে দিতে পরের দিন সকালে।

এস্‌রার খবর দিয়ে এসেছে বাড়ীতে,—সাহেব কলকাতার বাইরে গেছেন, রাতে তিনি বাড়ী ফিরবেন না।

মেহেবুব আলি আল্লার কাছে দোয়া চেয়েছেন আমার জন্যে। তিনি বলেছেন, তাঁর সমস্ত সাহায্য দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন তিনি।

গাড়ী ফিরে এলে দরোয়ান সেলাম ঠুকে গাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছে। এস্‌রার আর ইদরীশ দেহরক্ষীর মত আমাকে অনুসরণ

করেছে বাড়ীর ভেতর পর্যন্ত। কোনো ত্রুটি হয়নি—তালও কাটেনি কোথাও। যেটুকু অভাব ছিল সুসানা নিজেই পূরণ করে দিতে এল এখন এই গভীর রাতে।

সে গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলের জোব্বা না কি এক অদ্ভুত পোষাক পরেছে; সন্ধ্যার সে পোষাক তার পরণে নেই। ওড়নাটি কিন্তু মাথায় চাপানো আছে ঠিকই। সে ঘরে এসে দাঁড়াল। এমনিই একটা কিছু আশা করছিলাম মনে মনে—তাই অবাক হলাম না তার উপস্থিতিতে। সে ডাকলে

—অমিতাভ!

আমি উত্তর দিলাম

—বল।

—কাজের ফিরিস্তি দেওয়া নেওয়া শেষ করেছি সেই তোমার বেরিয়ে যাওয়ার আগে—কাজের খবর নিতে আসিনি এখন।

আমি বললাম

—ভালই করেছ; কাছে এস তুমি!

বেতের মোড়াটা টেনে বিছানার পাশে বসল সে মাথা নীচু করে; চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। চিল-কোঠার অপরিসরতার মধ্যে আবার এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি হল—ঘরের অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে জোরালো অনুভূতিগুলি যেন জোট পাকিয়ে উঠতে চায়!

সুসানা মাথা নীচু করে আছে। ওড়নার আড়ালে তার মুখাবয়ব পরিষ্কার দেখা যায় না—তাতে যেন আরো রহস্যময়ী মনে হয় তাকে। সে চাপা গলায় কথা কইলে

—অমিতাভ!

ঘরের নৈঃশব্দে আকারহীন অনুভূতিগুলো যেন শব্দের প্রত্যাশী হয়েছিল, তার আহ্বান যেন আমাকে আরো কাছে টেনে নিলে তার। আমি জিজ্ঞেস করলাম

—কি বলছ?

সে আবার কিছুক্ষণ চুপকরে রইল, তার পরে বললে

—সে যে অনেক কথা অমিতাভ!

আমি বললাম

—অনেক কথাই তো শুনতে চাই তোমার কাছে।

তার মনের চারিধারে কিন্তু বাধার এক দুর্লংঘ প্রাচীর খাড়া হয়ে উঠেছিল। সেই প্রাচীরের সকল বাধা দূর করে দিতে হবে তাকে—নিজেকে ভারমুক্ত করার এছাড়া আর কোনো পথ নেই তার। সে বললে

—সে যে ভারি অপবিত্র কথা অমিতাভ! তাই তো প্রার্থনা দিয়ে নিজেকে শুচি করে নিতে চাই, তাই তো ঈশ্বরের কাছে নিজের সকল মলিনতাকে উজাড় করে দিতে চেয়েছি এতদিন—এখনও তাঁকে সেই কথাই জানালাম; কিন্তু তৃপ্তি পেলাম কই! তুমি শুনবে, শুনতে পারবে কি তুমি সেই কুৎসিত কাহিনী?

সে দ্বিধাহীন চোখে তাকাল। তার দৃষ্টিতে সংকোচ নেই, মলিনতা নেই—প্রার্থনার বারি সিঞ্চনে তা একেবারে অনাবিল! আমি বললাম

—বল।

ধীরে ধীরে কথা কইলে সে। তার গলার স্বর এত স্তিমিত যে অবহেলা করে তা শোনার উপায় নেই। সে বলতে সুরু করলে

—নিজের দুঃখের কথা কি বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে ইচ্ছে করে অমিতাভ; তার দরকারই বা কি—নিজের দুঃখের জোলো কথা কয়ে? কিন্তু তোমার কাছে না এসে থাকতে পারলাম না!

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম

—ভালই তো করেছ সুসানা; আমিও যে মনে মনে চাইছিলাম তোমাকে! মন হালকা কর, সব ভার নামিয়ে দাও তোমার মন থেকে। সে বললে

—কিন্তু কি করে নিজের মুখে বলি সে কথা? সে যে ভারি নোংরা, ভারি কুৎসিত কাহিনী অমিতাভ!

বাইরের তারা-ভরা আকাশে তাকিয়ে আমি বললাম

—ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ একবার—কি অপরিসীম

কালোর মধ্যে আলোর হাট বসেছে ওখানে। আলোর এক স্নিগ্ধ রূপ ফুটে আছে ওই কালো জমির ওপরে। সমগ্রের রূপ দেখা দিয়েছে, তাই কোনো দ্বন্দ্ব নেই, কোনো মলিনতা নেই ওখানে!

চিল কোঠার খোলা দরজা দিয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। সংখ্যাহীন জ্যোতিকণা সেই অন্ধকার ব্যাপ্তির মাঝে তাদের মেদুর প্রভায় কোনো এক চলমান অচেনা রাত্রিকে যেন পথ দেখিয়ে আগামী সকালের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে—গতির স্পন্দনে তারা কখনো উজ্জ্বল, কখনো বা ঈষৎ ম্লান।

সেই আকাশের দিকে চেয়ে সুসানা বলতে লাগল

—এই যে আমি এখানে আছি—কেন আছি এখানে? এ তো আমার থাকার জায়গা নয়! কার অস্বীকারের জন্যে এ দশা আমার? এ পৃথিবীতে এর চেয়ে অনেক রমণীয় অনেক স্নেহপ্লুত আশ্রয় ছিল আমার; কিন্তু তার কোনো ঠিকানাই আমার জানা নেই। এখানে এই দুঃখময় পরিবেশের মধ্যে পেয়েছি শুধু গচ্ছিত সম্পদ, টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত—এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু আমি যে সমস্ত মন দিয়ে এই সব সম্পদকে ঘৃণা করি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম

—কেন এই ঘৃণা সুসানা?

ওড়না আরো ভালো করে সে টেনে নিলে মাথায়। আমার প্রশ্ন তার কানেই গেল না। সে যেন নিজের খেয়ালের ঘোরেই বলতে লাগল

—সেই গচ্ছিত টাকায় হাত দিয়েছি আজ—তাই আবার জানতে চাইলাম, কে ওই সম্পদ যুগিয়ে গেছে আমার জন্যে? এর আগেও এ কথার জবাব মেলেনি আমাদের ধর্মযাজকের কাছে—আজও তা পাইনি। তাঁকে বললাম, জানতেই হবে আমাকে, কার উচ্ছিষ্ট অর্থে আমি প্রতিপালিত হয়েছি। তিনি জানালেন, এখনও অধিকার হয়নি আমার সে কথা জানার···! ভেবে দেখ অমিতাভ, নেওয়ার

অধিকার আছে ; কিন্তু জানার কোনো অধিকার নেই ! এ যে কি বিড়ম্বনা তা বুঝতে পার কি তুমি ?

সে খোলা আকাশের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ নিজের ভাবনায় ডুবে রইল তারপরে বললে

—ওরা কোনো দিনই জানাবে না ; চিরকাল লুকিয়ে রাখবে—ওই ফরশে-টানা বুড়ী আর আমাদের ভীরু ধর্মযাজক। তবু তো সেই টাকাই নিলাম ! তুমি ভুল বুঝনা আমাকে অমিতাভ, এ নেওয়া তোমার জন্যে নয়—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রতি নিয়তই তো ওই টাকাই নাড়াচাড়া করছি।

তাকে বাধা দেবার সাহস হল না ; মনের সমস্ত সঞ্চিত বিষ সে উগ্‌রে দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ হালকা করে নিক এতদিন পরে।

সুসানা বললে

—তোমার বিপদকে নিজের বিপদ মনে করেছি, তাই তো এত কাছে আসতে পারলাম তোমার। তাই তো এখন নিজেকে নিজের মধ্যে যেন খুঁজে পাচ্ছি। তুমি সামনে আছ, তাই তো বুঝে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে আমার নিজের অস্তিত্বকে। জানিনে, একেই বোধহয় মানুষ একান্ত সান্নিধ্য বলে ! তোমার কাছে গোপন করার আর কিছু রইল না আমার—তুমি শুনে নাও, তুমি জেনে নাও—আমি জারজ, জন্মের কোনো নিশানা নেই আমার।

একি কথা শোনালে সুসানা ? মূঢ়ের মত বসে রইলাম আমি। সময়ের হিসেবে হঠাৎ জোট পাকালো। আবার নিজের অজ্ঞাতে এক সময় খুলেও গেল সে জোট।

আমার মুখে তখন ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হল ; তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম

—ঈশ্বরের চোখে তো কোনো প্রাণীই জারজ নয়, সুসানা !

॥ চার ॥

আবার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল—চারিদিকে নির্জনতা আর অন্ধকারের ঠাস বুনোট, তারই মাঝে নিজের মতলবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল আমাকে।

আরো কাছে এগিয়ে এসেছে সে। ছুজনের মধ্যে যেটুকু দূরত্বের ব্যবধান ছিল তা আরো কমে গেছে এখন। সে জোরে কথা কইছে না—খুব চাপা স্বর তার; ভয় বুঝি বা অবাঞ্ছিত কেউ শুনে ফেলে এই আলাপ আমাদের!

সে আগে কথা কইলে

—দেখলে তো! নিজের অজ্ঞাতে কি কাহিনী গাঁথা হয়ে আছে? এ যেন খোদাই করা কারুকাজ কলংক ধরা পেতলের চাদরে; জমির জেল্লা নেই, রেখা জোরাল হয়ে উঠেছে তাই। ভারি জ্বলজ্বলে কথা বলেছিলে কিন্তু—ভারি দামী কথা!

—দামী?

আশ্চর্য হলাম তার কথায়, জিজ্ঞেস করলাম

—কোন্ কথা আবার দামী শোনাল তোমার কানে?

সে বললে

—ওই যে, সুসানাকে যে কথা বলেছিলে সেদিন; ঈশ্বরের চোখে কোনো প্রাণীই জারজ নয়। ভারি সাচ্চা কথা কিন্তু!

—ওই কথা!

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেন! জিজ্ঞেস করলাম

—এমন কি দামী পেলে ওর মধ্যে? হঠাৎ মনে এসেছিল, বলেওছিলাম তাই! ও খেয়ালের কথা—ওর দাম-টাম নেই।

সে চুপ করে রইল। নিজের মনের তলার দিকটা বোধহয় হাতড়ে দেখে নিচ্ছিল তাই কথা কইলে না অনেকক্ষণ।

আমি নিজেও ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম, কতটুকুই বা ওজন ছিল ও উক্তির পেছনে। কথার পিঠে আর এক কথা বৈ আর কিছু

নয়; কিছু বলতে হয় তাই বলা! তাও আবার কোন্ কালের ঘটনা—ও নিয়ে অকারণ ভাবনা-চিন্তার কি থাকতে পারে?

তবে চাঞ্চল্য হয়ে ছিল ঠিকই! তাও বা কদিনের জন্যে? উথলে-ওঠা দুধের ফেনা মরতে কতটুকুই বা সময় লাগে!

সে আস্তে আস্তে বললে

—অমিতাভ, হঠাৎ যে কিছুই হয় না এ পৃথিবীতে! আমরা মনে করি এটা হঠাৎ হল, ওটা হঠাৎ হয়েছে; কিন্তু খুঁটিয়ে দেখ একবার—সব কিছুর পেছনেই একটা ধারা দেখতে পাবে; পদ্ধতির অসংখ্য ধাপ বেয়ে ওই হঠাৎকে উঠে আসতে হয়। অনেক সময় চোখের আলোয় তা ধরা পড়ে না—মনের আলোয় চিনে নিতে হয় তাকে। এতে ভুলচুক নেই কিন্তু!

প্রতিবাদের অস্ত্র আমার তৈরী ছিল কিন্তু প্রয়োগে বাধা পেলাম। কারণ সে যে নিজের খেয়ালেই বলতে লাগল

—এই যে রাত্রি এখন গাঢ় জমাট হয়ে উঠেছে, এ তো হঠাৎ হয়নি অমিতাভ! দিনের প্রতিটি প্রহর, প্রতিটি মুহূর্ত নিজেদের যুক্ত করে দিয়েছে এই গভীরতায়—এর পেছনে কত কালের ইতিহাস জমা হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ না?

হো হো করে হেসে উঠলাম তার কথা শুনে; ফাঁকা কথার জারিজুরি দিয়ে সে বিলকুল ভুলিয়ে রাখতে চায়, সন্দেহ করার কিছু নেই এতে! আমি বললাম

—তুমিই তো নিজেকে কেমন ধোঁয়াটে করে ফেলছ। ওই জমাট অন্ধকারের পেছনটা যে একেবারে ফাঁকা তা কি জান না তুমি?

সে বললে

—জানি, ভাল করেই জানি অমিতাভ!

আমি আর সুযোগের অবহেলা না করে কোণ-ঠাসা প্রশ্ন করলাম তাকে

—তবে কি বোঝাতে চাইছ আমাকে এতক্ষণ ধরে?

সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ—তার পরে সহজ গলায় বললে

—সুসানার দুঃখের সামনে দাঁড়িয়ে, তার কথা বলতে গিয়ে কার দুঃখময় জীবনের কথা মনে এল তোমার? তার কথাই না এড়িয়ে চলতে চেয়েছ এত কাল—এখনও তারই কথা সরিয়ে দিচ্ছ তোমার মন থেকে!

ভারি কড়া সওয়াল তার, তাই পাশ কাটিয়ে বললাম

—বদরিকাকে নিয়েই তো যত হাঙ্গামা, তাই তার কথাই মনে পড়ছে বার বার।

সে গম্ভীর গলায় বললে

—উঁ হুঁ, বদরিকার কথা নয়—এই তো বললে তারই কথা! কার কথা, কার স্মৃতি সজীব দুঃস্বপ্নের মত তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ এতকাল ধরে?

নিজেকে শক্ত করে নিয়ে চারিপাশে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম একবার—কেউ আড়িপেতে আছে কি না! কিন্তু কে থাকবে এখানে? কেবল নিশুত রাতের অন্ধকারে চারিদিক ভারাক্রান্ত হয়ে আছে—জন মানবের চিহ্ন নেই কোথাও।

কি যেন ভেবে নিয়ে সে বললে

—বদরিকাও তো হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি তোমার জীবনে—সেও মোটেই আকস্মিক নয়। সোহনলাল আর দ্বোয়ারকাপ্রসাদের তৈরী করা সিঁড়ি বেয়েই তোমার জীবনে তাকে উঠে আসতে হয়েছিল একদিন।

আমি বললাম

—সে কথা ঠিক, তা মোটেই অস্বীকার করিনে আমি।

—তবে কার কথা তুমি এড়িয়ে যেতে চাইছ অমিতাভ?

প্রশ্ন নয়—যেন অনুজ্ঞা লুকোনো ছিল তার কথার আড়ালে; আমি কেমন আনমনা হয়ে বললাম

—মফস্বল সহরের সেই থামের সারি লাগানো বাড়ীর দিকে মন এগিয়ে চলেছে—সেখানে ফেরার তাগিদ পেয়েছি নিজের মনে।

সে আর কথা কইলে না; শোনার তাগিদেই অপেক্ষা করে রইল

খিড়কি পুকুরের দরজা দিয়ে সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটায় ঢুকে পড়েছি।

সারা বাড়ীতে নিশ্চিন্ত পরিবেশ—তাড়াহুড়ো নেই কোথাও; কোনো ব্যস্ততাই নেই! বাড়ীর চওড়া চওড়া দেওয়ালগুলো যেন গাম্ভীর্য দিয়ে গাঁথা; সস্তা তাড়াহুড়োর কোনো তোয়াক্কা করে না। অখণ্ড আয়ু ওদের, তাড়া নেই তাই—দ্বিরুক্তিও নেই কিছুতে!

এই তো দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ-হাতি নিরিমিষ হেঁসেল ঘর; মা আছেন ওখানে।

এ হেঁসেলে ঠাকুরের ভোগ রান্না হয়। মায়ের নিত্য কাজ এটি। তিনি ছুটি নিলে মামীমার ওপর ভার পড়ে একাজের।

নিরিমিষ হেঁসেল ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। মা ঠিক বুঝতে পেরেছেন আমি এসেছি; সাড়া দেননি কিন্তু!

আমিই বা আগে সাড়া দিই কেন? তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

ঘরে দক্ষিণ মুখো দরজা; পশ্চিমমুখো উনুনের সামনে বসে রান্না করছেন তিনি। বাইরে থেকে তাঁর পিঠের দিকটুকু চোখে পড়ে—সাদা থান কাপড়ের আঁচলের ওপরে তাঁর ভিজে চুল এলান, চুলের নীচের দিকে গেরো বাঁধা।

উনুনে আঁচ গনগন করছে, তাই কোনো দিকে ফিরে দেখার সময় নেই—হাতের কাজ নিয়েই ব্যস্ত তিনি। মা আগে কথা কইলেন

—কে রে, অমি বুঝি?

এতক্ষণে সাড়া দিলাম আমি

—হ্যাঁ মা!

—এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে ?

—এমনি-ই !

—কিছু বলবি বুঝি ?

আমি বললাম

—হ্যাঁ মা, কথা আছে ; উঠে এস না একটু !

মা বললেন

—একটু সবুর কর বাবা ; দুনিয়া-যজানো কাপড়ে ভেতরে চলে আসিসনে যেন ! হাতের কাজ সেরে আমি আসছি এখুনি ।

কয়লার চুলোয় ও হেঁসেলে রান্না হয় ।

ঠাকুরদের রান্না হয় কাঠের জ্বালে ; তাঁদের সব ব্যবস্থাই আলাদা—হেঁসেল, কাঠের উনুন, পাথরের থালা গেলাস—সব আলাদা বন্দোবস্ত তাঁদের জন্যে ।

জ্বলন্ত কাঠগুলো উনুনের সামনে টেনে নিলেন মা আঁচ কমিয়ে নিতে—উনুনে তখন ডাল চড়ান ।

তিনি চৌকাঠের কাছে উঠে এসে বললেন

—বল, কি বলবি !

মায়ের গলার স্বর খুব নরম, কথাও কন তিনি ভারি আস্তে আস্তে। তাঁর কথায় তাড়া হুড়োর রঙ নেই। তিনি যেন এই বিশাল নির্বাক বাড়ীর অবাঙময় ভাষায় শব্দের যোগান দিচ্ছেন—যেমনটি দরকার ঠিক তেমনটি ; বাহুল্যের আঁচ নেই কোথাও।

তাই বা হবে না কেন ? মা যে এ বাড়ীর মেয়ে, তাই সারা বাড়ীটার সংগে তাঁর এত মিল !

রূপ নেই তাঁর : দরকার নেই রূপের, তাই ওই বাড়তি জিনিষটুকু নিজে নিজেই বাদ পড়েছে।

মায়ের কাছে এলেই আমার কথাগুলো কেমন ওলট-পালট হয়ে যায়—হঠাৎ হারিয়ে যায় সব সাজান কথাগুলো। তাই চুপ করে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। মা বললেন

—কি বলবি, বল ; চুপ করে রইলি কেন ?

আমি বললাম

—ক্ষীরি কাকীর কথা।

—কি কথারে ! কি বলতে বললে ক্ষীরি ?

অমনি সাজানো গোছানো কথাগুলো নিমেষে হারিয়ে গেল ; আমি চুপ করে রইলাম।

মা জিজ্ঞেস করলেন

—ক্ষীরি বুঝি তোর ওপরে রাগ করেছে ?

আমি বললাম

—না, রাগ করেনি তো ক্ষীরিকাকী !

—তবে ?

কিন্তু সেই তুচ্ছ কথাই বা বলি কেমন করে ? তবু লজ্জা কাটিয়ে বললাম

ক্ষীরিকাকী যে গান গাইতে বলেছে আমাকে !

মা হাসতে লাগলেন। তার পরে বললেন

—তা গাইলেই পারতিস ! ক্ষীরির কাছে আবার লজ্জা কিসের ?

—এখন নয় মা—রাত্তিরে গাইতে বলেছে ক্ষীরিকাকী !

মা বললেন

—বেশ তো—রাতেই গাইবি !

আবার থেমে গেল কথা। আমি চুপ করে রইলাম ; দ্বিধা যে কোথায় আর কিভাবে জড়ান আছে তাতো নিজের কাছে অজানা নয় !

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বললেন

—ভোগ রাঁধার কাজ রয়েছে হাতে—এখন কি দেরী করিয়ে দিতে আছে ! বল বাবা কেন মন ভারী করেছিস্ ?

তাঁর চোখের ওপর থেকে আমার চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে আমি বললাম

—ক্ষীরিকাকী যে বলেছে তুমি ওবাড়ী যাবে না আজ !

মা হাসতে হাসতে বললেন

—ভালো জ্বালা ! আমি না গেলে তুই যাবিনে কেন বল তো ?

আমি মাথা নীচু করে বললাম

—ক্ষীরিকাকী যে বললে, মংগল কাজে যেতে নেই তোমাকে !

মুখের কথা এবার মুখেই মিলিয়ে গেল তাঁর—তিনিও চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ ; তার পরে বললেন

— ঠিকই তো বাবা—মংগল কাজে যেতে নেই যে আমাকে !

আমিও সরাসরি এক নিঃশ্বাসে বলে দিলাম

—তবে আমিও গান শোনাতে পারব না কাউকে।

যা বলার জন্যে ছুটে এসেছিলাম—এক নিমেষেই তা বলা হয়ে গেল ; কিন্তু কেন যে মংগল কাজে তাঁকে যেতে নেই, তা আর জানা হল না—মায়ের চোখ থেকে যে খুশীর আলো মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে !

ওদের বাড়ীতে আজ মাংগলিক কাজের আয়োজন।

আজ হিমিদির বিয়ে। বার-বাড়ীতে তাই নবত বসেছে সকাল থেকে।

নবতখানার উঁচু উঁচু শাল-খুঁটিগুলোর আগা গোড়া লাল সালু দিয়ে মোড়া। মাটি থেকে অনেক ওপরে, সেই খুঁটিগুলোর মাথায় চার চালার নবতঘর বাঁধা হয়েছে। উঁচু ঘরের সাথে তেড়ছা করে বাঁশের মই বাঁধা—নবতওয়ালারা উঠানামা করবে বাঁশের মই বেয়ে।

কি আনন্দ ! ওই উঁচু ঘর থেকে কতদূর পর্যন্ত দেখা যাবে—উত্তরে ভাগীরথীর সারা বাঁকটাই চোখের ওপর ভেসে উঠবে ওদের !

সাম্মু কাছেই দাঁড়িয়েছিল ; এতক্ষণ সে দেখতে পায়নি—আমাকে দেখেই ডাক দিয়ে বললে

—অমি, শীগ্‌গির এদিকে আয় ! এতক্ষণ ছিলি কোথায় বল তো ?

আমি বললাম

—পড়া শেষ করে এই তো এলুম ভাই ! তুই বুঝি খুঁজছিলি আমাকে ?

সান্নু হাসতে হাসতে বললে

—খুঁজব না ? হরদম্ তোর পড়া আর পড়া ! আজ আবার বই নিয়ে বসতে গিছ্লি কেন বল তো ? দেখছিস নে, কত উঁচুতে ঘর বাঁধলে ওরা সকাল থেকে ?

নবত-ঘরেব উঁচু চালের দিকে তাকিয়ে আমি যেন আরো বেশী অবাক হয়ে বললাম

—বেশ উঁচু কিন্তু—না রে ?

সান্নু আমার কথা না শুনেই ভারিক্কি চালে বললে

—ভারি বিপদ হয়ে গেল ভাই !

আমি জিজ্ঞেস করলাম

—কি, কি বিপদ হল আবার ?

সান্নু তাব ভুরু তুটো কুঁচকে বললে

—আমাদের আর ওপরে উঠতে দেবে না !

আমি জিজ্ঞেস করলাম

—তুই বুঝি উঠতে গিছলি ওপরে ?

সান্নু মাথা নেড়ে বললে

—না রে, না ! সিঁড়ির মাথাটা তখন ঘরের সংগে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হচ্ছে—বাবা নিজে ওখানে দাঁড়িয়ে কাজের তদারক করছেন ; আমাকে দেখেই হুকুম দিলেন ওদের—খবরদার, ছোটরা যেন ওপরে না ওঠে। ব্যাস, সব পণ্ড হয়ে গেল এক কথায় !

ভারি আক্ষেপ সান্নুর আর একটু দেরী করে এলে এমন অঘটন আর ঘটত না। আমারও দুঃখ হল বৈ কি ! কিন্তু আর উপায়ও নেই কোনো। সান্নু খানিক ভেবে আমাকে বললে

—একটা কাজ কর, অমি !

আমি জিজ্ঞেস করলাম

—কি কাজ ভাই ?

সান্নু বললে

—তুই বাবার কাছে যা, বুঝলি ? তুই বললে বকবে না।

যাবি আর বলবি——শুভোকাকা, আমরা নবত-ঘরে একবার উঠব কি?

—যদি বকে?

সান্নু গম্ভীর হয়ে বললে

—বল, তোকে আজ পর্যন্ত বকেছে কোনোদিন? যত বকুনি সব তোলা থাকে আমার জন্যে, তোর ভয় কি শুনি? যাবি আর বলবি—একবার উঠেই নেমে আসব শুভোকাকা! ব্যাস সব ঠিক হয়ে যাবে তা আমি বলে দিলাম তোকে!

শুভোকাকার খোঁজে সান্নু আর আমি ভেতর মহলে এলাম। ক্ষীরিকাকী বসে আছেন সামনের লাল সান বাঁধানো দালানে—পরনে তাঁর লাল চওড়া পেড়ে দিশী সাড়ী। আমাকে দেখে ক্ষীরিকাকী বললেন

—এই তো অমি এসে গেছিস! কাছে আয়।

ক্ষীরিকাকী মায়ের সই কিনা—তাই আমাকে খুব ভালবাসেন! ললিতা মাসিকে ডাক দিয়ে তিনি তখুনি বললেন

—ওরে লল্‌তে, অমিকে দুটো সন্দেশ দিয়ে যা তো!

শুভোকাকার কাছে আর যাওয়া হল না—ক্ষীরিকাকীর কাছেই আটকা পড়ে গেলাম।

ললিতা মাসি কাঁসার রেকাবিতে বড় বড় দুটো সন্দেশ আর ছোট্ট কাঁসার গেলাস ভরতি এক গেলাস জল নিয়ে এল।

ওই ছোট জলের গেলাস দেখলে কার না হাসি পায়! তবু ওই গেলাসেই আমাকে জল খেতে হয় এ বাড়ীতে।

সান্নুও তাই হাসে আর বলে

—অমি, তুই একেবারে ছেলেমানুষ! তা না হলে জল ভরতি গেলাস ফসকে যায় তোর হাত থেকে?

আসল কথাটা কিন্তু অত সরল—অত সোজা নয়।

ক্ষীরিকাকীর কি জানি কি ব্রত সে দিন। সকাল থেকেই নানা

আয়োজন—নানা হাঙ্গামা ওবাড়ীতে। সকালেই ও বাড়ীতে ডাক পড়ল আমার ; মা আমাকে ডেকে বললেন

—অমি, ক্ষীরি তোকে ডেকে পাঠিয়েছে—ওবাড়ী যা একবার।

এই সান বাঁধানো দালানে তিনি ফল-মিষ্টি নিয়ে বসে ছিলেন আমার জন্যে—কাঁসার রেকাবির পাশে বড় কাঁসার গেলাস ভরতি এক গেলাস জল রাখা ; তুলসী ঝি ওই পেল্লায় গেলাসে জল দিয়েছে আমার জন্যে। হাত ফসকে পড়ে গেল গেলাস—চারিদিক জলে নৈরেকার !

ক্ষীরিকাকীর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল রাগে—তিনি খুব বকলেন তুলসীঝিকে, বললেন

—এত বয়স হল, তবু তোর আক্কেল হল না ! ওই দুধের ছেলেটাকে এত বড় গেলাসে জল দিয়েছিস ? যা, এখুনি সিন্দুক থেকে ছোট গেলাস বার করে জল আন। যেখানে নজর নেই আমার সেখানেই গণ্ডগোল !

তুলসী মাথা নীচু করে চলে গেল। অমন মুখরা তবু সাহস হল না তুলসীর কথা কইতে।

ক্ষীরিকাকীকে সকলেই ভয় পায়—খুব রাগী মানুষ উনি ! শুভো-কাকাও ওঁর সংগে কথায় এঁটে উঠতে পারেন না ; তাঁকেও চুপ করে থাকতে হয় ক্ষীরিকাকীর সামনে। আমাকে কিন্তু খুব ভালবাসেন উনি—বলেন

—রতুর ছেলের মত শান্ত ছেলে কি আছে আর ? ভারি লক্ষ্মী ছেলে অমি !

আমাকে দেখলেই কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন ; এখনও কাছে টেনে নিলেন আমায়। জিজ্ঞেস করলেন

—সন্দেশ ভাল লাগল তো অমি ?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম

—হ্যাঁ।

ক্ষীরিকাকী খুশী হয়ে বললেন

—লাগবে না! দাদা কলকাতা থেকে সন্দেশ এনেছেন—খুব ভাল সন্দেশ! তোকে আরো সন্দেশ খাওয়াব, তুই যদি একটা কাজ করতে পারিস অমি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম

—কি কাজ কাকী?

ক্ষীরিকাকী খুব হাসি খুশী, তিনি বললেন

—হিমির বর আসবে আজ। তোর গলাটা ভারি মিষ্টি! গান শোনাতে হবে তোকে—বুঝলি! বিয়েব পরে, রাতে বাসর ঘরে গান শোনাতে পারবি তো?

আমি বললাম

—কেন পারব না কাকী? খুব পারব!

ক্ষীরিকাকী হাসতে হাসতে বললেন

—তুই যা লাজুক ছেলে—মেয়ে মানুষেরও বাড়া! লোক দেখলেই মুখ শুকিয়ে যায় তোর!

ক্ষীরিকাকীর কথায় একটুও না দমে আমিও খুশী হয়ে বললাম

—মা থাকবে তো! নিশ্চয়ই পারব—তুমি দেখে নিও!

ক্ষীরিকাকী খুব হেসে উঠে বললেন

—কি মা-ঘেঁষা ছেলেরে বাবা! মা সংগে থাকলেই বুঝি সব পারিস তুই? কিন্তু তোর মা আজ আসবে কি করে! মংগল কাজে যে আসতে নেই তাকে।

আমার সমস্ত উৎসাহ এক নিমেষেই নিবে গেল।

ঠাকুরদের গানগুলো যে মায়ের কাছেই শেখা আমার! মায়ের গলাও খুব মিষ্টি। আমি গান গাইলে তিনিও চোখ বুজে গাইতে থাকেন সাথে সাথে—তাঁর মুখের ভাব পালটে যায় তখন; মনে হয়, গানের সুরের সংগে তাঁর মনের কথাগুলো একেবারে এক হয়ে গেছে। এক ফাঁকে আমি চুপ করে যাই। মা কি করে আমার মনের কথা বুঝবেন? তিনি এক মনে গাইতে থাকেন—আমি তাঁর মিহি, মিষ্টি গলার আওয়াজ পাই আর তাঁর বোজা-চোখের দিকে

তাকিয়ে থাকি ! আমার গলা সুরের স্রোত থেকে সরে দাঁড়িয়েছে—তাঁর সুর কিন্তু তখনো গানের কলিগুলো বলে চলেছে।

কলি শেষ হলে তিনি চোখ মেলে চাইলেন—আমাকে জিজ্ঞেস করলেন

—থামলি যে ?

ক্ষীরিকাকী দালান থেকে উঠে পড়লেন ; সব কাজের তদারক করতে হচ্ছে তাঁকে—এক জায়গায় বসে থাকলে চলে কি !

আমিও চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম খিড়কি পুকুরের দিকে। এই পুকুরের পশ্চিমে ফলের আর দক্ষিণে ফুলের বাগান—পূবে সান বাঁধানো সিঁড়ি ঘাট।

সব ঋতুর ফুলে ফলে সাজান আমাদের এই খিড়কি বাগান। ঠাকুর পূজোর ফুল আসে এই বাগান থেকে—ঠাকুরদের নিত্য পূজোর ফুল। বাগানের গাছগুলো কতদিন থেকে এই কাজ করে চলেছে তার হিসেব নেই ! কালের পরিবর্তনে কেবল পুরোনো গাছের জায়গায় কখনো কখনো নতুন গাছ এসেছে, এই যা।

পেতলের ঝক্‌ঝকে সাজি হাতে মামীমা আর মা রোজ সকালে ফুল তোলেন এই বাগান থেকে—তার অনেক আগে তাঁরা স্নান সেরে নিয়েছেন এই খিড়কি পুকুরেই। ফুল তোলেন আর কথা কন দুজনে, দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা—একান্ত ঘরোয়া কাহিনী।

তাঁদের সব কথার পূর্বাপর ধারাগুলো সব সময়ে ধরে উঠতে পারি না—মনে হয় তার খানিক স্বচ্ছ, খানিক ঋজু, তবে সবটুকু নয়।

মা হয়তো কোনো দিন বলেন

—বউ, বাসব ঠাকুরের সেই স্বপ্নের ঘটনা বলিনি তোমাকে ? কত কাল আগেকার কথা !

মামীমা ফুল তোলা বন্ধ করে মায়ের দিকে তাকালেন ; নিজের মনে কি যেন ভাবলেন—তারপরে এক সময় বললেন

—কই মনে পড়ছে না তো দিদি!

তোলা ফুলগুলো সাজিতে রাখতে রাখতে মা বললেন

—জাগ্রত বিগ্রহ আমাদের স্বপ্ন দিয়ে বাসব পণ্ডিত মশাইকে জানালেন একদিন—চণ্ডীপুর মহালে বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে! ও তল্লাটে একেবারে জল হয়নি সে বছর; প্রজাদের মুখে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই পরনে—চারিদিকে হাহাকার! মহামারীর কালো ছায়াও দুর্গতদের ঘরে ঘরে উঁকি দিতে সুরু করেছে। জাগ্রত কুলদেবতা আমাদের স্বপ্নে এর প্রতিকারের পথও বলে দিলেন বাসব পণ্ডিত মশাইকে।

নানা কালের নানা কাহিনী এ বাড়ীর; কত মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই সব কাহিনীর ভেতরে। কত চেনা অচেনা নাম, কত জানা অজানা ঘটনা—তারই খেই ধরে এই বিশাল বাড়ীর দীর্ঘ জীবনধারার খণ্ডিত পরিচয় পাই। এই ধরণের ঘরোয়া কথা-বার্তাই যেন এই বিশাল বাড়ীর সংগে পরিচয়ের দরজা খুলে দেয়। অতীতের কত শত মানুষ, তাদেরই ভাবধারা অবলম্বন করে গড়ে ওঠা বহু প্রাচীন পরিবেশের মধ্যে দিয়েই যেন একে দেখতে পাই কখনো কখনো। চারিদিকের জমজমাটের মধ্যে এ নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে সেদিন—নির্জনতার বোঝায় এতটুকুও ক্লিষ্ট নয়! কত লোকজন, উৎসবব্যসন—জন্মমৃত্যুতে মুখর অতীত যেন আজকের নির্জনতার রোমন্থনে তারই স্বাদ নেয়। প্রাচীন কাহিনীর জানলাগুলো খুলে যায় কখনো কখনো—সেই গবাক্ষ দিয়ে অতীতের দিকেই যেন তাকিয়ে দেখে এই বিশাল বাড়ী; কিন্তু দূরপ্রসারী অতীতের দাগগুলো যে ম্লান হয়ে এসেছে, তাই বিস্মিত হতে হয়, চিনতেই অসুবিধে হয় নিজেকে!

বাগানের গাছগুলো কিন্তু সতেজ; নিত্য নৈমিত্তিক কাজে কিছু মাত্র গাফিলি নেই ওদের। প্রতিদিনের ফুলের সম্ভারে ওরা নিজেদের পূর্ণতা বয়ে আনে।

বাগানের সব গাছগুলোকেই চিনে নিয়েছি—ওদের সব কথাই যেন জানা হয়ে গেছে আমার। ওই যে মাথা উঁচু চাপা গাছ,

ওর কথাও জানি; কাশী থেকে ওই গাছ খিড়কি বাগানে এল একদিন। এতটুকু ছোট চারা, দাদু এনেছিলেন কাশী থেকে। আজ আকাশের একদিক আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে দাদুর হাতের পোঁতা ওই চাঁপাগাছ। মায়ের কাছে শুনেছি, দাদু সেদিন বলেছিলেন—আমি যখন থাকব না তখনও ও গাছ ফুল দেবে; ঠাকুরদের নিত্য পূজোর ফুল! এ সব অনেক আগেকার কথা; মায়ের কাছে শোনা কাহিনী আমার। আমি যে তখনও হইনি! মায়েরই বয়স তখন মাত্র আট বছর। দাদুর পূজো করা শেষ হয়ে গেছে, তিনি নেই আজ; কিন্তু এখনও ওই মাথা-উঁচু চাঁপা গাছ ঠাকুরের নিত্য পূজোর ফুল যুগিয়ে দেয় আর দাদুর কথাই মনে করিয়ে দেয় ঠাকুরদের কাছে।

এ বাগানের কত গাছ তো দাদুর কাছ থেকে চিনেছি; এই যে কাঠ-মল্লিকা—এ নাম তো আমার দাদুর কাছেই শেখা।

হিমিদিও জানত না এই কাঠ-মল্লিকা ফুলের নাম; আমিই তাকে শিখিয়ে দিলাম একদিন। এই তো কদিনেরই বা কথা!

হিমিদি আমাকে বললে

—বেশ টগর এনেছিস তো অমি! ফুলগুলো দিবি আমায়?

সব ফুলগুলো তাকে দিয়ে বললাম

—এগুলো কিন্তু টগর নয় হিমিদি, এ হল কাঠ-মল্লিকা!

ফুলগুলো খোঁপায় গুঁজে নিতে নিতে হিমিদি বললে

—তুই অনেক ফুলের নাম জানিস অমি, না?

খুশী হয়ে আমি বললাম

—জানি হিমিদি! খিড়কি বাগানে যত রকম ফুল ফোটে, তাদের সব নাম শিখে নিয়েছি; তোমাকেও শিখিয়ে দিতে পারি—শিখবে তুমি?

হিমিদিও খুব খুশী হয়ে বললে

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই শিখে নেব একদিন তোর কাছে, বুঝলি?

কিন্তু আজো হিমিদি শিখে নিতে পারেনি! ওই তো নবতের

সুর শোনা যাচ্ছে—ঝিমিদির বিয়ের নবত; আর কি ফুল চেনার সময় হবে তার ?

উঁচু নবত ঘর থেকে ভেসে-আসা সুর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খুব চেনা গানের সুর বাজাচ্ছে নবতওয়ালা—তাই কথাগুলো ভারি চেনা চেনা মনে হচ্ছে; কিন্তু গানটা ঠিক করতে পাচ্ছিনে এখনও।

এই বিশাল বাড়ীর সাথে খিড়কি পুকুরের যে দরজা দিয়ে যোগাযোগ—এই তো সেই দরজা। এর পাল্লা দুখানায় অগুনতি গজাল পোঁতা; অনেক বাড়তি কাঠের টুকরো গজাল দিয়ে জুড়ে বরফি ছাঁদের নক্সা কাটা মজবুত পাল্লা জোড়ায়। কত কাল ধরে ওই দরজা জোড়া চৌকাঠের সংগে এক হয়ে ঝুলে আছে এই খিড়কি বাগান আর বাড়ীর যাতায়াতের পথে; কিন্তু এতটুকু ভাঙা-চোরার ছোঁয়াচ লাগেনি ওই ভারী পাল্লা দুটোয়। অনেক সময় ও দুটোকে এ বাড়ীর প্রহরী বলেই ভুল হয়!

গানের অন্তরার সুর বেজে উঠল নবতে—এখনও কিন্তু গানের কলিগুলো ধরতে পারিনি! মায়ের কাছে জেনে নিতে হবে কোন গান ওরা নবতে বাজাচ্ছে এখন—আর সেই সংগে ক্ষীবিকাকীর কথাটাও জিজ্ঞেস করে নেব, জেনে নেব—কেন মংগলকাজে যেতে নেই তাঁকে।

তাই খিড়কি পুকুরের দরজা দিয়ে থামের সারিলাগান ওই বিশাল বাড়ীটার ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

নিরিমিষ হেঁসেল ঘর ছাড়িয়ে এসে ঠাকুর দালান। ঠাকুর দালান ছাড়িয়ে আরো পূবে দাদুর ঘর। নিরিমিষ হেঁসেল ঘরের দোরগোড়া থেকে সরাসরি দাদুর ঘরে চলে এসেছি। মনে মনে দাদুকে কত ডাকি, সাড়া পাইনে কিন্তু! এখনও দাদুকে ডাকলাম কত বার; কিন্তু কোনো সাড়া এলনা ঘর থেকে!

ওই তো দাদুর পায়ের খড়মজোড়া এখনও তাকের ওপরে রাখা

আছে! স্নান সেরে আমি প্রতিদিন ওই খড়মে ফুল দিই আর প্রণাম করি; মাও দাদুর খড়মে প্রণাম করে তাঁর দিনের কাজ আরম্ভ করেন।

কি জানতে এলাম আমি এই ঘরে? মংগল কাজে মাকে যেতে নেই কেন—শুধু এই কথাটুকুই কি! কিন্তু এ নির্জন ঘর কি উত্তর দেবে এই জিজ্ঞাসার? আমার নিজের গলার শব্দ ঘরের গাম্ভীর্য ভেঙে দিয়ে দেওয়ালের গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়াবে—কোনো উত্তরই পাব না জানি—তবু এই ঘরেই এসে দাঁড়ালাম।

নবতের সুর যেন আবো অনেক বেশী করুণ হয়ে উঠল! বুকের সবটুকুই বুঝি নিঙড়ে নিতে চায় ওই আধো-চেনা গানের সুর; চোখের কোণ বেয়ে তাই বুঝি জলের ধাবা উপচে উঠেছে; ঠিক আর একদিন যে এমনি ভাবেই মন মুচড়ে উঠেছিল আমার— চোখের কোণেও অবিবাম ধারা নেবে এসেছিল ঘরের ঠিক এই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে।

সে রাতে অন্ধকার, ভয়ংকর কালো মেঘেব মত চারিদিকে জমাট বেঁধে যেন সারা পৃথিবীকে বিষণ্ণতার ভারে বোবা করে দিয়েছিল; অলক্ষণ খাঁ খাঁ করছিল সারা বাড়ীময়! বাড়ীব দেওয়ালগুলো অসহ্য গাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে মূক জটলার ভংগীতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কিসের প্রতীক্ষা করছিল!

হীরু বৈরাগী সংগে করে আমাকে নিয়ে এল এই ঘরে। সে ছাড়া কেই বা ছিল সেদিন যে এখানে আনবে আমাকে?

ওই তো সেই পালঙ্ক; এখনও দাদুর বিছানা পাতা আছে ওই পালঙ্কে। সেদিন কিন্তু বিছানা নেমে এসেছিল পালঙ্কের সোজাসুজি মেঝের ওপরে—দাদু শুয়েছিলেন সেই বিছানায়। তাঁর শিয়রের ওপাশে পিলসুজের মাথায় প্রদীপ জ্বালান; অস্পষ্ট আলোয় যেন অন্ধকারই থমথম করছিল সারা ঘরে।

মামা আর শুভোকাকা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের সংগে কথা

কইছেন—তাঁদের মুখে আতংকের ছাপ। কোনো কথা শোনা যায় না—আতংকই যেন তাঁদের কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে।

হীরু বৈরাগী ছাড়া কেই বা ছিল যে আমাকে সংগে করে এখানে আনবে? মা সেই সন্ধ্যার আগে এসেছেন এ ঘরে। নিজের সেবা দিয়ে দাদুকে ফিরিয়ে নেবেন তিনি; তাঁর সেবা দাদুর চলে যাবার পথ রোধ করে দাঁড়াবে—নদীর জলের মত স্বচ্ছ আর তারই স্রোতের মত আপনভোলা সেবার ভাঁড়ার তাই উজাড় করে দিয়েছেন মা দাদুর দুই পায়ে।

দাদু ডাকলেন

—অমি কাছে আয় আমার।

তাঁর গলায় সেই ভরাট আওয়াজ নেই; শব্দের প্রাণে ভাঙন ধরেছে—এখুনি অবাঙময় হয়ে যাবে!

একেবারে তাঁর নাগালের ভেতরে এগিয়ে এলাম; তাঁর ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া পেলাম আমার আঙুলে। চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর দুই গালে—তবু হাত বুলিয়ে দিলেন আমার হাতে; ভাঙা ভাঙা গলায় কথা কইলেন

—কোনো কাজই শেষ হল না, তবু ছুটি নেবার সময় এগিয়ে এল দাদু!

ঠোঁট দুটো আমার কাঁপুনিতে দুলে দুলে উঠল; কান্নায় চোখ ঝাপসা হয়ে এল—আর কথা সরল না আমার বোজা গলায়।

ঝাপসা আলোয় মাকে দেখতে পেলাম—তিনি দাদুর পায়ের কাছে মুখ আড়াল করে বসে আছেন; তার পরে হঠাৎ কখন চোখের আড়ালে চলে গেলেন তিনি। কেবল দাদুর মাথার শিয়রের সেই পিটুলি ফলের নক্সা কোঁদানো পিলসুজের দাঁড়াটা ফুটে রইল আমার চোখের সামনে। প্রদীপের শিখা নেই। প্রদীপও নেই আর ওই পিলসুজের মাথায়। আলোর সব উৎস শেষ হয়ে গেল অকস্মাৎ!

কে যেন চাপা-গলায় কানের কাছে বলে দিলে—এ ঘরের আলো নিবে গেছে—চিরকালের জন্যে ও পিলসুজ নেড়া হয়ে গেল!

এইতো ঘরের দেওয়ালগুলো আজও এ ঘরের চারি ধারেই দাঁড়িয়ে আছে—ওদের স্থৈর্যের আড়ালে] আজও লুকিয়ে আছে সেই কাহিনী, সেই সব কথা, যা মায়ের মনকে নিঙড়ে দিয়ে অজস্র ধারা নামিয়ে ছিল তাঁর চোখে সেদিনের সেই রাতে।

দাত্বর পোঁতা চাঁপা গাছে আজও কত ফুলই ফোটে!

আজও দাত্বর বিছানা পেতে রাখা মায়ের নিত্য কাজ।

আজও দাত্বর ঘরের দেওয়ালগুলো ঘরের চারিধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়—দাত্বর কোনো কাজেই লাগেনা আর!

নবতে নতুন স্থর ধরেছে নবতওয়ালা। ঘরের খোলা জানালা দিয়ে সেই স্থরের ঝলক এসে ঢুকল। আগেকার সেই বুক-ভাঙা স্থর এখন শেষ করেছে; ভালই করেছে ওরা!

এ স্থরও যে আমাব চেনা স্থব! কতবাব শুনেছি হীরু বৈরাগীর মুখে; গানের কথাগুলোও পরিষ্কার মনে আছে—রাধার অভিমানের গান এযে!

কৃষ্ণ বাঁশিতে স্থরের জাল বুনেছেন! তাই বিনোদিনীর জল ভরতে যাওয়া হয় কি করে? চারিদিকে স্থরের জাল পাতা, পথে বেরোলেই যে জালে জড়িয়ে পড়বে তাঁর রাতুল চরণ দুটি! বিনোদিনীর তাই পা সরে না আর; কিন্তু অবুঝ সময় কারো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে কাল গোনে না—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে চারি ধারে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠে বুঝি?

হীরু বৈরাগীব গলার দরদ নবতের স্থরের সাথে এক হয়ে এই বিশাল বাড়ীর নির্জনতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেঁপে কেঁপে উঠল! কিন্তু হীরুর ঘরে যে তালা আঁটা? ওই বন্ধ দরজায় ঝুলে ঝুলে সে তালায় মরচে ধরে গেছে!

হীরু বৈরাগীও নেই আর; হঠাৎ এ বাড়ী থেকে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন। কিন্তু মনের তলায় তার সাথে যে মিতালির স্রোত বইছে, তাতে তো ভাঁটা পড়েনি এতটুকুও! নবতে এখন

তার গাওয়া গানই বেজে উঠেছে—সেই সুরের ফাঁকে ফাঁকে তাকে যেন দেখতে পাচ্ছি এতদিন পরে! তার নাকের ওপরে তিলক আঁকা; গলায় তার সরু সরু তুলসী-ডালের মালা পরা। হাতে একটা হলদে রঙের জপের ঝুলি—সেই ঝুলির মধ্যে থেকে একটা আঙুল উঁকি দিয়ে রয়েছে। তার নিজের ঘরের কোণটিতে বসে হীরু মালা জপছে।

বার বাড়ীতে যেন তারই খোঁজে ছুটে এসেছি।

চোখের ইশারায় বসতে বললে বৈরাগী; সে জপে ব্যস্ত আছে কি না! ঠাকুরদের নাম জপ করার সময় কথা কইতে নেই—হীরু বৈরাগীই তো একথা শিখিয়েছে আমাকে! তাই তার মালা জপের সময় আমি চুপ করে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি—সে বিড়বিড় করে নাম জপ করতে থাকে—আমি কিন্তু তার একটি শব্দও বুঝতে পারি না, শুনতেও পাই না!

মালার সব পুঁতিগুলো গোনা শেষ হলে সে থলি কপালে ঠেকিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে পেরেকে, ও পেরেক জপের ঝুঁলি রাখার জন্যেই দেওয়ালে পুঁতেছে হীরু বৈরাগী। আরো অনেক কাজ বাকী আছে তার; তুলসীগাছে জল দিয়ে প্রণাম করা, তার পরে গালে দুটো বাতাসা ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে তবে নিশ্চিন্ত হবে হীরু বৈরাগী।

কাজ শেষ করে সে জিজ্ঞেস করলে

—আজকের খবর কি দাদা?

আমি বললাম

—খুব ভাল হীরুদা!

—কোনটির?

—সেই গেরোবাজ পায়রার হীরুদা।

—কি করলে তোমার গেরোবাজ আজকে?

—উঃ, কত ওপরে উঠে গেল তা তুমি ভাবতেই পারবে না হীরুদা!

—তাই নাকি, তার পরে ?

—আকাশের সেই অনেক ওপর থেকে একটা একটা গেরো কেটে নামতে আরম্ভ করলে, নামছে তো নামছেই—শেষ নেই যেন !

হীরু বৈরাগী খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলে

—পায়রা কে ওড়ালে আজ, শশধর বুঝি ?

আমি বললাম

—হ্যাঁ, শশধরই উড়িয়েছিল পায়রা।

হীরু বৈরাগীর ভারি ভয়; ছাদে ওঠা, ছাদে গিয়ে পায়রা ওড়ান—এসব তার মোটেই পছন্দ নয় ! অত আলসে-উঁচু ছাদে ভয়ের কি আছে আবার ? তবু বৈরাগীর ভয়ের শেষ নেই !

অনেক সময় ছাদের ওই উঁচু আলসেগুলোর ওপরে আমার ভারি রাগ হয়; চোখের সামনেটা একেবারে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে—দুর্গের প্রাচীর যেন ! কিছু দেখবার উপায় নেই—বাইরের জগৎকে, দূরের জিনিষগুলোকে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখতে হয় তাই ; ও দেখায় কিন্তু কোনো সুখ নেই !

ভাগীরথীর বুকে চড়া পড়তে সুরু করে ফাগুন মাসের শেষ দিক থেকে ; তখন কত মহাজনী নৌকোর নোঙর পড়ে ওই চড়ার গায়ে। কত আসে, কত চলে যায় তার ঠিক নেই ! আমার দেখার পথ হল ওই আলসের ঘুলঘুলিগুলো, ওই সংকীর্ণতার মধ্যে দিয়ে এই যাওয়া-আসা আর অবস্থানের দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অবস্থানের পালা শেষ হয় একদিন—নৌকোর নোঙর উঠে পড়ে তখন ; মাঝি লগিতে ঠেলা দিয়ে স্রোতের মুখে এগিয়ে দেয় নৌকো। অবস্থানের চড়াকে পেছনে ফেলে নৌকো আবার অনেক দূরে চলে যায়।

হীরু বৈরাগীর নোঙরও একদিন এই থামের সারিলাগান বাড়ী থেকে উঠে পড়ল।

জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি এক সকালে তার দরজায় এসে

দাঁড়ালাম—তাকে যে খুব জরুরী খবর দিতে হবে; সদ্য-নামা-ঢলে ভাগীরথীর বুকের চড়াগুলো গেরুয়া জলের তলায় তলিয়ে একাকার হয়ে গেছে—কোথাও বালির চিহ্ন নেই আর!

কিন্তু বৈরাগী কোথায়? তার ঘরের দেওয়ালে ঝোলান জপের ঝুলি নেই; দড়ির আলনা থেকে চাদরই বা গেল কোথায়? তার ছোট একতারাটিও নেই তাকের ওপরে—কেবল তৈজসের ঝোলাখানি ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে; ওই আবর্জনার বোঝা পেছনে ফেলে হীরু বৈরাগী নিরুদ্দেশ হয়েছে কোথায়!

যে নোঙরে এই বৈরাগী-মন বাঁধা পড়েছিল, যে আকর্ষণ তাকে ঘরে টেনে এনেছিল, তার পুরোনো সঞ্চয়ের ঝোলা নামিয়ে দিয়েছিল এই ঘরে—সে নোঙর নেই আর, তাই হীরু বৈরাগী তার ভবঘুরের নৌকো স্রোতের মুখে ঠেলে দিয়েছে আবার!

মামা কাশীশ্বর দরওয়ানকে তলব করলেন। তাকে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন

—হীরু গেল কোথায় কাশীশ্বর?

কাশীশ্বর জড়সড় হয়ে বললে

—হুজুর আমি তো জানিনে কিছু!

মামা হুকুম দিলেন

—ওকে আর ঢুকতে দেবেনা এ বাড়ীতে। ব্যাটা ৰিটলে বোষ্টম—বছরের পর বছর কাটালে এ বাড়ীতে, দিনের পর দিন ভাত মারলে এ বাড়ীর; যাবার আগে একবার জানিয়েও গেল না? ব্যাটা জাত নেমোকহারাম!

দূরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনলাম। ভারি কড়া কথা বলেন মামা; দাদুর মত অমন প্রাণ-ছোঁয়া কথা কইতে শেখেননি!

মামার হুকুমে হীরু বৈরাগীর ঘরে কাশীশ্বর তালা এঁটে দিলে; দরজায় ঝুলে ঝুলে সে তালায় মরচে ধরেছে আজ।

বিনোদিনীর অভিমানের গান বাজল নবতে এতক্ষণ। হীরু

বৈরাগী একতারা বাজিয়ে এই গানই গাইত—তাই তো নবতের সুরের আলাপে নতুন করে আলাপ করে নিলাম তার সাথে।

নবতে সুর পালটে গেল আবার।

এ কি সুর ধরলে নবতওয়ালা? এই দুপুর বেলায় 'বাঁধো না তরীখানি'র সুর? এযে সন্ধ্যা বেলার গান!

না ঠিক তা তো মনে হয় না; ভারি মিষ্টি হাত নবতওয়ালার। নবতে-বাজা ওই সুবের তবংগ আজকেব এই অঘ্রাণের দুপুরকে যেন হঠাৎ ম্রিয়মান করে দিলে! আজকের এই উজ্জ্বল দিন হঠাৎ যেন এক পড়ন্ত বেলার কিনাবায় দাঁড়িয়ে ম্লান মুখে এই সুর শুনে নিচ্ছে। নবতওয়ালার আঙুলের জাদুতে গানের কলিগুলো পরিস্কার ফুটে উঠে আমার সেই চেনা গানকে বারবার মনে করিয়ে দিলে!

কি মিষ্টি গান!

কি মিষ্টি গানের কলিগুলো!

চোখের সামনে দিয়ে যেন গানের ভাগীরথী বয়ে চলেছে; সুরের নৌকোয় পাল তুলে দিয়েছে নবতওয়ালা! ও নৌকো যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তার কোনো ঠিকানা নেই।

কিন্তু এ গানও যে আমার চেনা গান! এর প্রতিটি কলির সংগে অভেদ্য মিতালি আমার। গানের সুর, কলি আর গতি যেন এক হয়ে আমার মনের তলায় বাসা বেঁধেছে।

হিমিদিরও এ গান খুব ভাল লাগে! তার কাছেই যে একদিন শিখেছিলাম এই গানখানি; বেশী দিনের কথাও নয়, তাই স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের ঘটনা।

অনেক মোটঘাট নিয়ে দুটো ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী সেদিন হিমিদিদের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। গাড়ী দুটোর মাথায় স্তূপাকার মাল পত্তর; রোগা রোগা ঘোড়াদুটো যেন বোঝার ভারে তখুনি দুমড়ে পড়বে।

ক্ষীরিকাকী কলকাতা থেকে ফিরলেন; আমার সারা মন খুশীতে ভরে উঠল! কতদিন সান্নুকে দেখিনি, হিমিদিকে দেখিনি,

তবু কদিনই বা ওরা ছিল কলকাতায় ? এই তো সেদিন গেল ; শুভোকাকা সংগে করে নিয়ে গেলেন ওদের মামার বিয়েতে।

যাবার আগে সান্নু ভারি খুশী ; কলকাতায় কত নতুন নতুন জিনিষ দেখবে সে। কলকাতায় যাহুঘর আছে, চিড়িয়াখানা আছে, আরো কত কি যে আছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই ; দেখার মত যা কিছু আছে কলকাতায়, সান্নু সব দেখে নেবে—একটিও বাদ দেবে না।

সান্নু বললে

—তুইও চল অমি ; দুজনে না গেলে কোনো মজা নেই !

আমার ইচ্ছেও যেমন অনেক, বাধাও তেমনি অগুনতি। আমি বললাম

—মামা কি রাজী হবেন ভাই ? তাছাড়া মা আছেন—

আমাব কথা শেষ না হতেই সান্নু হেসে উঠে বললে

—তুই এত বড় হলি, তবু মা ছেড়ে থাকতে পারিসনে ? কি লজ্জা রে ! আমি তো কারুর তোয়াক্কাই করি না।

এ কথার জবাব নেই আমার কাছে, তাই মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইলাম।

সান্নুরা সবাই একদিন কলকাতায় চলে গেল।

কদিন ধরে ওবাড়ী ফাঁকা পড়েছিল, আজ সে ফাঁক ভরে উঠল আবার। ইস্কুলের ছুটির পরে সেই বিকেল, তখন যেতে পাব ওবাড়ীতে, তার আগে নয় !

সান্নুই হাজির হল বিকেলে। কোনো কথাবার্তা নেই, আমার হাত ধরে বললে

—চল এখুনি আমাদের বাড়ী ; সারাদিন পাত্তা নেই তোর ! কি রকম বন্ধুরে তুই অমি ? রতু জ্যেঠিমাকে আমি আগেই বলে রেখেছি ; দেখবি চল—কত জিনিষ এনেছি কলকাতা থেকে।

সান্নুর তর সয় না আর ; আমিও যে মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছি ওবাড়ী যাবার জন্যে !

কলকাতা থেকে সান্নু অনেক সম্পত্তি জুটিয়ে এনেছে। লাইন পাতা রেলগাড়ী, দম দিয়ে ছেড়ে দিলেই লাইনের ওপরে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। এ ছাড়া দম দেওয়া মোটর গাড়ী, ব্যাডমিন্‌টন্ ব্যাট, পালকের বল আরো কত জিনিষের কাঁড়ি!

কথার ঝুলিতে অনেক গল্পও জমা হয়েছে তার—গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট, গোরা-পল্‌টনদের কুচ্‌কাওয়াজ, তাদের লালমুখ, দামী পোষাক আরো কত কি তার ইয়ত্তা নেই!

এ সব কিছুর ওপরে হল—চিড়িয়াখানার হাতি, জিরাফ, গণ্ডার, হরেক রকম পশু পাখি আর তাদেরই নানা খবরাখবর। সান্নু বললে

—বুঝেছিস অমি, জিরাফের মাথা ছোট হলে কি হয়? ভারি বুদ্ধি ওদের! লম্বা ঘাড়ের ওপরে মাথা ঘুরোচ্ছে চারিদিকে, চারিদিকে চোখ আছে! পারবে আর কোন জন্তু এমন করতে? কখনো না, ভালো করে দেখে নিয়েছি আমি।

সত্যিই অবাক হয়ে শুনতে হয় সান্নুর কথা! সে আবার বললে

—জানিস অমি, চিড়িয়াখানার হাতিটা কি পেল্লায় বড়? তোর মনে আছে—সেই সার্কাসের হাতিটা? সেই যে, সে বছর এসেছিলরে!

আমি বললাম

—মনে আছে বৈকি! অতবড় হাতি আর দেখেছি না কি?

সান্নু বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে

—চিড়িয়াখানার হাতিটার কাছে কিছু নয় ওটা! একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে যেন—যেমন লম্বা শুঁড়, তেমনি লম্বা লম্বা দাঁত; হ্যাঁ, দেখার মত জিনিষ বটে!

আমি বললাম

—আমারও খুব দেখতে ইচ্ছে করে ভাই!

সান্নু বললে

—করবে না! কত লোক রোজ এই সব জন্তু-জানোয়ারদের দেখতে আসে জানিস? ইচ্ছে করে বলেই তো আসে তারা!

—তা ঠিক।

সান্থু আবার বললে

—আর গণ্ডার? গণ্ডারের কথা বলিসনে ভাই! একেবারে লোহার মত চেহারা!···ওদের হাড় লোহার চেয়ে শক্ত কি না!

সান্থু ভারি ভাল করে বোঝাতে পারে! তার কথা শুনতে শুনতে মনে হয় যেন সব জন্তু জানোয়ারগুলো চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হিমিদি এতক্ষণে আমাদের ঘরে এল। খুব খুশী আমাকে দেখে, জিজ্ঞেস করলে

—কখন এলি রে অমি?

আমি বললাম

—এই তো!

—সান্থু বুঝি খুব বড়াই করছে তোর কাছে?

আমি আর কথা কইলাম না, বুঝে নিলাম হিমিদির সংগে আবার সান্থুর খিটিমিটি লেগেছে, অমন তো নিত্যিই লেগে আছে ওদের; সান্থুটা আবার ভারি বদরাগী!

সান্থু একেবারে জ্বলে উঠল হিমিদির কথায়; সে বললে

—তোমাকে সর্দারি করতে বলেনি কেউ তাই বলে!

সান্থুর দিকে কিন্তু ফিরেও তাকাল না হিমিদি; আমাকে বললে

—তুই চলে আয় অমি; ওর সংগে কথা বলিসনে। ভারি হিংসুটে সান্থুটা, মনও ওর এতটুকু। খালি নিজের জিনিষ দেখিয়ে বড়াই—দুচক্ষে দেখতে পারিনে আমি! আনতে পেরেছে তোর জন্যে কোনো জিনিষ? তার বেলায় তো ভোঁ ভাঁ! তুই উঠে আয় ওখান থেকে।

সান্থু গোঁজ হয়ে বসে রইল, আমার সংগেও কথা কইলে না আর।

হিমিদি হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে চলল; কানের কাছে মুখ এনে সে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে

—তোর জন্যে কি এনেছি বল দেখি অমি?

আমি অনেক ভেবে চিন্তে বললাম

—রেলগাড়ী, না হিমিদি ?

এক গাল হেসে হিমিদি আমায় আদর করে বললে

—তোর যেমন বুদ্ধি ! তুই কি বড় হয়ে রেলগাড়ী চালাবি যে তোর জন্যে রেলগাড়ী আনতে যাব ?

—তবে ?

—দেখলেই বুঝতে পারবি ; দেখি তোর পছন্দ হয় কি না ?

ক্ষীরিকাকীর ঘবে এলাম আমরা। তিনি মন্দিরে না কোথায় যেন পূজো দিতে গেছেন—ফিরতে রাত হবে তাঁর।

হিমিদি তোরঙ্গ খুলে লাল চামড়ায় বাঁধান একটা চৌকো খাতা বার কবলে—ভারি সুন্দব করে বাঁধান খাতাখানি, অমন লাল চামডাও দেখিনি এর আগে।

হিমিদি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে আমাকে

—এটা কি বল দেখি ?

আমি বললাম

—নিশ্চয়ই খাতা ওটা, না হিমিদি ?

—খাতা নয় তো কি হবে বে ; তোর যেমন বুদ্ধি ! কিসের খাতা তাই বল ?

অনেক ভেবে চিন্তে কিছুই মনে আসে না, আমি বললাম

—জানিনে, ঠিক ধরতে পারছিনে তো হিমিদি !

সে আমার থুতনিতে নাড়া দিয়ে বললে

—গানের খাতা রে, গানের খাতা অমি ! তোর জন্যে এনেছি ; আনতে পারবে সানু ? কক্ষুনো না, কক্ষুনো পারবে না তা তোকে বলে দিলাম—সানু যে ভারি স্বার্থপর !

আমার জন্যে আনা সেই সুন্দর খাতার দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে আছি, হিমিদি আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে

—তোর পছন্দ হয়েছে তো অমি ?

আমি বললাম

—খুব পছন্দ হয়েছে, খুব ভাল লেগেছে আমার—কি সুন্দর খাতা! ঠিক যেন দামী বইএর মত দেখতে, না হিমিদি?

আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হিমিদি বললে

—এ খাতায় গান ছাড়া আর কিছু লিখবিনে, যত গান জানিস বেশ সুন্দর করে একে একে টুকে নিবি, বুঝলি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম

—কোনটা আগে লিখব হিমিদি?

হিমিদি বললে

—প্রথমটা কিন্তু আমিই লিখে দিয়েছি। খুব ভাল গান, কলকাতার একেবারে নতুন গান—নতুন মামীমার কাছে শিখে নিলাম এবার।

আমার হাতে খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে হিমিদি জিজ্ঞেস করলে

—তুই খুব ভালবাসিস আমাকে, না অমি?

আমি বললাম

বাসি। খুব ভালবাসি তোমাকে।

হিমিদি খুশী হয়ে গুন্‌গুন্ করে গানের সুর আলাপ করতে আরম্ভ করলে আর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বললে

—যা মিষ্টি স্বভাব তোর, ভাল না বেসে থাকা যায় তোকে।

কথা শেষ করে আবার গুন্‌গুন্ করে সে গাইতে আরম্ভ করলে। কি মিষ্টি সুর, গানটাও নতুন মনে হল। আমি কিন্তু ঠিক ধরে নিয়েছি, হিমিদি ওই নতুন গানই গাইছে! বাঁধান খাতার প্রথম পাতা খুলে দেখি ঠিকই ধরেছি, ওই গানই তো লেখা রয়েছে খাতায়। "বাঁধনা তরীখানি আমার এই নদী কূলে"। কি মিষ্টি কথা দিয়ে বাঁধা গান!

হিমিদিও খুব সুন্দর গাইছে; কি সহজ গতি গানের! আমিও সংগে সংগে শিখে নিচ্ছি, কোনো অসুবিধে নেই, জটিলতাও নেই এতটুকু!

নবতে সেই গানেরই সুর বাজছে এখন। গানের প্রতিটি কলি

চিনে নিতে পারছি, কোথাও অস্পষ্ট নয়, বেধেও যাচ্ছেনা কোথাও !

হিমিদিরও নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগছে নবতের সুর; সে নিজেও যে খুব ভাল গাইতে পারে এই গানটি—আমি তো তার কাছেই শিখেছি এই গান !

আজ হিমিদির বিয়ে।

সকাল থেকে ও বাড়ীর সদরে নবত বসেছে। উঁচু নবতখানা থেকে ভেসে আসা সুর ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। হেমন্তের সোনালী রোদের তরংগে তরংগে সেই সুর কেঁপে উঠল ! নবত-খানার উঁচু চার-চালার ঘরে বসে নবতওয়ালা সুরের নৌকোয় পাল তুলে দিয়েছে, আমি যেন সেই অদৃশ্য নৌকোর দিকে তাকিয়ে আছি ! বুঝতে পারছি, সোনালী রোদের অনেক তরংগ ভেঙে ওই নৌকো কোনো এক সায়াহ্নের ঘাটে পৌছবে একদিন !

বিয়ের পরে হিমিদিকে চলে যেতে হবে। নতুন বাড়ীতে তার নতুন সংসার পাতার আয়োজন হয়েছে—সকাল থেকে নবতের সুর বারবার সেই কথাই মনে করিয়ে দিলে !

দাদু নেই !

হীরু বৈরাগী নেই !

হিমিদিও থাকবে না; বিয়ের পরে তাকে নতুন সংসারে নিয়ে যাবে। সকাল থেকে নতুন আয়োজনের গানে তাই মুখর হয়ে উঠেছে বাঁশি।

॥ পাঁচ ॥

দিন যামিনী সায়ং আর প্রভাত।

এই তো নিয়ম ! কিছু হের ফের হয়েছে, মূল ধারা কিন্তু ঠিকই আছে; সকাল, তার পরে দিনমান, তারও পরে সন্ধ্যা, আর সব শেষে রাত্রি।

সকালের আগেই তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, আলোর সম্ভাবনা, আশার সম্ভাবনা। তার পরে এল সকাল, সমস্ত সম্ভাবনার রঙীন আর বাস্তবের আকৃতি নিয়ে। আশা রূপ নিতে আরম্ভ করেছে; চারিদিকে যে স্বচ্ছতার ফাঁক—তার ভেতরেও রঙ পালটে চলেছে প্রতি মুহূর্তে।

ওই থামের সারি লাগান বাড়ীর কথাই বলছি।

ও বাড়ীর জীবনেও একদিন এমনি সকাল দেখা দিয়েছিল!

তখন পত্তনের সময়।

সব কিছুকেই তখন পত্তন করে নেওয়া হচ্ছে, তাই ও বাড়ীব আবহাওয়ায় সম্ভাবনাব রঙ ধরেছে। অনেক যুগ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে একে—তাই মজবুত করে তৈরী কর; মাল-মশলা, তৈজস-পত্রের টানাটানি করো না! বনেদ শক্ত করে পেতে দাও, ফাঁক থাকতে দিও না—ঠাস্ গাঁথুনিতে নিবেট কব, পাকাপোক্ত কবে দাও!

অখণ্ড করে দাও এর আয়ু!

যত খণ্ড আয়ুর মানুষ এব আবর্তে এসে পৌছবে, সেই সব খণ্ড আয়ুর জোড় লাগিয়ে চলতে হবে একে।

এর দৃষ্টি দূর প্রসারী কবে দাও! সেই দূর প্রসারী দৃষ্টি দিয়ে অনেক কাল ধরে একে সঞ্চয়ের ভঁাড়ার ভরে নিতে হবে; বহুকাল ধরে পাঁজরার হাড়ের আড়ালে এক এক করে বহু বহু কথা জমা করে নিতে হবে একে।

ইতিহাস তৈরী করার কাজ নয় এর, কতকগুলো ভাঙাচোরা কাহিনীর, ভাঙাচোরা দৈনন্দিন চলা-ফেরা, বলা-কওয়া, যাতায়াতের সুতোয় গ্রন্থি বেঁধে দেওয়ার কাজ!

সেই কাজই তো করে এসেছে এ বাড়ী আর আজও তাই করে চলেছে।

সম্ভাবনার রঙ মুছে গেল একদিন—সে কথা ভাববার সময় নেই তখন, মধ্যাহ্নের দাপট উথলে উঠেছে; সকালের রঙীন সম্ভাবনা

মধ্যাহ্নের তেজে জ্বল জ্বল করছে তখন। চারিদিকে চোখ ঝল্‌সান দীপ্তি!

তার পরে আবার নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। এ সম্ভাবনা আরম্ভের রঙে রঙীন নয়, পরিণতির ক্লান্তিতে মলিন—ম্লান-হয়ে-আসা প্রদীপের শিখা নিজের অনুজ্জ্বল ছায়ার দিকে চেয়ে নির্বাণের প্রতীক্ষা করে আছে!

শূন্যের স্বচ্ছতার ভেতরেও মালিন্যের ছাপ ধরেছে, তাই বুঝি বাড়ীটাকে মলিন মনে হয়? যে চমক একদিন ফুটে উঠেছিল একে অবলম্বন করে তার জলুসে ঘাটতি পড়ে এই মালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে। সে সব কথা কিছু কিছু শুনেছি, আর যোগাড়ও করে নিয়েছি এই প্রকাণ্ড বাড়ীর কাছেই। সে সব অনেক কালের পুরোনো কথা, আবর্জনার আড়ালে দীর্ঘকাল ধরে সময়ের আঘাতে সংঘাতে আজ অস্বচ্ছ হয়ে গেছে।

সূর্যবেদি উঠোনের সে শ্রী নেই আর; বৈঠকখানা ঘরেও উজ্জ্বলতা নেই। বার বাড়ীব দালান, অন্দরের শূন্য মহল, খিড়কি পুকুরের ধাপ খসে পড়া সিঁড়ি বর্তমানের দীন আচ্ছাদনের আড়ালে অতীতের অনেক ঐশ্বর্য গোপন করে রাখে। ওই আবরণটুকু সরিয়ে দিলেই এই বিশাল বাড়ী অন্য ভাষায় কথা বলে ওঠে; সে ভাষারও কিছু পরিচয় জানি!

রামশংকর মুখুয্যেমশাই জায়গা কিনেছিলেন। বায়নার জন্যে পাঁচ আর খরিদের সময় পঁচিশ, সর্বসাকুল্যে তিরিশ টাকায় এই জায়গা কেনা হল একদিন।

ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেবের সরকার রামশংকর, হাঁক-ডাক সোজা নয়; কুঠিয়াল সাহেবের পেয়ারের লোকের হাঁক-ডাক থাকাই স্বাভাবিক!

ভাগীরথীর দক্ষিণ পাড় ধরে যে রেক্তার গাঁথা, ভাঙাচোরা দেওয়াল আর বনেদের নিশানাগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, তারা আজও কুঠি বাড়ীর কথাই বলে—সাক্ষী দেয় অতীতের।

কুঠি চালাতে হলে সরকার লাগে। আর সরকার হলেই লাগে তার জন্য বাসস্থান। তাই রামশংকরকে সাহেব দেউড়ি বানিয়ে নেবার হুকুম দিলেন।

শামলা মাথায় দেওয়া তেল-রঙের ছবি তাঁর বার বাড়ীর বৈঠক-খানা ঘরে ঝোলান থাকতো, সেই ছবিই যেন বলে দিত, সাহেব-সুবো দেখলে নুইয়ে পড়ার মতই মানুষ ছিলেন রামশংকর।

তাঁর নিজের শক্তিও ছিল বৈকি!

আজও এ বাড়ী তাঁর শক্তিব কথাই মনে করিয়ে দেয়। বার বাড়ীর সিং-দরজা থেকে আরম্ভ কবে নানা এলোমেলো আবর্তের ভেতর দিয়ে খিড়কি পুকুবের ভারি দরজা দুখানা পর্যন্ত—পুরু দেওয়ালে দেওয়ালে, ইটে-কাঠে, থামেব সারি আর খিলেনের ভাঁজে, দেওয়াল গাঁথার ইমারতি মাল মশলায়, ঘুলঘুলি কাটা উঁচু আল্‌সের বেষ্টনী দেওয়া ছাদের মাথায় সেই কথাই লেখা আছে—বলা আছে!

সাহেব হুকুম করলেন—কুঠি বাড়ী বাড়ান হবে, ইট চাই সরকার!

তারই ব্যবস্থায় মন ঢেলে দিলেন রামশংকর।

তখন খিড়কি পুকুরের অস্তিত্ব কোথায়? কুঠি বাড়ীর জন্যে ইট চাই, ইট পোড়াতে মাটি লাগে—মাটি কাটতে গিয়ে গজিয়ে উঠল এই খিড়কি পুকুর। তাব পরে, একদিন দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমান মাপ টেনে এই সমচতুর্ভুজ জলাশয়ের সৌষ্ঠব এঁকে দিলেন রামশংকর।

সেকালে সাহেবদের দরাজ নজর ঝড়তি পড়তি জিনিষে আটকা পড়ত না। তাছাড়া বাড়তি জিনিষের হিসেব দেওয়া-নেওয়ার চলও হয়নি সেকালে; বাড়তি আর বেহিসেবী ইট দিয়ে বনেদ পেতে দেওয়া হল এই প্রকাণ্ড বাড়ীখানার। আর সেই বনেদের ওপরেই রামশংকরের পত্তন করা বনেদি বংশের আরম্ভ হল।

জন্মের সময় রামশংকর মুখুয্যে মশায়ের তুংগ বৃহস্পতি একাদশে ঘর নিয়েছিলেন।

তখন আবার দশাও চলেছে গুরুর। কুঠিয়াল সাহেবের তা জানার কথা নয় অবশ্যই, তাছাড়া গ্রহ নক্ষত্রেরা তো জানিয়ে কিছু করেন না, নীরবেই নিজেদের কাজটুকু করে চলেন! রামশংকরের নির্বাক বৃহস্পতি তখন কর্মযোগের গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত—সেই যোগাযোগেই বোধ হয় কুঠির ব্যবসাও ফেঁপে উঠেছে! ভাগীরথীর পাড়ে, শক্ত কাঁকরে-জমির ওপরে কুঠিবাড়ীর মহালগুলো এগিয়ে চলেছে—একের পর এক; তারই ফাঁকে রামশংকরের ফাঁদালো দেউড়ি শশিকলার মত বেড়ে উঠছে।

গ্রহেরা হঠাৎ মুখ ফেরালেন, রামশংকরের দিক থেকে নয়, কুঠিয়াল সাহেবের দিক থেকে।

তিন তিনটি ক্রূর গ্রহ এক সংগে বৈরী হয়ে দাঁড়াল। নীলকর নিয়ে গণ্ডগোল বেধে গেছে চারিদিকে। ফাঁপানো ব্যবসা রাতারাতি গুটিয়ে দিয়ে কুঠিয়াল সাহেব সরাসরি দেশে পাড়ি দিলেন।

কুঠির হেফাজতে তখন চল্লিশখানা নৌকো; লোক-লস্কর, মাঝি-মাল্লার তো কথাই নেই! দেশজোড়া জায়গা দিয়ে এই কুঠিবাড়ী।

রাতারাতি এই সম্পত্তির মালিক হলেন রামশংকর।

গোলাদারি কারবারের সব সরঞ্জামই মজুত রয়েছে হাতের গোড়ায়; এদিকে নৌকো. ওদিকে গুদাম—মাঝিমাল্লা, লোকলস্করের অভাব নেই—গোলাদারির কারবার আরম্ভ করলেন রামশংকর।

বাড়ীর জলুসে প্রথম চেকনাই ধরল সেদিন।

রামশংকরের পত্তন করা আড়তদারির পথ ধরে দুপুরুষ নির্বিঘ্নে এগিয়ে গেল। তিন পুরুষের মাথায় এসে বাধল গণ্ডগোল!

দুর্গাশংকরের মালিকানা তখন।

দুর্গাশংকর বললেন—গোলাদারির কাজে ইজ্জৎ নেই। সমাজে বাস করতে হলে লৌকিক পরিচয় লাগে; আড়তদারির পরিচয়ে সমাজে বাস করা চলে না, এতে আভিজাত্য নেই। গোলাদারির কাজ গুটিয়ে ফেলো।

সমাজে দাপট নিয়ে বাস করতে চান দুর্গাশংকর।

জমিদারি না হলে দাপট আসে না।

আভিজাত্য টেনে আনতে হবে মুখুয্যে পরিবারে, তাই জমিদারি চাই দুর্গাশংকরের। পড়তি জমিদার ঘরে দুর্গাশংকরের চাঁদির জাল ঢুকে পড়ল। গোলাদারির টাকায় জমিদারি আব সামাজিক পরিচয় কিনে নিলেন দুর্গাশংকর।

রাতারাতি কপাল ফিরে ছিল রামশংকরের; আভিজাত্য কিনে আনতে সময় লাগল, তবে এক পুরুষেই দুর্গাশংকর সারা বাড়ীর চারিদিকে আভিজাত্যের ঘেরাটোপ কায়েম করে দিলেন।

বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হল বাড়ীতে।

বনেদি জমিদার বাড়ীর বিগ্রহ হলেন লক্ষ্মীনারায়ণজীউ। বাছাই করা শিলা খরিদ করলেন দুর্গাশংকর, চিহ্ন আর শুভ লক্ষণের ছাপ শিলায় জ্বলজ্বল করছে!

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বললেন—এমন শিলা সচরাচর মেলে না; এই বিগ্রহ থেকে মংগল স্ফূর্ত হবে, এঁর প্রতিষ্ঠাই শুভসূচক—এ বিগ্রহেরই প্রতিষ্ঠা হোক!

দুর্গাশংকর বললেন—তথাস্তু!

মুখুয্যে পরিবারে শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণজীউ প্রতিষ্ঠিত হলেন।

তার পরে কুলপুরোহিত, দশ সের চালের অন্নভোগ, বৈকালিক ভোগ, সব কিছুরই পাকাপাকি বিধিব্যবস্থা হয়ে গেল।

সংসারের হালহীন নৌকোয় হাল সংযোগ করলেন দুর্গাশংকর। সমস্ত বিঘ্ন অমংগল অশুভকে তিনি মুখুয্যে পরিবারের চৌহদ্দির বাইরে রাখার, অপসারণ করার কায়েমি বন্দোবস্ত করে দিলেন।

তার পরে, পালা এল, পার্বন এল, হাতি জুড়ি পালকি কোচ-ম্যান সহিস মাহুত পালকি-বাহক পাইক-বরকন্দাজের ছড়াছড়ি লেগে গেল।

চারিদিকে জম্‌জমাট ! মদগর্বে এই বাড়ীই যেন বললে

—আমার বাহার দেখে যাও ! এ বাড়ীতে এমন সৌষ্ঠব আর দেখতে পাবে না তোমরা।

শান্তি কিন্তু চিরকালই স্বল্পায়ু ; মুখুয্যে বাড়ীর পুরোনো কাহিনীতে সে কথা নতুন করে লিখে ফেলার সময় এসে গেছে, তা লেখাও হয়ে গেল একদিন !

দুর্গাশংকর লোকান্তরিত হলেন।

যে বিঘ্ন অমংগল আর অশুভ দুর্গাশংকরের দাপটে বাড়ীর চৌহদ্দির বাইরে অপসৃত হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে জানা গেল এই অপদেবতাগুলি ওত পেতে বসেছিল এতদিন। এবার ঝাঁক বেঁধে হানা দিল তারা। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সুযোগ এসে গেছে—অবহেলা করার সময় নেই তাদের, রামশংকরের পত্তন করা বনেদের ভেতর তারা ঢুকে পড়ল। বুভুক্ষু অমংগল অশুভ আর বিঘ্ন দুর্গাশংকরের হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পেয়ে গেছে এত দিনে !

দুর্গাশংকরের তিন স্ত্রী বর্তমান।

তাঁর অবর্তমানে তিন জনেরই এক সংগে কপাল পুড়ল !

তিন ঘরে পাঁচ ছেলে দুর্গাশংকরের, সকলেই সাবালক ; তিন সরিকের মাঝে এই জাঁকালো সম্পত্তি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল ; ভাবখানা যেন, রাখতে হয় রাখো আমাকে, ভাঙতে হয় ভাঙো ! মূক আমি, তোমাদের বোঝা হয়ে চলেছি এতকাল ; যেমন হুকুম করবে তামিলও করে দেব তেমনই। তোমাদের হুকুমের অপেক্ষা করেই আছি !

দুর্গাশংকরের পাঁচ ছেলে কথা কইলে না—তাদের হুকুমও জানালে না ; কথা কইলেন ছোট আর মেজ তরফের-দুই মাতুল।

ছোটজন এসেছেন প্রয়াগ থেকে ; তিনি জানালেন যে তাঁর

সাবালক ভাগ্নে দুজন তাদের অংশের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি বিক্রি করে প্রয়াগে থাকাই স্থির করেছে।

আসামের গৌহাটী অঞ্চল থেকে আগত মেজ তরফ সায় দিলেন তাঁর কথায়, তিনি বললেন

—সরিকানা ব্যাপারে তাঁর দুই ভাগ্নে আর বিধবা ভগ্নিকে তিনি এ বাড়ীতে ফেলে যেতে রাজী নন।

তিনি আরো বললেন

—তাঁরা পরামর্শ করে স্থির করেছেন, সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ এ অবস্থায় ভগ্নির পিত্রালয়ে থাকাই বিধেয়।

বাকী রইলেন কেবল বড় তরফের অগ্রজ দীনতারণ চাটুয্যে মশাই। তিনি বললেন

—তাঁর ভগ্নি এবং ভাগিনেয় নিজেদের অংশের সম্পত্তি কায়েম রাখবেন। পিতৃপুরুষের ভিটে আর সংসার ত্যাগ করা সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে।

রামশংকরের পত্তন করা সম্পত্তি তিন পুরুষ না পেরোতেই তিনটি ভিন্ন পথ বেছে নিলে।

দুর্গাশংকরের লোকান্তরিত আত্মা শান্তি পেল কি না তা জানা নেই, তবে তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনায় কোনো ত্রুটি হয়নি। মুখুয্যে বংশের বনেদিয়ানা তখন তুংগ শিখরে গিয়ে ঠেকেছে, সেই শিখর থেকে তাকে নীচে টেনে নামিয়ে আনার উপযুক্ত আয়োজনই করলেন মেজ আর ছোট তরফের দুই মাতুল।

তাঁদের পাকা ব্যবস্থার কল্যাণে তেভাগা সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশের কিছু বেশীই টেনে একজন পূবে আর অপরজন পশ্চিমে রওনা হলেন।

ভবানীশংকরের মাতুল দীনতারণ চাটুয্যে মশাই বাকী ঝড়তি-

পড়তি সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, কুলবিগ্রহ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউব হেফাজতে দিয়ে ভবানীশংকরকে তাঁরই সেবায়েৎ নিযুক্ত করে দেশে ফিরলেন।

যাবার আগে দীনতারণ চাটুয্যে মশাই মুখুয্যে বাড়ীর কুল-পুরোহিতকে ডেকে বললেন

—দেবতারা যেমন অনুগ্রহ করেন অনুরূপ উপচারেই পূজো হয় তাঁদের। ঠাকুব বিরূপ হয়েছেন এখন, তাঁরই আদেশে সম্পত্তি তিন টুকবো হয়ে গেল। জাঁক জমকেব দরকার নেই আর, শিষ্টা-চারে পূজো হোক এই বাসনাই তাঁব।

তিনি আরো নির্দেশ দিলেন

—পাকা দশ সেব চালের অন্নভোগ কমিয়ে কাঁচা দশ সের করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত, সেই সংগে বৈকালিকও সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই!

বিগ্রহ নবোত্তমদেবেব অগ্নিমান্দ্য ঘটল।

জমিদাবিব বাঁধা ধবা আয়, গোলাদাবিব আয় নয় যে চেষ্টা চবিত্র করে বাড়িয়ে নেওয়া চলে—আবাব সেই আয়ের কলেবব থেকে দুই তৃতীয়াংশ ঝরে গেছে। বনেদিয়ানার চাল কমেনি কিন্তু! চাল চলন মনে করলেই কমিয়ে ফেলা চলে না, বিশেষ করে সেই চাল যখন দীর্ঘ কালের পালনে পুষ্ট!

সম্পত্তির আয় ঝবে গেলেও বনেদিয়ানার চাল খাটো করা সম্ভব হল না ভবানীশংকরের পক্ষে; কারণ দুর্গাশংকবেব ফেলাও ব্যবস্থা মনে করলেই গুটিয়ে নেওয়া যাবে এমন কাঁচা কাজ করার মানুষ ছিলেন না তিনি। সমস্যার টাল বেটালেই জীবন কাটল ভবানী-শংকরের। পরিবারেব কাঁধে ঋণেব বোঝা আস্তে আস্তে চাপতে আবম্ভ করল।

বিষ্ণুশংকরের মালিকানায় বিগ্রহের আরো দুবার মন্দাগ্নি দেখা দিল; প্রথম ধাপে কাঁচা দশ সের দশ পোয়ায়, আর পরের ধাপে তা পাকাপোক্ত ভাবে দশ ছটাকে কায়েম হয়ে গেল।

শিষ্টাচার এতকাল পরে নিজের মাত্রা খুঁজে পেল!

ভোগরাঁধায় বাধা পড়ল সেদিন সকালে।

তারিণী পণ্ডিত মশাই তখন কুলপুরোহিত বংশের শেষ সলতে, তিনি ডাক দিলেন মাকে, বললেন

—রতু, একবার এদিকে এস তো মা!

তাঁর গলায় জোর নেই, ভয়ে স্বর স্তিমিত হয়েছে।

মা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ঠাকুর দালানে। মণ্ডপঘরের দরজায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তারিণী পণ্ডিত মশাই।

মা শংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন

—হঠাৎ কি শরীর খারাপ হল পণ্ডিত মশাই! মুখ যে আপনার শুকিয়ে গেছে?

পণ্ডিত মশায়ের শীর্ণ পা দুটো তখনও কাঁপছে। তিনি সাথে করে মাকে ডেকে নিয়ে গেলেন মণ্ডপ ঘরে। মা দেখলেন বিগ্রহের সোনার সিংহাসন মাটিতে নামানো; চন্দ্রকান্ত মণির মত উজ্জ্বল পাথরের বাণলিংগদেব অষ্ট ধাতুর তৈরী গৌরীপট্টে একাই সিংহাসনে আসীন। মায়ের মুখ থেকে অস্ফুট আওয়াজ শোনা গেল, তিনি বললেন

—ঠাকুর···? কোথায় গেলেন আমাদের বিগ্রহ নরোত্তমদেব?

তারিণী পণ্ডিত মশাই তাম্রকুণ্ডের দিকে দেখালেন, বিগ্রহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছেন সেই পাত্রে। তাঁর চুনী বসান সোনার যজ্ঞোপবীতটি খণ্ডিত বিগ্রহের পাশেই রাখা আছে।

মায়ের গলা দিয়ে কথা সরল না আর; তাঁর দৃষ্টি ফাঁকা হয়ে গেল—মণ্ডপ ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

বার বাড়ীতে খবর গেল।

মামা ছুটে এলেন বার বাড়ী থেকে।

মামীমা আগেই এসেছেন মণ্ডপঘরে।

এক নিমেষেই সকলে বুঝে নিলেন অমংগলের কোপদৃষ্টি কতখানি ধারালো হয়ে এ বাড়ীর ওপরে এসে পড়েছে। কারো নিস্তার নেই

আর, উন্মত্ত ভৈরবের ত্রিনয়ন থেকে অনল ঠিকরে পড়বে, তাঁর ললাটপট্টপাবকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই বাড়ী।

তারিণী পণ্ডিত মশায়ের শক্তি নেই, ফুলে চন্দন মাখিয়ে ঠাকুরের অংগ সেবা করেন সে ক্ষমতাটুকুও নেই, তাঁর চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। মণ্ডপ ঘরে ম্লান মুখে বসে আছেন তিনি।

মামা পাথরের মত শক্ত মানুষ। ভেতর ফোঁপরা হয়ে গেলেও বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। স্নান সকালেই সারা হয়ে গেছে তাঁর, নিজেকে বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করে দিতে কোনো বাধা নেই। তিনি মামীমাকে বললেন

—মৃন্ময়ী, আমার গরদের জোড় এনে দাও। বিগ্রহ আমার হাতেই তাঁর শেষ পূজো চেয়েছেন, তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ করতে হবে; তুমি ভোগের ঘরে যাও, অন্নভোগ তোমাকেই রাঁধতে হবে আজ।

তারিণী পণ্ডিত মশায়ের শক্তি নেই, মণ্ডপ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবারও শক্তি নেই তাঁর; পূজকের আসনের পাশে মা আলাদা আসন পেতে দিয়েছেন তাঁকে। সেই আসনে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে বসে আছেন তিনি। মামার গলা থেকে স্ফূর্ত হচ্ছে তখন

ওঁ শংখচক্রধরং বিষ্ণুং
দ্বিভুজং পীতবাসসং······

দেওয়ালের চারিদিকে উচ্চারিত মন্ত্র রেশ তুলে দিয়েছে, সারা বাড়ী স্তম্ভিত হয়ে শুনে নিচ্ছে সেই মন্ত্র। বনেদের নিম্নতম অংশেও সেই শব্দ ঢুকে পড়ে গুমরে উঠল।

কার চাপা কান্নার আওয়াজ শোনা যায় কানে? বহুকালের পুরোনো বাড়ী বুঝি বা চাপা কান্নায় ভেঙে পড়তে চায় আজ!

মা ঠাকুর দালানের থামে কপাল চেপে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই গুমরে গুমরে কাঁদছেন বুঝি? অব্যক্ত ব্যথায় বুঝি তাঁর সারা দেহ কেঁপে উঠছে! কিন্তু তাঁর বুকে এত কান্না জমে উঠল কবে?

আমারই মত এই বিশাল বাড়ীও যেন কান পেতে রয়েছে, আমারই মত তার উদ্‌গত কান্না চেপে রয়েছে তার ইমারতি মাল-মশলার পাঁজরার আড়ালে। দীর্ঘকাল ধরে সকলের অগোচরে যে যন্ত্রণা জমা হয়ে উঠেছে এই অবাঙময় বাড়ীর বুকে—মূক আর্তনাদের কান্নায় এখন বুঝি তা উদ্‌গার করে দিতে চায়?

এর উৎস কোথায়?

এর প্রতিকারই বা কি?

সেই কথাই তো বললেন শুভোকাকা

—শরীরে ব্যাধি হলে ডাক্তার বদ্যি ডেকে তার চিকিৎসা হয়; কিন্তু এযে দৈবের ব্যাপার, তুমি আমি এর কি করতে পারি ভবশংকর? জানকী ঠাকুর মশাইকে আনার ব্যবস্থা কর, না হয় আমিই চলে যাই তাঁকে আনতে। এত বড় অমংগল পুষে রেখ না ভবশংকর! আজ পূজো করেছ—তাতে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু ভাঙা বিগ্রহের নিত্য পূজো যে হয় না! কি বিধান দেবে এর তারিণী পণ্ডিত?

মামা এক মনে শুভোকাকার কথা শুনলেন; নিজে কি যেন ভাবলেন, তার পরে বললেন

—যা ভাল বোঝ তোমরাই কর শুভো, নিজের মতে কিছু করতে চাইনে আমি; দিদি আছেন, অমি এবাড়ীর শেষ সম্পদ.... ওর কোনো অমংগল না হয়—এ ছাড়া আর কি বক্তব্য থাকতে পারে আমার?

সব কাজেই মামা ঠিক এই ভাবে মত দেন। এ প্রসংগও তাই শেষ হল এখানে। শুভোকাকা উঠে পড়লেন।

কদিন পরে বাড়ীর কুলগুরু জানকী ঠাকুর মশাইকে সংগে করে ফিরলেন শুভোকাকা। এর আগে আর দেখিনি তাঁকে।

সত্যি অবাক হয়ে দেখার মতই চেহারা ঠাকুর মশায়ের। সাদা

ধবধবে গায়ের রঙ। সারা দেহ যেন পালিশ করা হাতির দাঁতে তৈরী। সাজ পোষাকের কোনো বালাই নেই; পরনে সাদা থান ধুতি, কাঁধের ওপরে একটি উড়ুনি চাদর—জামা জোড়া গায়ে নেই। মাথার চুলগুলি পরিপাটি করে সমান ভাবে ছোট করে ছাঁটা। পায়ে এক জোড়া নীল মখমলের চটি।

মামা বার বাড়ীর সূর্যবেদি উঠোন পেরিয়ে সদর দরজায় ঠাকুর মশাইকে আনতে গেলেন, তাঁকে এর আগে এত খাতির করে কাউকে এগিয়ে আনতে দেখিনি।

শুভোকাকা আর মামা সোজাসুজি তাঁকে ভেতর বাড়ীর ঠাকুর দালানে নিয়ে এলেন। দালানের পশ্চিমে লোহা কাঠের জল-চৌকি পাতা হয়েছে, পাশেই সর্বসুন্দরী নক্‌সা কোঁদান পেতলের কলসীতে জল আছে। মা মামীমা আর ক্ষীরিকাকী দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে।

ঠাকুর মশাই এসে বসলেন জলচৌকিতে। তাঁর পা ধোয়াবার জন্যে রূপোর ঘটি বেরিয়েছে সেদিন।

মা আগে এগিয়ে গেলেন। তিনি ঠাকুর মশাইকে প্রণাম করে তাঁর পা ধুয়ে আঁচলের নীচ থেকে চুলের গোছা বার করে পা মুছিয়ে দিলেন। মায়ের পরে মামীমার পালা আর শেষে এলেন ক্ষীরিকাকী; অনুষ্ঠানের শেষে তিনি শাড়ীর আঁচল দিয়ে সবটুকু জল মুছে নিলেন ঠাকুর মশায়ের পা থেকে।

এমন আয়োজন, এমন ঘটা সচরাচর ঘটে না। এর আগে দেখিনি কখনো—তাই অবাক হয়ে দেখলাম, মনে হল কত জিনিষই তো অদেখা আছে—এ বুঝি সেই অদেখা জিনিষেরই একটি!

তারিণী পণ্ডিত মশাই এলেন এতক্ষণে। তিনি কিন্তু নিজের পা নিজেই ধুয়ে নিলেন। কেউ এগিয়ে গেল না তাঁর কাছে, বললেও না একবার, আপনার পা ধুইয়ে দিই পণ্ডিত মশাই?

উনি রোজ আসেন তাই এত ঘটার দরকার করে না ওঁর জন্যে।

ঠাকুর মশাই কথা বলেন কম। কটি কথাই বা বলেছেন এতক্ষণে ?

মা বলেন—উনি খুব জ্ঞানী মানুষ, ওঁর সব কথা ভাল করে বোঝাই শক্ত। ওঁর সব কথা ঠিক মত ধরতেই পারে না সকলে !

মণ্ডপ ঘরে এসে উনি তারিণী পণ্ডিত মশাইকে বিগ্রহ নামিয়ে আনতে বললেন।

মামা আর শুভোকাকা ঠাকুর মশায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে। ওঁরা দুজনেই নিশ্চয় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন ওঁর মতামত শুনতে ; আমিও যে অধীর হয়ে উঠেছি ! কিন্তু মনে মনে জানি মামা, শুভোকাকা, তারিণী পণ্ডিত মশাই এঁরা সকলেই মিছিমিছি ভয় পেয়েছেন ; ঠাকুরেব তো কিছু হয় না, ঠাকুর তো আর মানুষ নন ! সোনার পৈতে পরিয়ে জোড় মিলিয়ে দিলেই হল, বাইরে থেকে ভাঙা বলে বোঝার কোনো উপায়ই থাকে না আর।

তারিণী পণ্ডিত মশাই বিগ্রহ নামিয়ে জানকী ঠাকুরকে দেখালেন। ওঁরা দুজনেই চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ, তার পরে তারিণী পণ্ডিত মশাই বললেন

—সিংহাসনে তুলে রাখি নরোত্তমদেবকে ?

জানকী ঠাকুর মশাই নিজের চিন্তায় যেন ডুবে ছিলেন এতক্ষণ, তারিণী পণ্ডিত মশায়ের কথায় তাঁর চমক ভাঙল ; তিনি বললেন

—লক্ষ্মীনারায়ণদেবের শিলা তাম্রকুণ্ডে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করুন। বাণলিংগদেব সিংহাসনেই থাকবেন।

মামা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শুভোকাকা এতবার তাঁর দিকে তাকালেন, তিনি বুঝতেই পারলেন না কিছু।

তারিণী পণ্ডিত মশাই বিগ্রহ পৃথক করে রেখেছেন। ঠাকুর মশাই তাঁকে বললেন

—পৃথক জায়গায় তুলে রাখুন ওঁদের। নরোত্তমদেব দেহত্যাগ করেছেন তাই পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন।

মামা এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। শুভোকাকা কিন্তু আর ফিরে তাকাচ্ছেন না মামার দিকে। কেবল তারিণী পণ্ডিত মশাই মুখ বুজে নিজের কাজ করে চলেছেন অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি নেই তাঁর।

বাণলিংগ মহাদেবকে সিংহাসন সমেত পালংকে রেখে তিনি উত্তর দেওয়ালের উঁচু কুলুংগিতে তাম্রকুণ্ড সরিয়ে রাখলেন।

মা মামীমা আর ক্ষীরিকাকী তিনজনেই ঠাকুর দালান থেকে চলে গেলেন এবার, ওঁদের কারো মুখেই কথা নেই।

দালানে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি।

এই পার্থক্যের ভেতর দিয়ে কি ঘটে গেল বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে নেই ; আজকের মংগল আরতির পঞ্চ প্রদীপের শিখার ঝলক ওই কুলুংগি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে না। এ বাড়ীর বিগ্রহ তারিণী পণ্ডিত মশায়ের পঞ্চ প্রদীপ সমেত হাতের নাগালেব বাইরে চলে গেলেন !

মণ্ডপ ঘরের কাজ শেষ হল।

একে একে ওঁরা সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দাতুর ঘরের গালচে পাতা ফরাশে নতুন কবে সভা বসবে—সমস্ত ব্যাপারের নিতি নিক্ষিতি আলোচনা হবে এবার।

মা বলেন, পৃথিবীর অনেক গূঢ় কথা জেনে নিয়েছেন জানকী ঠাকুর মশাই। সত্যিই তো এত বড় জোট পাকান সমস্যার সমাধান করে দিতে তাঁর তো কোনো অসুবিধে হল না ! তারিণী পণ্ডিত মশাইকে এক এক করে সবই বুঝিয়ে দিলেন।

মামাকে যাবার আগে তিনি বললেন

—এখনকার মত কাজ শেষ হল ভবশংকর ! বসে থাকার মত সময় নেই হাতে নয়তো আরো ছুদিন থেকে যেতাম।

মামা চুপ করে তাঁর কথা শুনলেন।

তিনি আবার বললেন

—বলারও নেই কিছু তোমাকে। নিজের বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে

তুমি কাজ করতে পার, তাই অযথা উপদেশ দেবার দরকার করে না তোমাকে।

তাঁর বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে। তিনি নীল মখমলের চটি পরেছেন আবার। তাঁর মোষের শিংএর খুঁটি লাগান খড়ম বেতের ঝাঁপির ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে।

মামা আর শুভোকাকা দুজনেই সংগে গেলেন রেলগাড়ীতে তাঁকে তুলে দিতে। দাদুর ঘর আবার খালি হয়ে গেল, ঠাকুর মশাই যে দাদুর ঘরেই ছিলেন কদিন।

ভেতর বাড়ীও খালি হয়ে গেছে। মামীমা আজ সকালেই বাপের বাড়ী চলে গেছেন।

সেই বিধানই তো দিয়েছেন জানকী ঠাকুর মশাই। মামীমা যে এ বাড়ীর বউ, তাই বিগ্রহ বিদায় দেখতে নেই তাঁকে।

দুই বিগ্রহকেই চলে যেতে হবে এ বাড়ী থেকে, নারায়ণ ছাড়া মহাদেবের পূজো হয় না এবাড়ীতে; ঠাকুর মশাই সেই কথাই বলেছেন।

বিগ্রহের পাট উঠে যাচ্ছে এ বাড়ী থেকে; কেউ জানে না আবার নতুন করে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা আর হবে কি না। মামা শুভোকাকাকে সেই কথাই বলছিলেন

—জান শুভো, কে হাট বসায় আর কাকে তুলে দিতে হয় সেই হাট, আমাকে দেখেই বুঝতে পার!

শুভোকাকা এ কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনি মামার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন বাকী কথা শোনার জন্যে।

মামা আবার কথা কইলেন

—মনে হচ্ছে, অনেক পীড়ন করা টাকা দিয়ে এই সম্পত্তির পত্তন করা হয়েছিল, অনেক পাপ লুকোনো আছে এর গায়ে। কে পাপ করে গেছে আর কাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে সেই পাপের! দীর্ঘ দিনের সঞ্চয়পুষ্ট পাপ আমার হাতেই পরিষ্কার হতে চলেছে আজ; এ তো কম সৌভাগ্যের কথা নয় শুভো! সেই বনেদ পাতার দিন

থেকে আরম্ভ করে বর্তমানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত অনাচার, সমস্ত পাপকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে হবে—এতটুকুও বাকী রাখলে চলবে না।

শুভোকাকা বললেন

—তোমার মাথায় পাহাড় প্রমাণ বোঝা চাপান, আগে অমংগলের বোঝা নামিয়ে ফেল ভবশংকর, তার পরে সারা জীবন ধরে যত আবর্জনা আছে পরিষ্কার করে যেও।

মামা আর কথা কইলেন না। তিনি আনমনে কি যেন ভাবতে লাগলেন—তাই শুভোকাকাকেই কথা কইতে হল আবার, তিনি বললেন

—এ অবস্থায় তোমাকে একা ছেড়ে দেওয়া চলে না—আমিও যাব তোমার সংগে।

মামা এবারও কোনো কথা কইলেন না কেবল করুণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন শুভোকাকার মুখে।

আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছি মামা কি ভাবছেন এখন; তিনি ভাবছেন, সত্যিই শুভো আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। কিন্তু এটুকু আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, ওই পাথরের মত কঠিন মানুষকে কি করে এত ভালবাসতে পারলেন শুভোকাকা?

আজ শুক্লা চতুর্দশী। আজই বিগ্রহ চলে যাবার দিন। জানকী ঠাকুর মশাই এই ব্যবস্থাই তো করে গেছেন!

অনেক দিন এক জায়গায় ছিলেন—এ যেন ওঁদের ঘর পালটে নেওয়া! মা সেই কথাই বললেন—সারা জগতেই ওঁদের ঘর পাতা আছে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে চলে যাবেন ওঁরা। সারা পৃথিবী জুড়ে ওঁদের ফুল বাগান তৈরী আছে, যে কোনো গাছ থেকে ফুল এনে ওঁদের পূজো হয়!

ঠিক কথাই! এতকাল খিড়কি বাগানের অজস্র ফুলে ওঁদের নৈবেদ্য সাজান হল, এবার নতুন বাগান থেকে ফুল আসবে ওঁদের।

তুমি কাজ করতে পার, তাই অযথা উপদেশ দেবার দরকার করে না তোমাকে।

তাঁর বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে। তিনি নীল মখমলের চটি পরেছেন আবার। তাঁর মোষের শিংএর খুঁটি লাগান খড়ম বেতের ঝাঁপির ভেতবে আশ্রয় নিয়েছে।

মামা আর শুভোকাকা দুজনেই সংগে গেলেন রেলগাড়ীতে তাঁকে তুলে দিতে। দাদুর ঘর আবার খালি হয়ে গেল, ঠাকুর মশাই যে দাদুর ঘরেই ছিলেন কদিন।

ভেতর বাড়ীও খালি হয়ে গেছে। মামীমা আজ সকালেই বাপের বাড়ী চলে গেছেন।

সেই বিধানই তো দিয়েছেন জানকী ঠাকুর মশাই। মামীমা যে এ বাড়ীর বউ, তাই বিগ্রহ বিদায় দেখতে নেই তাঁকে।

দুই বিগ্রহকেই চলে যেতে হবে এ বাড়ী থেকে, নারায়ণ ছাড়া মহাদেবেব পূজো হয় না এবাড়ীতে ; ঠাকুর মশাই সেই কথাই বলেছেন।

বিগ্রহের পাট উঠে যাচ্ছে এ বাড়ী থেকে ; কেউ জানে না আবার নতুন কবে ঠাকুরেব প্রতিষ্ঠা আর হবে কি না। মামা শুভোকাকাকে সেই কথাই বলছিলেন

—জান শুভো, কে হাট বসায় আর কাকে তুলে দিতে হয় সেই হাট, আমাকে দেখেই বুঝতে পার !

শুভোকাকা এ কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনি মামার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন বাকী কথা শোনার জন্যে।

মামা আবার কথা কইলেন

—মনে হচ্ছে, অনেক পীড়ন করা টাকা দিয়ে এই সম্পত্তির পত্তন করা হয়েছিল, অনেক পাপ লুকোনো আছে এর গায়ে। কে পাপ করে গেছে আর কাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে সেই পাপের ! দীর্ঘ দিনের সঞ্চয়পুষ্ট পাপ আমাব হাতেই পরিষ্কার হতে চলেছে আজ ; এ তো কম সৌভাগ্যের কথা নয় শুভো ! সেই বনেদ পাতার দিন

থেকে আরম্ভ করে বর্তমানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত অনাচার, সমস্ত পাপকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে হবে—এতটুকুও বাকী রাখলে চলবে না।

শুভোকাকা বললেন

—তোমার মাথায় পাহাড় প্রমাণ বোঝা চাপান, আগে অমংগলের বোঝা নামিয়ে ফেল ভবশংকর, তার পরে সারা জীবন ধরে যত আবর্জনা আছে পরিষ্কাব করে যেও।

মামা আর কথা কইলেন না। তিনি আনমনে কি যেন ভাবতে লাগলেন—তাই শুভোকাকাকেই কথা কইতে হল আবাব, তিনি বললেন

—এ অবস্থায় তোমাকে একা ছেড়ে দেওয়া চলে না—আমিও যাব তোমার সংগে।

মামা এবারও কোনো কথা কইলেন না কেবল করুণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন শুভোকাকার মুখে।

আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছি মামা কি ভাবছেন এখন; তিনি ভাবছেন, সত্যিই শুভো আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। কিন্তু এটুকু আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, ওই পাথরের মত কঠিন মানুষকে কি করে এত ভালবাসতে পারলেন শুভোকাকা ?

আজ শুক্লা চতুর্দশী। আজই বিগ্রহ চলে যাবার দিন। জানকী ঠাকুর মশাই এই ব্যবস্থাই তো করে গেছেন!

অনেক দিন এক জায়গায় ছিলেন—এ যেন ওঁদের ঘর পালটে নেওয়া! মা সেই কথাই বললেন—সারা জগতেই ওঁদের ঘর পাতা আছে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে চলে যাবেন ওঁরা। সারা পৃথিবী জুড়ে ওঁদের ফুল বাগান তৈরী আছে, যে কোনো গাছ থেকে ফুল এনে ওঁদের পূজো হয়!

ঠিক কথাই! এতকাল খিড়কি বাগানের অজস্র ফুলে ওঁদের নৈবেদ্য সাজান হল, এবার নতুন বাগান থেকে ফুল আসবে ওঁদের।

বাণলিংগদেব ফুল নেবেন কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে। বিগ্রহ নরোত্তমদেবের কিন্তু ফুল নেওয়া শেষ হয়ে গেছে। তাঁকে প্রয়াগের ত্রিবেণী সংগমে নামিয়ে দিতে হবে, ত্রিধারা সংগমে উনি চিরকালের জন্যে বিশ্রাম করবেন।

খিড়কি বাগানের চাঁপা গাছ থেকে ফুল এনেছি সাজি ভরে।

দাদুর পোঁতা চাঁপা গাছের ফুল!

তারিণী পণ্ডিত মশাইকে বলেছি তিনিই ঠাকুরদের ফুল দিয়ে দেবেন, আমি নিজের হাতে দিতে পারব না—আমার যে পৈতে হয়নি! তারিণী পণ্ডিত মশাইকে আগে থেকে তাই বলা আছে, তিনি আমার হয়ে দাদুর হাতের পোঁতা চাঁপা গাছের ফুল শেষ বারের মত ঠাকুরদেব দিয়ে দেবেন।

সময় হয়ে এল বুঝতে পারছি।

তারিণী পণ্ডিত মশাই মণ্ডপ ঘরের পালংক থেকে বাণলিংগদেবকে তুলে নিয়েছেন। তাঁর গলায় নামাবলীর দুখানি ঝুলি বাঁধা আছে দুই বিগ্রহের জন্যে।

সাজি থেকে চাঁপা ফুলে উনি ঝুলি ভরে নিয়েছেন।

বাণলিংগদেবকে নামিয়ে নিলেন ঝুলিতে, এবার কুলুংগি থেকে নরোত্তমদেবকেও নামিয়ে নিতে হবে।

বাইরে জুড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বার বাড়ীর বারান্দায় স্থির হয়ে মামা অপেক্ষা করে আছেন, তারিণী পণ্ডিত মশাই মণ্ডপ ঘর থেকে এলেই বেরিয়ে পড়তে হবে; বারবেলা সুরু হবার আগেই তাঁদের যাত্রা করা চাই!

শুভোকাকা ও বাড়ীতে তৈরী হয়ে আছেন। উনি একাই চলে যাবেন স্টেশনে ও বাড়ী থেকে; তিন বামুনের যাত্রা অশুভ তাই আলাদা ব্যবস্থা!

ঠাকুরদালান ফাঁকা পড়ে আছে আজ।

মামীমা কদিন আগেই তো বাপের বাড়ী চলে গেছেন; ক্ষীরি-

কাকীর এ বাড়ীতে আসার সময় কোথায়? তিনি শুভোকাকার বাইরে যাওয়ার তোড়জোড় নিয়ে ব্যস্ত।

মা নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়ে একমনে সুর করে কাশীদাসী মহাভারত পড়ছেন। তিনিও বিগ্রহ বিদায় দেখবেন না, তাই এই অসময়ে নিজের ঘরে চলে গেছেন।

অন্ধকার এই রাতের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে দূর প্রসারী দৃষ্টি দিয়ে ওই থামের সারি লাগান বাড়ীর দিকেই তো দেখলাম, তার জীর্ণ নির্জনতা নিয়ে তো সে দেখা দিলে না!

এখনও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওই বাড়ীর অগুনতি ঘরে ঘরে নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মে চেরাগের পর চেরাগ জ্বলে উঠেছে। ঠাকুর দালানে দাঁড়িয়ে মা সন্ধ্যার মংগল শাঁখ বাজিয়ে দিলেন। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। খিড়কি বাগান থেকে নীড়ে ফেরা পাখিদের কাকলি শোনা যাচ্ছে।

বার বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরেও আলো জ্বলে উঠেছে। নিত্য-দিনের অভ্যাসেই মনে হল—ওই শূন্য ঘরেই যেন সন্ধ্যার বৈঠক বসেছে। মামা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সটকা টানছেন, তাঁর কাঁধের ওপরে দোশালা চাপান। শুভোকাকা বসে আছেন তাঁর পাশে, দুজনের মধ্যে হয়তো কোনো জটিল কাজ কর্মের আলাপ আলোচনা হচ্ছে।

দূরে কাশীশ্বরদের মহলে তাদের সুর, বেসুর আর চীৎকারের ভজন জমে ওঠার অপেক্ষায় আছে। মামা বাড়ী নেই আজ, তবু যেন তারা প্রতিদিনের অভ্যাসেই তাঁর ভেতর বাড়ী চলে যাওয়ার অপেক্ষায় সময় কাটাচ্ছে।

অন্দরের দালানের বৈঠকও ভেঙে গেছে। সন্ধ্যাবাতি জ্বলার আগেই ক্ষীরিকাকী ও বাড়ী চলে গেছেন।

দালানের মাঝামাঝি মায়ের ঘর, সে ঘরেও আলো জ্বলে উঠেছে। আমার উপস্থিতি মা জানতে পেরে গেছেন, তাই ডাক দিলেন

—অমি ঘরে আয়, হিমে দাঁড়িয়ে থাকিসনে আর।

তাঁর ডাকে সাড়া দিতেই হবে। ঘরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমাকে

—হ্যাঁ রে, সারা দিন তুই মুখ বুজে অত শত কি দেখিস বল দেখি ?

এ সব কথার উত্তর লাগে না, তাঁর গা ঘেঁষে একবার দাঁড়ালেই হল। তিনি তখন মাথায় হাত বুলিয়ে দেন আর মনের কথাও জেনে নেন সাথে সাথে।

ঘরের ওদিকে রাখা, লতা-পাতা-কাটা আখরোট কাঠের সিন্দুকটা খোলা দেখলাম যেন ?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছি ! আজ আবার সিন্দুকে হাত দিয়েছেন মা ; কোনো কাজ না থাকলেই ওই সিন্দুকে হাত পড়ে তাঁর ! ও সিন্দুক এ বাড়ীর অনেক কালের সম্পত্তি। ওর গহ্বরে এ বাড়ীর নানা কালের বিচিত্র জিনিষ জমা হয়ে আছে।

দাদুই একদিন মাকে ওই সিন্দুকের জিম্মা দিয়ে বলেছিলেন

—রতু ভারি দামী জিনিষ এটি। এ বাড়ীর নানা কালের সঞ্চয় জমা হয়ে আছে এর ভেতরে। তোর হেফাজতে রইল, জিনিষগুলোর যত্ন করিস মা !

এই অকিঞ্চিৎকর ঘটনাটিও পরিষ্কার মনে করতে পারি আজও !

বুঝতে পারছি, ওই সিন্দুকের সঞ্চয়গুলোকে তিনি পরিপাটি করে গুছিয়েছেন আবার। সেই সঞ্চয়গুলোই যেন তাঁর চোখের সামনে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারই মধ্যে দিয়ে এই প্রকাণ্ড বাড়ী-টাকে, তার বিচিত্র ধারাগুলোকে তিনি নতুন করে চিনে নিচ্ছেন। তাঁর চোখের সামনে যেন অনেক প্রাচীন চিন্তা, প্রাচীন ভাবধারা জোট পাকিয়ে উঠেছে ; সেই জোট পাকান দৃষ্টির সামনে আমিও যেন হঠাৎ এসে পড়েছি। তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন !

ডালা খোলা সেই সিন্দুকের কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন তিনি, তার খুপরির থেকে জলতরংগ নক্‌সা কাটা একজোড়া দুধে-বালা তুলে নিলেন। তার পরে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন

—তুই এতটুকু ছেলে তখন, আমার কোলে শুয়ে আছিস, এই বালা জোড়া আমার হাতে দিয়ে তোর বাবা বললেন—পরিয়ে দাও খোকাকে।

বালাজোড়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তার পরে আবার বললেন

—এই তো সে দিনের কথা, তখনও তোর ভাত হয়নি! এরই মধ্যে তুই কত বড় হয়ে উঠলি, আমার কোলের বাইরে চলে গেছিস এখন। সারা দিন মুখ বুজে দুনিয়ার সব জিনিষ দেখে নিচ্ছিস, চিনে নিচ্ছিস ... আমি কিন্তু তোর দিকেই তাকিয়ে আছি!

কথা শেষ করে আমার হাত দুটো তিনি নিজের কোলের কাছে টেনে নিলেন। এ আবার কি! আমার হাতেই তিনি বালা পরিয়ে দেবেন না কি? কিন্তু আমি যে বড় হয়ে গেছি! এ বয়সে কেউ বালা পরে না কি? কিন্তু তাঁকে বাধা দেবার সাহস কোথায়? নিজের মনেই বুঝতে পেরেছি ওই বালাই পরতে হবে আজ, কোনো ওজর আপত্তি চলবে না!

আবার মা কথা কইলেন

—এই বালাজোড়ায় তোর বাবার অনেক আহ্লাদ, আশা আর আশীর্বাদ জড়িয়ে আছে, তাঁর আশীর্বাদী বালা দিয়ে তোর সকল অমংগল সরিয়ে দিলাম আজ; আর কোনো ভয় রইল না আমার।

সারা বাড়ীতে যেন নিশুত রাতের অন্ধকার খাঁ খাঁ করছে! এ বাড়ীতে যেন কোনো মানুষ নেই, কোনো প্রাণী নেই; পৃথিবীর সমস্ত নিস্তব্ধতা আজ বাসা বেঁধেছে এখানে!

হ্যাঁ, ঠিকই তো! এবাড়ীতে বিগ্রহ নেই, মামা বিগ্রহ নিয়ে প্রয়াগে গেছেন; মামীমাও নেই, তিনি তাঁর বাপের বাড়ী

গেছেন। থাকার মধ্যে কেবল মা আর আমি এই বাড়ীর বহু কালের পুরোনো এক আখরোট কাঠের সিন্দুকের সামনে বসে আছি দুজনে। কারো মুখে কথা নেই, বহু কালের ওই পুরোনো সম্পত্তি যেন অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!

মায়ের চোখের কোণে জল জমে উঠেছিল। আঁচলের খুঁটে তিনি চোখ মুছে নিলেন, তার পরে ভারী গলায় বললেন

—এইটুক বড় হয়েই তুই আমার কোলের বাইরে চলে গেছিস, একদিন হয়তো নাগালেরও বাইরে চলে যাবি....সেদিন হয়তো আমার ডাক তোর কানে গিয়েই পৌঁছবে না....।

বাকী কথাগুলো তাঁকে শেষ করতে দিই নি। আমার বালা পরা হাতে তাঁর মুখ ঢেকে দিয়ে ছিলাম, ব্যাকুল স্বরে তাঁকে বলেছিলাম

—তুমি দেখে নিও মা, তোমার কথাই ভুল হয়ে যাবে একদিন.... তুমি ঠিক তা বুঝতে পারবে!

কালের গতিতে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নিকেশ নেই, কোনো দিশাও খুঁজে পাই নে। তবে তিনিই যে আমার নাগালের বাইরে চলে গেছেন এ হিসেবে কোনো ভুল নেই। তবু তাঁর কথা একটুও অস্বচ্ছ হয়ে যায়নি, এতটুকুও ভুলে যাইনি তাঁকে। তাঁর অনেক বলা, আর না-বলা কথার, অনেক লুকিয়ে রাখা দুঃখের ঝুলিই তো বয়ে বেড়াচ্ছি আর বয়েও বেড়াব বহুকাল ধরে। এই তো এখানে দাঁড়িয়ে এখনও তাঁর কথাই তো ভাবলাম, নতুন করে তাঁর কাছেই শুনে নিলাম মুখুয্যে বাড়ীর সেই পুরোনো কাহিনী। সেই বিগত কালের কোনো এক অংশে ঢুকে পড়ে সেই থামের সারি লাগান বাড়ীর ভেতরেই তো ঘুরে বেড়ালাম— নতুন করে দেখে নিলাম—সেই পুরাকালের আখরোট কাঠের সিন্দুকের বাটালি কোঁদা লতা পাতার নক্সাগুলো!

হঠাৎ চেয়ে দেখলাম, সেই প্রাচীন সিন্দুকের ডালা খুলে গেছে ভেতর বাড়ীর দালানের সেই মাঝামাঝি ঘরে; মা ঠিক তারই

পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সিন্দুকের অগুনতি খুপরির কোনো এক খুপরি থেকে এক জোড়া জলতরংগ নক্‌সা কাটা দুধে-বালা বেরিয়ে এসেছে তাঁর হাতে। আমার সমস্ত অনাগত অমংগলকে তিনি ওই বালাজোড়া দিয়ে দূর করে দিতে চান।

॥ ছয় ॥

আবার তলব করতে হল মতলবকে। তারই তাগিদে ভাঙাচোরা এই কাহিনী হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে, তাকে তলব করা ছাড়া উপায়ই বা কি? কিন্তু মনে হল সে বেশ দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ আগে যে ব্যবধান নিজেই কমিয়ে দিয়েছিল তা কিন্তু এই ফাঁকে বাড়িয়ে নিয়েছে আবার।

আমি ডাক দিলাম

—শুনতে পাচ্ছ?

সে চুপ করে রইল।

আমি কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম আবার

—শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা?

সে সাড়া দিলে না।

এই গভীব রাতে, গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে, সুখ-দুঃখ-ভর স্মৃতিগুলো অতীতের ঝুলি থেকে টেনে বাব করে সে সরে দাঁড়াল? কুচক্রী মানুষ ছাড়া এ ব্যবহার কে করবে! কাজ ভাল হয়নি বুঝে নিলাম, প্রশ্রয় দেওয়ার আগে পূর্বাপব ভাল মন্দ ভেবে দেখা উচিত ছিল বৈ কি!

এই তো গলদ ধরা পড়ে গেছে, নিজেকে শক্ত করে নিতে আর কোনো অসুবিধে নেই; মানসিক দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে নিজেকে শক্ত করে নিলাম। সস্তা বন্ধুত্বের মিঠে কথায় আর টলাতে পারবে না কেউ!

অতীতকে অবলম্বন করে মনের চারিপাশে স্মৃতির যে জাফ্‌রি

কাটা জানলাগুলো দেখা দিয়েছিল, তাড়াতাড়ি পরদা টেনে দিতে আরম্ভ করলাম সেই জানলাগুলোয়। আলো হাওয়ার দরকার নেই—এ সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে আলো হাওয়ার কোনো প্রয়োজন করে না!

আখরোট কাঠের সেই পুরোনো সিন্দুকের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হাতের গোড়ায় সেই সিন্দুক থাকলে এই সঞ্চয়গুলোকে তারই গহ্বরে চালিয়ে ডালা বন্ধ করে দিতাম। এতকাল পরে বেশ পুরোনো হয়ে গেছে এই স্মৃতিগুলি, ও সিন্দুকে বাস করার অধিকার হয়েছে এদের। কিন্তু কোথায় সেই মুখুয্যে বাড়ীর আদি কালের সিন্দুক? আমার জীবন থেকে তার অস্তিত্ব চিরকালের জন্মে মুছে গেছে, সম্পূর্ণ ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে সেই মূল্যবান সম্পত্তি।

দুর্বল চিন্তা নতুন করে যেন ঘিরে ধরতে চায়, তাই গা-ঝাড়া দিলাম আবার। ওই জাফরি কাটা জানলাগুলোর চারিধারে আঁটসাঁট পরদা টানা, পুরোনো চিন্তাধারার যাওয়া-আসার পথ একেবারে বন্ধ; ভাবনার মোড় ফিরিয়ে দিতে কোনো অসুবিধে নেই আর। এই তো খেইও জুটে গেল সংগে সংগে! মেহেবুব আলির কথাকেই তো খেই ধরে নিলাম।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন মেহেবুব আলি, বদরিকার মামলায় মাথা গলাতে যাওয়া মোটেই উচিত কাজ হয়নি!

কিন্তু কি উপায়ই বা ছিল তখন?

না না, কোনো উপায়-ই ছিল না! ঘোড় দৌড়ের জিদে গরম মেজাজ কোনো কালেই ভূত ভবিষ্যতের তোয়াক্কা করে না, একথা কে না জানে? তাই কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই বলে দিলাম

—ঠিক আছে বদরিকা, হীরাজুলি এস্টেটের জন্মে দুশ্চিন্তা করতে যেও না তুমি, ও ব্যাপারে তোমার পেছনে আমিই দাঁড়ালাম। কি হে, খুশী তো এবার?

বদরিকাও তেতে ছিল। দৌড় শেষ হবার পরে ঘোড়ার দেহের

মতই তাতা মন তার! ভাসাভাসা চোখ দুটো সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে সে একবার তাকাল আমার মুখে, তার পরে বললে

—আপনিও জেনে রাখুন চ্যাটার্জি সাহেব, বদরিকার ইমান ঠুন্‌কো নয়! মানীর মান রাখতে জানে, গুণীর কদব করে আর বন্ধুত্বের দাম দেয় বদরিকা উপাধ্যায়।

তার দিকে চেয়ে দেখলাম একবার, তার মুখের তামাটে রঙ আরো বেশী তামাটে হয়ে গেছে, গালের পেশী দুটোতে দৃঢ়তার ছাপ, আর চোখে নিশ্চিন্ততাব তৃপ্তি। সে আত্ম সচেতন ভাবে নিজের ডান হাতখানা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে

—পাকা কথা তো চ্যাটার্জি সাহেব?

আমি তার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম

—এদিক ওদিক নেই এর, নড়চড়ও নেই···একেবাবে পাকা!

পাকা কথার দরকার, হয়েও গেল তাই! কিন্তু লেন-দেন পাকা করতে হলে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়! তখন সে সুযোগ কোথায়? ঘোড দৌড়ের তাতে গরম মেজাজ ওসবের তোয়াক্কা করে না। ভাবা-ভাবি, গোনা-গাঁথা, বোঝা-বুঝির কোনো দাম নেই তখন! কথা দিতে হয় দাও, না দিতে চাও—তাতেও কোনো দুঃখ নেই! কিন্তু বাজে সময় নষ্ট করতে নারাজ, করাতেও রাজী নই!

আইনের কেতাবে কিন্তু এসবের কোনো হদিস লেখা নেই, তাই মেহেবুব আলির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় এ ধরণের কোনো চুক্তিনামা। দাবার ছকে ঘোড়ার আড়াই পেয়ে চালে এর হিসেব নিকেশ হয় না—এ যে বিলকুল অন্য জিনিষ! আইনের জটিল ভাষার অর্থ হয়তো টেনে বার করতে পারেন মেহেবুব আলি; কিন্তু ঘোড়দৌড়ের মাঠের ভাষা যে একেবারে আলাদা বস্তু!

ঘন ঘন রঙ পালটায় এ ভাষার। বাজি হারলে এক রঙ। বাজি খেলার আগে আর এক। আর বাজি জিতলে তো কথাই নেই!

আইনের প্যাঁচ-কাটা দুর্বোধ্য ভাষা মেহেবুব আলিকে নিশ্চয়ই

সাহায্য করে জীবনের অনেক জটিল আর ঘোলাটে সমস্যাকে স্বচ্ছ করে দিতে—দেনও তিনি তাই করে ; আইনজীবির কাজই যে এই ! তবে সে বাজিতেও গোল বাধে অনেক সময়। খেলাও বেহাত হয়। নজিরের ভাঁড়ার হাতড়ে তখন তাঁকেও বুঝে নিতে হয় যে ভাণ্ড একেবারে ফাঁকা ! জুয়াড়িদের সুরে সুর মিলিয়ে তখন তাঁকেও বলতে হয়

—আল্লাই এ দুনিয়ার মালিক ! মানুষের ভাগ্য তো তাঁরই হাতে ! যা ভবিতব্য তাকে ঠেকাবে কে ? জানেন মিষ্টার চ্যাটার্জি, মানুষ চিরকাল উপলক্ষ্য হয়েই বেঁচে আছে এই পৃথিবীতে, আর থাকবেও তাই !

ভক্তিতে তাঁর চোখ বুজে আসে, তিনি হঠাৎ কেমন আত্মস্থ হয়ে পড়েন। আমার ওপরে তাঁর টানটা একটু অন্য ধরণের, সে কথা অকপটেই স্বীকার করেন তিনি আর বলেন

—আপনি কিন্তু আল্লার নেক নজরে আছেন মিষ্টার চ্যাটার্জি !

তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক্ দেখা দিতে থাকে !

আমি জিজ্ঞেস করি

—তাই না কি ! খবর পেলেন কেমন করে ?

মেহেবুব আলি গম্ভীর হয়ে বলেন

—পূর্ব পুরুষের আশীর্বাদ না থাকলে এমনটি হয় কখনো ?

আল্লার নেক নজরের খবর, আমার পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদের কথা তিনি বোধহয় এক দুষ্কুলসম্ভূতা স্ত্রীরত্নের ভেতর দিয়েই দেখতে পান—আমার জীবনের অনেক জটিল রহস্যেরও যেন হদিস মেলে ! সেই ধরণের ভাষাই তাঁর চোখে ফুটে উঠে ঠোঁটের কোণে চতুর হাসির ঝিলিক খেলায়।

ঘুরে ফিরে আবার সুসানার কথায় এসে পড়লাম। তাতেই বা ক্ষতি কি ? না, কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই তাকে নিয়ে, তবে হীরাজুলি এস্টেট্ আর তার মামলার কোনো খবরই তাকে দিইনি। এই যে মামলার জালে নিজের অষ্টাংগ জড়িয়ে গেছে—তার কোনো খবরই

জানে না সে। জানালেও ক্ষতি ছিল না অবশ্যই। কিন্তু সাহসে কুলোয় নি তাকে এ সংবাদ দিতে। বদরিকাকে নিয়েই যত সংকোচ! দ্বোয়ারকা প্রসাদের আত্মীয় সে, যে দ্বোয়ারকার সান্নিধ্য বাঁচিয়ে চলার অনুরোধ করেছিল সুসানা একদিন, তাই এ সত্যটুকু গোপন রাখতে হয়েছে তার কাছে।

ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ কত বাঞ্ছিত আর অবাঞ্ছিত সংসর্গেই জড়িয়ে পড়ে! তা নিয়ে তার দুশ্চিন্তিত হবার, অথবা দুঃখ করার কি থাকতে পারে? হয়ত এ সংবাদ কানে গেলে কিছুই বলবে না সুসানা, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে কিছুকাল; তার মূক দৃষ্টিই সবচেয়ে ধারাল আর মারাত্মক অস্ত্র! সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন বিব্রত মনে হয়, অসহায় মনে হয় নিজেকে—হাতের কাছে তখন কোনো অবলম্বন খুঁজে পাইনে।

অনেক সময় মনে হয় উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট করে দেবার জন্যেই ওভাবে তাকায় সুসানা। সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে চেতনার স্নায়ু-গুলোয় দুর্বলতার কাঁপুনি লাগে, সেই কাঁপুনি যেন আত্মবিশ্বাসের মূল পর্যন্ত নেমে গিয়ে বিপন্ন করে আমাকে। হীরাজুলির মামলায় নিজের অর্থ সামর্থ্য নিয়ে প্রতিদিন জড়িয়ে পড়ছি—এখবর তাই তাকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়াও আরো কিছু কারণ আছে, এই যে বলা আর না-বলার টানা পোড়েনে দুলে মরেছি এত দিন, এতেই তো বিলম্বের কারণ দেখা দিয়েছে; আর সেই বিলম্বই এখন একটা অতিকায় পাহাড়ের মত দুজনের সহজ সম্পর্কের মধ্যে এক বিশাল বাধার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে!

ও কথা থাক এখন। মেহেবুব আলির কথার খেই ধরে এগিয়ে চলেছি, তাঁর কথাই ভাবি! হ্যাঁ সত্যিই মেহেবুব আলি নিজের পেশাকে সম্মান করেন, পেশাদার মানুষ তিনি; একের কথা অপরের কাছে ভুলেও প্রকাশ করেন না। নিজের জায়গায় শক্ত-পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের কাজ করে চলেন, তাই তো এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি

হীরাজুলি এস্টেটের অনেক জটিল খবরাখবর যোগাড় করেছেন। আইনের চুলচেরা বিচারে মামলার গলদগুলো কোথায় আর কি ভাবে লুকিয়ে আছে তার সঠিক সন্ধানও তিনি জেনে নিয়েছেন এরই মধ্যে।

সেই কথাই তো অকুণ্ঠিত মনে তিনি বললেন

—এ মামলায় অনেক গলদ রয়েছে মিষ্টার চ্যাটার্জি। ছোট খাট যে সে গলদ নয়, একেবারে মূল পর্যন্ত নেমে যাওয়া গলদে মামলার গোড়া শক্ত নয় মোটেই। হীরাজুলির মাটিতে অধিকারের শেকড় শক্ত হওয়ার আগেই বিবাদ বেধেছে। টাইটেল মোটেই শক্ত নয় বদরিকার!

মেহেবুব আলিব কথা আর তাঁর পরামর্শ শুনতেই তো এসেছি এখানে, প্রতিটি কথা তাই মন দিয়ে শুনে নিচ্ছি। এস্টেটের নক্সা আর রাজ্যের কাগজ পত্র তাঁর টেবিলেব ওপবে ছড়ান রয়েছে। তিনি মামলার নথি থেকে চোখ তুলে বললেন

—ইমানের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই এই দুনিয়ায়; এ কথা মোটেই অস্বীকার করিনে আমি। বদরিকাব ইমানও হয়তো ঠুনকো নয়—তাও না হয় স্বীকাব করে নিলাম, তবে এমনও তো হতে পারে মিষ্টার চ্যাটার্জি, জটিল মামলায় মামলায় সে ইমান একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে....; আর আপনিও নিশ্চিত স্বীকার কববেন যে ফোঁপরা ইমানের কোনো কিম্মৎই নেই!

প্রতিবাদ করার মত কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না হাতের গোড়ায়, তাই চুপ করে থাকতে হল। মেহেবুব আলি শক্ত মানুষ, আইনের পেশায় আরো শক্ত করে নিয়েছেন নিজেকে। তিনি আমার মংগল ছাড়া অমংগল চিন্তা করেন না। হাবে ভাবে যেন অনুমান হয়, গোটা এস্টেটখানাই তিনি আমার হাতে তুলে দিতে চান পাকে প্রকারে!

আর্থিক আকর্ষণ ছাড়া হীরাজুলির নিজস্ব আকর্ষণও আছে বৈ কি! ওই এস্টেটের নয়াগঞ্জ এলাকার সেই প্রকাণ্ড দীঘির কথাই

ধরা যাক না কেন! দীঘির স্বচ্ছ টলটলে জল কানায় কানায় ভরা, তার পাড়ে সাজান বাগান আর মাঝে চটকদারি জলটুঙি। বিহারের এই রম্য জায়গাটি যত্নকল্পিত। নিখুঁত করে তৈরী করা হয়েছিল এককালে। অনেক আশা এখানে তৃপ্তি খুঁজতে এসেছে, অনেক পিপাসা এখানে নিবারিত হয়ে বলেছে—আকণ্ঠ পানেও তৃপ্তি নেই জীবনে; কামহুতাশনের অনেক বন্দনা-গান অনেক ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে এই বিলাস-মন্দিরে।

বদরিকার মুঠো শক্ত করে ধরতে পারেনি এই লোভনীয় সম্পত্তি। টাইটেলের গণ্ডগোলেই ঢিলে মুঠো তার! হীরাজুলির নক্সা নথিতে এ কথা লেখা নেই। মেহেবুব আলিও জানেন না এর খোঁজ খবর; ওই জলটুঙিও চোখে দেখেননি; তাই নিরাসক্তের মত তিনি বললেন

—বদরিকার ফোঁপরা ইমানকে ভরাট করে নিতে হবে, ফাঁক থাকতে দিলে চলবে না মিস্টার চ্যাটার্জি।

আইনের কেতাবে ফাঁকা ইমানকে ভরাট করার অনেক হদিস লেখা আছে হয়তো, তাই তো মেহেবাবু আলির পক্ষে এত সহজে বলা সম্ভব হল

—বদরিকার অন্য সম্পত্তিগুলো জাকড় হিসেবে ধরে রাখতে হবে, নইলে তার ইমানও ঠুনকো হতে পারে একদিন!

মেহেবুব আলি একমনে নথির কাগজগুলো উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। আইনের ছাঁকনিতে ছাঁকা নজর তাঁর বদরিকার সম্পত্তির ওপরে গিয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই! হীরাজুলির জালে জড়িয়ে নিজের উদ্বেগ বেড়েছে বৈ কমেনি, মেহেবুব আলি কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে বদরিকার অধিকারগুলোকে অমিতাভ চাটুয্যের সুবিধায় নুইয়ে নিতে চান—আইনের চোখে লজ্জা নেই, ঘোড়দৌড়ের মাঠের উত্তেজনা আর উত্তাপের স্বীকৃতিও নেই, ইমানকে ঠুনকো ভাবার উল্লাসেই ডগমগ করছে!

মেহেবুব আলির ভাবনার মোড় ফিরল আবার, তিনি বললেন

—দুখানা চুক্তিপত্র বদরিকা সই করে দিয়েছে···বাকী কাগজগুলো কিন্তু···

বদরিকার প্রসংগ হঠাৎ বিরক্তিকর মনে হল, তাই মেহেবুব আলির কথায় বাধা দিয়ে বললাম

—বিশদ বিবরণের কোনো দরকার নেই; ও কাজেব ভার তো আপনার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি আলি সাহেব!

চমকে উঠলেন মেহেবুব আলি; যে কোনো বাধাই তাঁকে চঞ্চল করে। তবু তিনি নিজেকে সংযত কবে কি যেন ভাবলেন, তার পরে বললেন

—ভাল, বদরিকার কথা আপাতত বন্ধই থাক! কিন্তু হীরাজুলির সঠিক পরিস্থিতি জানিয়ে দিতে কোনো বাধা দেখি না, কি বলেন আপনি?

আমি মনে মনে বললাম—বদরিকা মানেই হীরাজুলি আর হীরাজুলি মানেই বদরিকা! কিন্তু নিজের ভাব গোপন কবে মুখে বললাম

—কি বলতে চান বলুন আপনি!

মামলার কাগজের ভেতর থেকে আর্থার ম্যালকমের জবানবন্দি টেনে নিয়ে তিনি বললেন

—ইংরেজ মালিকের এস্টেট্ হীরাজুলি। বরাত ফেরেই এই আয়পুষ্ট সম্পত্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছে বদরিকা; কিন্তু মূল সরিকের একমাত্র ওয়ারিশ টান দিয়েছে এব টাইটেলে···জুয়াড়ী বদবিকা এখন অমিতাভ চ্যাটার্জিকে কাণ্ডারী করে এই রুখো সাগর পাড়ি দিতে চায়; বদরিকার অন্য সম্পত্তির জাকড় ছাড়া কোনো যুক্তি নেই এই ছেঁড়া ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার।

পাকা আইনজ্ঞ মানুষ মেহেবুব আলি, নিক্তিতে ওজন করে কথা কন; এমন মানুষের সান্নিধ্যে বৈষয়িক জ্ঞান অবশ্যই বাড়ে—জ্ঞান ভাণ্ডারে কিছু মাল-মশলা সত্যিই জুটিয়ে নিয়েছিলাম সেদিন!

গাড়ীর সহিস ঘরের দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল, বললে

—ঘোড়াগুলো দানা-পানি পায়নি অনেকক্ষণ, সময় থাকলে ঘোড়া পালটে আনাই ভাল।

ঠিক কথাই তো! সকাল থেকে একটানা খেটে গেছে ঘোড়াদুটো, সারা দিন বিশ্রাম পায়নি। সহিসকে বলে দিলাম, এতরাতে ঘোড়া পালটে আনার দরকাব নেই। কুক কোম্পানীর আস্তাবলে গাড়ী ঘোড়া জিম্মা দিয়ে ওরা ছুটি নিক; রাতে আর টানা-পোড়েনে কাজ কি?

মেহেবুব আলি মন দিয়ে কথাগুলো শুনে নিয়ে আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে তাকালেন; মনে হল তিনি যেন বলতে চান, এই লম্বা পথে ফেরত পাড়ি দেবাব ব্যবস্থা হবে কি তাহলে?

তাঁর মৌন প্রশ্নের জবাবে বললাম

—দরকার হলে একটা ঠিকে গাড়ী ডেকে নিলেই চলবে, কি বলেন আলি সাহেব?

মেহেবুব আলি কিন্তু অন্য কথা ভাবছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন

—বদরিকার কথা জিজ্ঞেস কবলেন মিষ্টার চ্যাটার্জি?

তাঁর ভুল শোধরাবার জন্য আমি বললাম

—না তো!

বদরিকার নামে কিন্তু সত্যিই যাদু আছে; নিমেষের মধ্যে মনের এক কিনারা থেকে অপর কিনারা পর্যন্ত বিদ্যুতের চিড় খেলে গেল আর মুখ ফসকে বেরিয়ে এল

—হ্যাঁ, বদরিকাও যে সেদিন গাড়ী ছেড়ে দিতে বলেছিল!

মেহেবুব আলি সোজা হয়ে বসলেন; পরিপাটি ছাঁটা দাড়ির ফাঁকে দেখা গেল তাঁর ঠোঁটের দুই প্রান্তথেকে কৌতূহলের ধারালো হাসি ফুটে বেরোচ্ছে; কাঁধে অল্প নাড়া দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন

—কবে আবার আপনাকে গাড়ী ছেড়ে দিতে বলেছিল বদরিকা?

একি বেফাঁস কথা বললাম? তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শোধরাবার জন্যে হালকা ভাবে বলতে হল

—সে এক আজগুবি ব্যাপার ; এমন কিছু নয়।

মেহেবুব আলিও হাসতে হাসতে বললেন

—হোক না আজগুবি—বদরিকার কথা তো !

তিনি মামলার নাথপত্রগুলো গুটিয়ে লাল ফিতেয় গেরো বাঁধতে বাঁধতে বললেন

—আজগুবি খেয়াল না হলে হীরাজুলিব ব্যাপাবে হাত দেয় বদরিকা ? তা ভাল, আজগুবি ব্যাপারের জল সেদিন কতদূব গড়িয়েছিল মিস্টার চ্যাটার্জি ?

আমাকেও এক অর্থহীন খেয়ালে পেয়ে বসল, আর সেই থেকেই স্মুরু হল আর এক কাহিনীর।

শীতকালের আকাশে মেঘের সমাবেশ সেদিন। এলোমেলো মেঘগুলো হাওয়ার ঠেলায় উত্তব আকাশে জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে।

গাড়ীতে বসে বিদ্যুতেব চমক দেখা গেল কবার ; বৃষ্টি স্মুরু হবাব আগেই স্ট্রাণ্ড বোডেব আপিসে পৌঁছতে হবে, কোচম্যান তাই দ্রুত গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছে—পথে বৃষ্টি আবম্ভ হলে শীতে ওদের কষ্টেব সীমা থাকবে না আর। এদিকে আমাবও কাজে তাড়া আছে। বেলা চারটের আগেই সোলেমান হোসেনের আসার কথা ; নতুন করে চামড়ার রপ্তানি চুক্তি সই-সাবুদ সেরে মাল চালান পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে, বিদেশ থেকে মালেব জন্যে তাগাদা আসতে স্মুরু করেছে। তাছাড়া সোলেমানেব সংগে কিছু জরুরী পরামর্শও ছিল ; এই গেল একদিক—অপব দিকে টেবিল ভরতি কাজ। তার চাপও আছে যেমন তাগিদও আছে প্রচুব !

বদরিকাও গাড়ীতে বসেছিল। কোন কথাবার্তা নেই হঠাৎ চীৎকার করে সে কোচম্যানকে বললে

—গাড়ী থামাও।

লাগাম টেনে মাঝ পথে গাড়ী দাঁড় করালে কোচম্যান। আকাশে

তখন মেঘ আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে। বদরিকা আমার পিঠে ঠেলা দিয়ে বললে

—নেমে আসুন চ্যাটার্জি সাহেব—আপনাকেই যে দরকার আমার।

অবাক হলাম তার রকম দেখে, জিজ্ঞেস করলাম

—ব্যাপার কি ?

বদরিকা ব্যস্ত হয়ে বললে

—ভারি জরুরী দরকার আছে মিস্টার চ্যাটার্জি।

আমি বললাম

—দরকারটা কার ?

বদরিকা তেমনি ভাবেই তাড়া দিয়ে বললে

—নেমে আসুন, দরকার দুজনেরই।

প্রতিবাদ করে আমি বললাম

—গাড়ী নিয়েই চল তাহলে।

সে নির্বিকার ভাবে বললে

—মোটেই দরকার নেই গাড়ীর। ওদের এখুনি ছুটি করে দিন না কেন !

তার কথায় খটকা লাগলো মনে—আর সেই সংগে মনে পড়ল সোলেমানের নতুন রপ্তানি চুক্তির কথা ; আমি বললাম

—কিন্তু আপিসের কাজ বাকী—

কথা শেষ করতে না দিয়ে বদরিকা বললে

—সারা জীবন ধরেই তো কাজ করবেন ! আমরা বরং ওদিক থেকেই ফিরে যাব, আর দরকার নেই গাড়ীর।

সত্যিই যাদু জানে বদরিকা ! কি এমন জরুরী কাজ যাতে গাড়ীর দরকার করে না—সে কথা না জেনেই গাড়ী ছেড়ে দিলাম। কেন এ কাজ করলাম ? শুধু তার চোখের অনুশাসনেই ! না, তাও ঠিক নয় ; একটা ভ্রূক্ষেপহীন স্বেচ্ছাচারী মানুষ, যার সারা মন আজগুবি খেয়ালে ভরা তার প্রতি কৌতূহলই বোধ হয় আমাকে টেনে নিয়ে চলেছিল সেদিন !

মেহেবুব আলি জিজ্ঞেস করলেন

—জবাব মিলেছিল সেই কৌতূহলের ?

গলায় জোর দিয়ে আমি বললাম

—নিশ্চয়ই, বিলকুল নতুন ধরণেব জবাব জুটে গেল সেদিন ; সচরাচর ঘটেনা এমন আজগুবি ব্যাপার…বদবিকার নিয়ম কানুনই যে আলাদা !

মেহেবুব আলি গাঝাড়া দিয়ে বসলেন। আকারে ইংগিতে মনে হল, তিনি যেন বলতে চান—আর মিছে দেবী কেন বাপু ; বদরিকার সেই নতুন ধরণের কাণ্ডকারখানার ফিরিস্তি শোনার অপেক্ষায় বসে আছি ! ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলিয়ে তিনি নিজের কৌতূহলকে নির্বিকারতার পোষাকেব আড়ালে চাপা দিয়ে বললেন

—তাহলে সেই জরুরী কাজের ফলটা কি রকম দাঁড়াল মিস্টাব চ্যাটার্জি ?

মনে মনে বিরক্ত হলাম তাঁর কথায়। জীবনের সবটুকুই মেহেবুব আলি ফলাফলের মাপে মেপে নিতে চান ; কিন্তু তা তো হয় না, কত শত ফাঁক আছে এই জীবনকে ঘিরে ! এখানে সাচ্চা আছে, ঝুঠো আছে—আশা আছে, নিরাশা আছে ; নানা মিলে আর গরমিলে মিশে এক আশ্চর্য অমৃতগরলের জীবন আমাদের ! হালকা বিদ্রূপেব স্বরে তাই বললাম

—ফলাফলের তোয়াক্কা করে না বদরিকা, সে প্রয়োজনও নেই তার কোনো কালে ; যা ঘটল সেদিন তাকে সে অস্বীকার করলে না, আর যা ঘটল না তা পায়ে ঠেলে চলে এল।

সটকার কলকে পালটে দিয়ে গেল চাকর ; মেহেবুব আলি টান দিলেন সটকায়।

বদরিকা আমার ভাবান্তর বুঝে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে

—তক্‌দির যাচাই করেছেন কখনো চ্যাটার্জি সাহেব ?

অদ্ভুত প্রশ্ন তার! বর্ষণোন্মুখ আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে এ ধরণের প্রশ্ন এক বদরিকাই করতে পারে; আমি বললাম

—না, ভাগ্যটাগ্য যাচাই করিনি বদরিকা।

বদরিকা সত্যি বিস্মিত হল আমার জবাব শুনে; সে ভ্রূ কুঁচকে বিস্ময়-মেশা সুরে বললে

—বলেন কি আপনি? মানুষ যে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সৃষ্টির আদি অনাদি কাল থেকে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল; আবার এরই দৌলতে একজন কল্পবৃক্ষ থেকে দুহাতে দেদাব মজা লুটে নিচ্ছে; আবাব দেখুন—কেউবা খানা ডোবায় পড়েই জীবনটা কাটিয়ে দিলে! এ কথা অস্বীকাব কবতে পাবেন আপনি ··আপনি কেন, কেউ কি কোনো কালে অস্বীকার করতে পেবেছে, না পারবে? একটু চোখ মেলে দেখলেই বুঝবেন—এই ভাগ্যই চতুর্দিকে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে; মানুষেব মুখের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে আছে এই ভাগ্য—যাচাই করে তুলে না নিলে কোনো মূল্যই নেই—সেই অপেক্ষায় পড়ে আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাগ্য আমাদের!

কথা শেষ করে বদরিকা এক বুক তৃপ্তির নিঃশ্বাস টেনে কিছুক্ষণ চুপবরে বইল, তাব পবে বললে

—ভেবে দেখুন একবাব ব্যাপার কি সাংঘাতিক রকমের গূঢ় আব গভীর!

নিষ্পলকে আমি এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম বদরিকার মুখে, এবার বললাম

—সেকথা ঠিক; অস্বীকার করার কোনো পথই নেই বদরিকা!

সে খুশী হল। খুশী হবারই কথা—জুয়াড়ী মানুষ ভাগ্যকে অস্বীকার করলে জীবনের অবলম্বনই হারিয়ে ফেলবে যে!

উৎসাহ পেয়ে সে বললে

—এই জন্যেই তো এক জোটে ভাগ্য যাচাই করতে চাই চ্যাটার্জি সাহেব! ইচ্ছে হলে আপনি অবশ্য আলাদা বিচার করিয়ে নিতে পারেন, আমার কিন্তু জুটির বিচার চাই। এই যে আপনার সংগে

জড়িয়ে পড়েছি—এরও তো একটা আখের আছে···একটু যাচাই করে নিলে ক্ষতি কি, কি বলেন আপনি ?

তাকে খুশী করার জন্যেই বলতে হল

—নিছক খাঁটি কথাই বলেছ, ভাগ্য নিয়েই তো খেলা আমাদের; সেই ভাগ্যের চাল চলন, গতিবিধি যদি আঁচ করে নিতে পার—দুনিয়াকেই তো বশ করে নেব! ভাল জ্যোতিষি টোতিষী আছে তোমার জানা ?

উৎসাহে ডগমগ করে উঠল বদরিকা, বললে

—ভাল! বলেন কি আপনি ?

তার চোখেমুখে বিস্ময় ধরে না আর; সে খুশী হয়ে বললে

—এতটুকু ভুলচুক পাবেন না এঁর কথায় চ্যাটার্জি সাহেব! একেবারে নিক্তিতে তৌল করা কথা, বাছাই করা মাল; গলদ-টলদ ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনা! বিলকুল ঠিক....আগাগোড়া মিলে যাবে—তা আগে থেকেই বলে দিলাম আপনাকে।

—তা না হয় দিলে; কিন্তু তার আগে যে জানতে হয় আর এক কথা।

ভ্রূ কুঁচকে বদরিকা জিজ্ঞেস করলে

—কি কথা আবার ?

আমি বললাম

—ভাগ্য যাচাই করার জন্যে হঠাৎ গাড়ী ছেড়ে দেবার দরকার হল কেন ?

বিব্রত হয়ে সে খানিক চুপ করে রইল, তার পরে বললে

—গেলেই বুঝতে পারবেন; এসেও পড়েছি আমরা। সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে উঠে আসুন এবার!

বদরিকাই পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল।

দোতালা বাড়ী, সিঁড়ি শেষ হয়েছে দোতালায় এসে। সামনেই সরু বারান্দা। বারান্দার বাঁ পাশে একটা ছোট ঘর। বদরিকা সেই ঘরে ঢুকল।

স্বাস্থ্যবান এক হিন্দুস্থানী দরওয়ান ঘরের মেঝেয় বসে সিদ্ধি জাতীয় কোন ভেষজ পানীয় তৈরী করতে ব্যস্ত; বদরিকাকে দেখে হাতের কাজ সরিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করলে।

অন্দরের দিকে চোখের ইশারা করে বদরিকা জিজ্ঞেস করলে

—হাজির হ্যায়?

দরওয়ান ঘাড় নেড়ে বললে

—হুজুর!

সপ্রতিভ গলায় বদরিকা বললে

—সেলাম জানাও, বল উপাধ্যায়জী তস্‌রিফ এনেছেন।

দরওয়ান সংবাদ নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

সব ব্যাপারেই বদরিকার এক তোয়াক্কাহীন ভাব, কোনো জড়তা নেই—আদিখ্যেতাও নেই; কিছুই ধৈর্য ধরে তলিয়ে দেখার দরকার করেনা—সে সময়ও নেই তার! মুখে কেমন এক ব্যস্ত-সমস্ত ভাব লেগে আছে, যেন কাজেরও শেষ নেই আর তা শেষ করার ফুরসৎও নেই তার হাতে।

আমার মনে কিন্তু ভাবনা ধরেছে, হেলা-ফেলা করে কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে; তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম

—এঁর পার্বনী কত বদরিকা?

এক গাল হেসে সে বললে

—দিলে লাখ, না দিলে কানাকড়িও নয়!

মাথায় এক ঝলক রক্ত ছুটে গেল। এ আবার একটা কথা নাকি! ধর্তব্যের মধ্যেই নিতে পারেনা মানুষে। বদরিকা কিন্তু একবারে নিরাসক্ত, হালকা হাওয়ায় ফিঙে পাখির চটুল ভংগীতে উড়ে বেড়ানর কেরামতি তার হাবে ভাবে। তার মেজাজও ভারি খুশী খুশী হয়ে উঠেছে। চাপা গলায় গজলি ঢঙের সুর ভাঁজতে আরম্ভ করেছে সে। এই এক মারাত্মক দোষ তার; কখনও সোজা কথা কয়না, যদিও বলে কখনও—তাও নেহাত হালকা, আর তার পর মুহূর্তেই মুখের ভাব এমন পালটে যায় যে, কিছু আগে

এই মানুষটাই কোনো হালকা মন্তব্য করেছে তা বিশ্বাস করাই শক্ত !

এ অবস্থায় কার না মেজাজ তেতো হয়ে ওঠে ? ফাঁকি দিয়ে ভাগ্য যাচাই করার প্রশ্নকে মনে ঠাঁই দেওয়াই যায়না। আর ঠিক সেই -মুহূর্তে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তার সামনে নোটকেস থেকে টাকা গোনা—তাও তো রুচিবিরুদ্ধ ! অতএব মনে মনে হিসেব করে নিতে হল তহবিলে ছিল বা কত, তা থেকে খরচই বা হয়েছে কি ; আর উদ্‌বৃত্তই বা পড়ে আছে কতটুকু ! নিজের চাল বজায় রাখতে গিয়ে কতগুলো টাকা দমকা ফেলে দিতে পারি এক সাথে।

বিপদের ওপর বিপদ ! হিসেব শেষ হওয়াব আগেই দরওয়ান ফিবে এল ; সম্ভ্রম আর গাম্ভীর্য মেশা গলায় সে বললে

—অন্দর যাইয়ে হুজুর লোক ; বাঁয়ে চৌঠা নম্বর দরওয়াজা হুজুব।

বদবিকা খুশী হয়ে তার হাতে কি যেন গুঁজে দিয়ে বললে

—বেশখ্ ; বহুত ঠিক হ্যায় !

বদবিকার এক সস্তা প্যাঁচেই সেলামের বহব এবার অনেক লম্বা হল দবওয়ানের। ছোট ঘর পেরিয়ে টানা বারান্দা। তার ডানদিকে লোহাব রেলিং বসান আর বাঁয়ে একের পর এক দরজা এগিয়ে গেছে—তাতে বঙবেরঙের ঝালরদারি পরদা ঝোলান ; বেশ ছিম্‌ছাম্ কেতা দুরস্ত ভাব। গুনগুন করে তখনও সুর ভেঁজে চলেছে বদরিকা ; আমাকে যে তার সংগে এনেছে—সে খেয়ালও নেই তার ! হাবভাব লক্ষ্য করে তাকে বললাম

—কি হে, তোমাকে গানে পেয়ে বসল নাকি বদরিকা ? মেজাজ খুশী খুশী....ব্যাপার কি হে ?

হাসতে হাসতে বদরিকা বললে

—দেখছেন না কি অবস্থা আকাশের ! এখুনি ওই কালো কালো মেঘগুলো গলতে সুরু করবে—মেঘের বুক মুচড়ে উঠেছে তাই,

শব্দের গর্জনে সারা আকাশ কেঁপে উঠল—শুনতে পেলেন না?
আমার বুকেও মোচড় দিয়েছে তাই!

ব্যংগ করে আমি বললাম

—খোঁচা-খাওয়া মনে তাই বুঝি ভাগ্য যাচায়ের খেয়াল হল তোমার?

খানিকটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বদরিকা বললে

—ঠিক তা নয়; হঠাৎ মন মুচড়ে দেওয়া এক উর্দু বয়াৎ মনে পড়ে গেল চ্যাটার্জি সাহেব! এধরণের প্রাণমাতান কাব্য সুরের আরাধনা করেনা, সুরই এগিয়ে আসে এর কাছে; সেই কথাগুলোই আওড়ে নিচ্ছিলাম মনে মনে—হুকুম পেলে আপনাকেও শুনিয়ে দিতে পারি, কি বলেন?

যেটুকু সংকোচ ছিল নিজেই মুছে দিলে বদরিকা। আমার মতা-মতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ও নেই তার! কাল বিলম্ব না করে সে তার চাঁচাছোলা গলায় আরম্ভ করে দিলে

দিল্ তো মচল্‌তা হ্যায় হর্‌দম্
পর্ হদ্‌সে জেয়াদা যব্ মচ্‌লা—

বাইরের সেই অপরিসর ঘর থেকে দরওয়ান আমাদের হুঁশিয়ার করে বললে

—বাঁয়ে চৌঠা নম্বর দরওয়াজা হুজুর।

আর সেই চৌঠো নম্বরের দরজা আঁটা ঘর থেকে সংগে সংগে কে যেন বলে উঠল

—কার জন্যে তোমার মন মুচড়ে উঠল বাদশা?

বদরিকা হো হো করে হেসে বললে

—তোমারই জন্যে উসমানি বিবিজান—তোমারই জন্যে! দিল্‌জানি বাইরে এস একবার, দেখে যাও আকাশেরও মন মুচড়ে উঠেছে আজ···বরষা আয়িরে সজনী, আয়িরে—

থমকে দাঁড়ালাম। এ কোথায় নিয়ে এল বদরিকা? রূঢ় চোখে তার দিকে তাকালাম—চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করতে চাইলাম কিন্তু

আমার গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। বদরিকা কাছে এগিয়ে এসে মিঠে গলায় বললে

—কি হল মহারাজ?

মহারাজ! নতুন নামে এই প্রথম সম্ভাষন তার। সে কানের কাছে মুখ এনে খাটো গলায় বললে

--কোনো ভয় নেই। কোন ভাবনাও নেই মহারাজ—ছ্যাচড়ামোর ধারে কাছেও পাবেন না বদরিকাকে, নির্ভয়ে চলে আসুন আপনি।

উসমানিও দরজার কাছে উঠে এসেছে ততক্ষণে; ঝালরদারি পরদার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি বাইরে এসে পড়েছে তার। আমারও চোখ কোন অতর্কিতে গিয়ে পড়েছে শান দেওয়া তার জ্বলজ্বলে চোখের ওপরে, সে দৃষ্টি নিমেষে যেন মনের তলা পর্যন্ত ছুঁয়ে দিলে। চটুল হেসে সে ঝালরদারি পরদা ঠেলে বারান্দায় বেরিয়ে এল; হাসিতে সুরের নানা তরংগ তুলে বললে

—এ কোন চিড়িয়া ধরে আনলে বাদশা? এর চোখে পলক নেই কেন· 'পল না লাগে মোরা আঁখিয়া পিয়া বিনু'

স্বতঃস্ফুর্ত স্বর উসমানির, কোন জড়তা নেই, কোন আড়ম্বর নেই--গান স্বেচ্ছায় রূপ আদায় করে নিলে তার গলা থেকে। গানের ফাঁকে তার ধারাল চোখদুটো আমার চোখে এসে পড়ল আবার; আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম তখনও সে জিজ্ঞেস করছে—এ কোন চিড়িয়া ধরে আনলে বাদশা, এর চোখে পলক পড়ে না কেন?

মেহেবুব আলি উত্তেজিত হয়ে চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন। সটকার নল মুখের কাছ থেকে সরিয়ে কড়া গলায় তিনি বললেন

— বদ্‌তমিজ! কোনো লজ্জা-সরম নেই লোকটার? আপনাকে কোনো কিছু না বলে কয়ে একটা নাচউলির বাড়ীতে ওঠালে শেষ কালে? ব্যাটা জাত ছোট লোক!

কি যেন ভাবলেন তিনি অল্পকাল, তাব পরে বললেন

—ওকে ঠাণ্ডা কবে দেব আমি মিস্টাব চ্যাটার্জি! আল্লা আমারই হাতে ওব শাস্তি বিধানেব ভাব দিয়েছেন। হীবাজুলিব জাল থেকে হয়তো একদিন বদরিকা ছাড়া পেতেও পারে, কিন্তু আমাব হাত থেকে নিস্তাব নেই ওব।

তিনি আবার খানিক চুপ কবে বইলেন; রাগের উত্তাপ কিছু কমে এলে নবম গলায় বললেন

—আপনাকে দোষ দিইনে আমি। কিন্তু ওব দুঃসাহসেব কথা ভেবে আমাব সাবা দেহে আগুন ধবে যাচ্ছে!

অনুমান করলাম রাগ তখনও সম্পূর্ণ পড়েনি মেহেবুব আলির; প্রতিবাদ মূলক কোনো কিছু বলাই এ সময় অনর্থক—তাতে বাক-বিতণ্ডাই বাড়বে; তাই জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম তাঁব দিকে।

কিন্তু ফল হল বিপবীত; আমাব অসহায় ভাব দেখে তিনি আবার তেতে উঠে বললেন

—ছল চাতুবী দিয়ে এই মামলায় আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছে বদবিকা—এতে ভুল নেই; কিন্তু কাব চোখে সে ধুলো দিতে চায়? আমি হলপ কবে বলতে পাবি—মতলব ছাড়া কোনো কাজ কবেনা মানুষ। উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন একাজ কবেছিল বদরিকা।

তাব পবে সটকায় টান দিয়ে তিনি সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন

—কি মনে হয় আপনার?

আমি বললাম

—ঠিকই বলেছেন আপনি! এ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াব কোন মাথা ব্যথাই ছিল না আমাব।

এতক্ষণে খুশী হয়ে আমাব দিকে তাকালেন মেহেবুব আলি, বললেন

—সেই কথাই তো বলছি এতক্ষণ ধবে।

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম

—জীবনের বড় বড় ভুলগুলো অপরের বলাবলির মুখচেয়ে বসে থাকেনা, সময় মতই ঘটে যায়—এই আরকি !

মেহেবুব আলির কপালে চিন্তার রেখা ফুটল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন

—মানে ?

তাঁকে খামকা উত্তেজিত করিয়ে লাভ নেই, তাই সংকোচ জড়ান গলায় বললাম

—নিজের অজ্ঞাতে এমনিই একটা ভুল ঘটেছিল সেদিন। বদরিকারও কোনো মাথা ব্যথা ছিলনা মামলার জালে আমাকে জড়িয়ে ফেলার।

মেহেবুব আলির মনের গঠন আলাদা ধরণের, তিনি প্রতিবাদ সহ্য করতে একেবারে নারাজ ; বিস্মিত হয়ে ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন আর সেই সংগে যেন একজোটে রাজ্যের চিন্তা তাঁর মনে হানা দিলে। গোড়ায় তিনি চঞ্চল হলেন, তার পরে বিব্রত হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন ; আনমনেই একসময় বললেন

—কি বলতে চান তাহলে ?

ঘরের ভারী আবহাওয়া হালকা করার জন্যে আমি বললাম

—দেখলেন তো কাণ্ড আমার ?

—কি কাণ্ড ?

—কিছু না জেনে, না জিজ্ঞেস করেই গাড়ী ছেড়ে দিলাম সেদিন ; আগাগোড়া না ভেবে, না বুঝে দুম করে একটা কিছু বাধিয়ে ফেলা—এ যেন হাড়ে মজ্জায় সেঁধিয়ে গেছে।

মনে হল আমার কথাগুলো তাঁর কানেও যায়নি, তিনি নিজের বিব্রত চিন্তারাজ্যে ঢুকে পড়ে হঠাৎ যেন খেই খুঁজে পাচ্ছেন না ; তাঁর উক্তিতেই সে কথা জানা গেল ; তিনি বললেন

—কোরাণের মতে ভাগ্য যাচাই নিষিদ্ধ—তা জানেন তো ?

আমি বললাম

—শুনেছি সে কথা।

তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন

—তাই ভালই করেছিলেন সেদিন। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মালিক আল্লা; পৃথিবীর সমস্ত মানুষ পশু পাখি জীবজন্তুর ভাগ্য তো তাঁরই হাতে যথাযথ পরিণতির অপেক্ষা করে থাকে; সব কিছুই তিনি চালিয়ে নিয়ে চলেছেন—ভবিষ্যৎকে নিয়েই ভাগ্য। ভবিষ্যতের এলাকায় কোনো এক্তার নেই মানুষের। অনাগতকে বর্তমানে টেনে আনা তো একমাত্র আল্লারই কাজ—তাঁর কাজে হাত দেওয়া যে মূঢ়তা—তাই কোনো ধর্মমতই তা মঞ্জুর করেনা। এ সত্য আপনি নিশ্চয় মানেন।

সংকোচের সংগে বললাম

—মানি বৈ কি···তবে কি না—

আমার কথা শেষ হবার আগেই মেহেবুব আলির আত্মবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তিনি বললেন

—মিস্টার চ্যাটার্জি দ্বিমতের কোনো স্থান নেই এখানে!

মনে মনে তিনি দৃঢ় আর সজাগ হয়ে উঠেছেন, অন্যমনস্কতার কোনো ছাপ নেই তাঁর চোখে; কিন্তু আদত কথাই তিনি বুঝতে নারাজ!

আবার সংকোচ মেশান দৃষ্টিতে আমি চাইলাম তাঁর দিকে; তিনি জিজ্ঞেস করলেন

—কি হল আবার মিস্টার চ্যাটার্জি?

আমি বললাম

—গোড়াতেই যে গলদ থেকে গেছে।

তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন

—কার গলদ! আমার নাকি?

আমি জবাব দিলাম

—না, গলদটা আমারই; রেহাই পাইনি সেদিন—উসমানির দোর গোড়া থেকেই রেহাই হয় নি আমার।

নিমেষের মধ্যে ঔৎসুক্য ফিরে এল, মেহেবুব আলি গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন

তাই নাকি? কি বলেন আপনি! কি বললে, কি করলে বদরিকা তার পরে?

উসমানির দিকে একদৃষ্টে অনেক্ষণ তাকিয়ে থেকে বদরিকা বললে

—তোমাব গলায় যাদু আছে বিবিজান!

উসমানিও খুশী হয়ে বদরিকার দিকে তাকালে। তার পরে মাথা নীচু করে সে তাব ডান হাতের তালু কপালের ওপর রাখলে; গোছা গোছা বেলোয়ারী চুড়ি তার হাতে—সেগুলো শব্দ করে তার কনুয়ের কাছে নেমে এল। সে বিনীত গলায় বললে

—আল্লা মেহেরবান!

কালো মেঘগুলো সত্যিই গলতে সুরু করলে আকাশে; বড় বড় জলেব ফোঁটা হাওয়ার তাড়ায় ঝাঁক বেঁধে ছুটে এল সেই সরু বারান্দায়—চাবিদিক তখন কালো হয়ে উঠেছে।

উসমানি আবেদন ভরা চোখে তাকাল আমাব মুখে—মিনতি যেন কথা কয়ে উঠল দুই চোখে তাব; সে বললে

—ভেতরে আসবেন না রাজা!

রাজা বাদশা নিযে কারবাব উসমানিব তাব সহজ আহ্বানে সেই কথাই বললে সে। দরজাব ঝালবদাবি পরদা একহাতে তুলে সে অনুরোধ জানালে—সেই ফাঁকে তার ঘরেব কিছু অংশ দেখা গেল। উসমানির ঘরও অতিথিদের ডাক দেয়, যেন বলে—তোমার জন্যেই তো এত সাজগোজ আমার!

এ আহ্বান কি কেউ উপেক্ষা করতে পাবে কোনো কালে? বদরিকার সংগে তাই তার ঘরে এলাম।

ঠিকই বলেছে বদরিকা; ভাগ্য চারিদিকে হেলায় ছড়িয়ে পড়ে আছে—আমাদের তুলে নেওয়ারই অপেক্ষায়; আমরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাগ্যকে তুলে নিলেই তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে!

চঞ্চল হয়ে বদরিকা ভাগ্যকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে এতকাল—তাই তার জীবনে এত অতৃপ্তি, এত অসহিষ্ণু সে। ভবিষ্যতের বেড়া

ডিঙিয়ে সে উসমানির ঘরে এই দুর্যোগের দিনে তাই ছুটে এসেছে, তার জ্বলজ্বলে চোখের আলোতেই নিজের ভাগ্যকে খুঁজে নেবে বোধ হয়!

আর সুসানা?

সুসানাও যে তার ভাগ্যকেই খুঁজে বেড়িয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে; বহুকাল কোনো সন্ধান মেলেনি, কোনো হদিস পায়নি তার ভাগ্যের, সে সুযোগ তার জীবনেও এল—তার সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মনে হঠাৎ দোলা লাগল। সে নিজেই অকুন্ঠিত মনে একথা স্বীকার করে আর বলে

—জীবনে অনেক রহস্যময় দরজা আছে; কখনো কখনো তারই এক একটা খুলে যায়। তখন নতুন পরিবেশের আলোতে নিজেদের দেখতে পাই আমরা। জানো অমিতাভ, অনেক সময় আমাব মনে হয় ভাগ্য এই রহস্যময় দরজার কিনারায় অপেক্ষা করে থাকে।

আমি রহস্য করেই তাকে জিজ্ঞেস কবি

—তাই নাকি? সে কথা কিন্তু আমার জানা হয়নি এখনও; দেখি আমাব বরাতে সে রহস্যের কপাট খোলে কি না!

হালকা এই বিদ্রুপ কিন্তু তাকে স্পর্শ কবে না, সে নিজের চিন্তার জের টেনে বলে

—মনে পড়েনা তোমার সেদিন ঠিক এই রকম একটা দরজা হঠাৎ খুলে গেল, তাই তোমার দেখা পেলাম। আমার ভাগ্যই যে সেদিন অপেক্ষা করে ছিল আমার জন্যে!

হাসতে হাসতে আমি বললাম

—দরজা আবার জোটালে কোথা থেকে! স্টীমারের সিঁড়ি বেয়ে আমি তো সোজা ওপরে এসে দেখলাম তুমি দাঁড়িয়ে আছ ডেকের রেলিং ধরে, তাই না?

তন্ন তন্ন করে আমাকে তার যেন জানা হয়ে গেছে, এ সব কথায় তাই সে কান দেয় না—চোখ দুটো আধবোজা করে নিজের খেয়ালেই বলে যায়

—তুমিও কিন্তু এ কথা অস্বীকার করতে পার না অমিতাভ।

আমি বলি

—ভালো আপদ! অস্বীকার করতে যাব কোন দুঃখে? তোমার দেখা পেলাম বলেই না নিজের ভাঙা নৌকোয় জোড়াতালি দিয়ে জীবনের এতখানি পথ পাড়ি দিতে পেরেছি।

সে আর কথা কয় না, চোখ বুজে স্থির হয়ে থাকে। আমি কিন্তু ঠিক ধরতে পারি যে সে ধর্মের জটিল সূত্রগুলো নীরবে আবৃত্তি কবে নিচ্ছে—তার জীবন দর্শনের সংগে ধর্মের পুঁথি যেন এক হয়ে গেছে, ওই পুঁথির পাতা থেকেই সে জীবনের সব জিজ্ঞাসার সমাধা খুঁজে পায়।

আমাকেও বলে অনেক সময়

—এতে ভুল থাকতে পারে না, ঈশ্বরের বাণীই তো এ পুঁথিতে লেখা আছে!

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি, তার দৃঢ়তা দেখে মুখে কথা সরে না, বিরক্তিও ধরে অনেক সময়। সেই সংগে কখনো আবার আমাদের প্রথম আলাপের ঘটনাগুলো মনের ওপরে লঘু-চাঞ্চল্যে বয়ে যায়। তারই একটা ছোট টুকরোকে কেন্দ্র করে অতীতের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই; যেন এক ফুৎকারে মনের অনেক আবর্জনা উড়ে যায়—তখন মনে হয়, সুসানা ঠিক তেমনি ভাবেই স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। মুক্ত আকাশের উচ্ছৃঙ্খল হাওয়া হু হু করে ডেকের ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করছে; দুই পাশে ব্রহ্মপুত্রের গতিশীল জলরাশি ছড়িয়ে আছে—দূরে আকাশের কিনারা-ছোঁয়া নীলাভ বন-রেখা দেখা যায়; আর মাথার ওপরে আছে আকাশের নীরব গম্বুজ। সব কিছুকেই যেন এক আকর্ষনে জড়িয়ে স্টীমার ব্রহ্মপুত্রের স্রোত কেটে এগিয়ে চলেছে, আবর্তমান এই গতির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে সুসানা ওমেরান।

আর উসমানি?

সে ও বোধ হয় জীবনের রহস্যময় দরজায় ঝোলান বাহারে পরদা সরিয়ে হঠাৎ সামনে এল, তার পরে জিজ্ঞেস করলে—কি হল তোমার, চোখে পলক পড়ে না কেন?

পরদার ফাঁকে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার সেই ঘরের ভেতরে; যে ঘরে ভাগ্যের পাশা পাতা আছে, যেখানে পরমুখাপেক্ষী ভাগ্য ইতস্তত ছড়ান থাকে, যার সন্ধানেই চিরকাল দিশাহারা হয়ে মানুষ ঘুরে মরেছে ··এই তো সেই আসবাবহীন ঘর উসমানির, কোণ ঘেঁষে জাজিমের ফরাশের ওপরে দামী গালচে পাতা, ভেলভেটের কতকগুলো তাকিয়া রাখা আছে সেই ফরাশে।

কিছুমাত্র জড়তা নেই কিন্তু বদরিকার; সে ফরাশে বসে একটা তাকিয়া টেনে নিলে, তার পরে উসমানির দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললে

—দ্বিধা করবার কিছু নেই এখানে। এখুনি ছক পাতিয়ে নিচ্ছি, আপনি এদিকটায় চলে আসুন মহারাজ।

আমার দিকে একটা তাকিয়া এগিয়ে দিয়ে উসমানিকে সে বললে

—কেমন আছ বিবিজান? অনেক দিন খবর নেওয়া হয়নি তোমাদের! সব ভাল তো? ফতিমা বেহেন গেল কোথায়? ওই পিকদানি আর আলবোলাটা সরিয়ে নিয়ে যাক না কেউ—ঘরের ভোল পালটে যাবে তাতে, কি বলেন চ্যাটার্জি সাহেব?

অন্দরের দিকে তাকিয়ে ফতিমাকে ডাক দিলে উসমানি, তার পরে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে

—এই আমার গরীবখানা রাজা! কষ্ট হলেও কিছু সময় কাটাতে হবে আপনাকে।

উসমানির কথায় আর ঝাঁঝ ছিল না, ভাষা অনেক নরম হয়ে এসেছে। আমার হয়ে বদরিকাই কিন্তু জবাব দিলে তার কথার

—ঠিক বলেছ উসমানি, খানিকটা সময় কাটাতেই এসেছেন উনি!

তার পরে আমার দিকে ফিরে সে আবার বললে

—আপনার গলাটা বসা বসা ঠেকছে বুঝি মহারাজ! ছাতি শুকিয়ে গেছে—জল আনতে বলি?

বদরিকার অনুমান মিথ্যে নয়, অস্বস্তিতে আমার গলা ধরে এসে ছিল, বললাম

—আপত্তি নেই।

অন্দর থেকে ফতিমা বেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে, বদরিকা তাকে বললে

—জল আনতে হয় যে বেহেনজী, একটু কষ্ট কর, বদরিকার জন্যে!

আমাকে নিয়ে বদরিকা মনে মনে যেন আমার চেয়ে বেশী আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে; নিজের বাচালতা দিয়ে তার দুর্বলতাই গোপন করতে চায় সে। উসমানি ফরাশের একধারে নিজের জায়গা করে নিয়েছে ততক্ষণে। তার গানেও বাচালতা ফুটে উঠেছিল, তাই এখন নিজেকে অনেক সংযত করে নিজের ভেতরে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। বদরিকার চোখেও তার এ ভাবান্তর এড়ায়নি, তাই বোধ হয় শ্লেষ-মেশা গলায় সে বললে

—জলের পিয়াস তো মিটল পিয়ারী কিন্তু তোমার চোখের পিয়াসা মেটে কই! এ হল কি? তোমার চোখেও যে পলক নেই দিলজানি! মহারাজের মুখে তুমি কোন বাদশার দৌলত খুঁজে পেলে?

বদরিকার নির্লজ্জ শ্লেষে উসমানির মুখ রাঙা হয়ে উঠল, সে চোখে কপট ভ্রূকুটি টেনে বললে

—তোমার দিল্ মোটেই সাফ নয় বাদশা, অনেক ময়লা আছে তোমার মনে।

তার চোখ থেকে ভ্রূকুটি তখনও মেলায়নি, সে তর্জনী তুলে

শাসনের ভংগীতে কি যেন বলতে গেল বদরিকাকে, কিন্তু হঠাৎ সুর ঝরে পড়ল তার গলা থেকে, সে গাইলে

ভরি গাগরি মোরি
ধর কাহে ছয়্‌লা,
রাখতু হ্যায় কছু
মনমে ময়লা।
ভরি গাগরি মোরি···

বদবিকা হৃষ্ট মনে উসমানিব দিকে তাকিয়ে বইল, যেন বহু কাল পবে সে উসমানিকে দেখছে, বহুকাল তার মধুক্ষরা গান শোনে নি—ভাগ্য প্রসন্ন হওয়ায় সে সুযোগ হঠাৎ জুটে গেছে আজ। সে নিজেই যেন শ্যামসুন্দবের মত কলস ভরে নিতে বাধ সেধেছে উসমানিকে। ছল কবে সে তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, তাব পরে কোনো এক উদ্বেল মুহূর্তে নিজেই উসমানির বাহুবল্লরী ধরে তাকে অনুনয় করে বলেছে—এত তাড়াতাড়ি চলে যেওনা সজনি, আমাব চোখ যে এখনও তৃষাতুর!

বাইরে তখন এলোমেলো হাওয়ার সাথে বৃষ্টির মিতালি সুরু হয়েছে; হাওয়ার ঠেলায় ঝালরদারি পরদা নৌকোর পালের মত ফুলে উঠল। ফতিমা তাই উঠে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

বৃষ্টির প্রবল ধারায় হয়তো বাইরের জগতের সমস্ত সঞ্চিত আবর্জনা ধুয়ে যাবে কিন্তু বদরিকার মনেব ময়লা কোনো দিন পরিষ্কার হবে কি?

উসমানি তখনও গাইছে

রাখতু হ্যায় কছু
মনমে ময়লা···

আবর্জনা-ভরা মনে কিন্তু কোনো বিকার নেই বদরিকার; সে মাথা ছুলিয়ে এক মনে গানের তাল গুনে চলেছে।

স্টীমারের ডেকে দরজা নেই যে খিল এঁটে হাওয়ার ঝাপটা বন্ধ

করা যাবে। ডেকের লাগোয়া কেবিন আছে বটে কিন্তু ভরা সন্ধ্যায় কেউ কেবিনে ঢুকে দরজা এঁটে বসেনা, তাই এলোমেলো হাওয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে ডেকের রেলিং ধরে সুসানা দাঁড়িয়ে ছিল।

তার ব্যাগ খোয়া যাওয়ার গণ্ডগোল মিটিয়ে নীচের তলা থেকে ওপরে এলাম। রেলিং এর কাছে আসতেই সে কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে চেয়ে বললে

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আপনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই...

মাপাজোপা ভদ্রতায় গায়ে জ্বালা ধরে—কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম

—ধন্যবাদটা কিন্তু মিস্টার তেয়ানারই প্রাপ্য! পরিচয় তো তিনিই করিয়ে দিয়েছিলেন আপনার সংগে সেদিন তাঁর বাংলোয়, নয়তো ঈশ্বরেরও কোনো হাত ছিল না আমাকে আপনার সাহায্যে লাগাতে।

সুসানা বিব্রত হয়ে অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম কথাগুলো কিছু রূঢ় হয়েছে, তাই পরিস্থিতি লঘু করার জন্যে বললাম

—অদৃষ্টের কেরামতি দেখুন একবার! আপনি কলকাতার মানুষ আমিও তাই, কিন্তু পরিচয় হল আমাদের ডিব্রুগড়ে মিস্টার তেয়ানার বাংলোয়!

আদত কথা থেকে পাশ কাটিয়ে সুসানা বললে

—আপনার সরকারবাবুটি কিন্তু সত্যিই কাজের মানুষ!

আমি বললাম

—এবার সফরে বেরিয়ে নতুন কাজে লাগিয়েছি ওঁকে; শুনলেন তো সেদিন তেয়ানার কাছে, পাটের মোকাম চালু করতেই এদিকে আসা, এ ব্যবসার পাকা লোক উনি, কাজে লাগিয়ে নিলাম তাই।

একটু ইতস্তত করে সুসানা বললে

—আমার ব্যাগটা উদ্ধার করে উনি সত্যিই আমাকে অনেক বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনি কিছু মনে না করলে ওঁকে সামান্য পুরস্কার দিতে ইচ্ছে করি।

হাসতে হাসতে আমি বললাম

—আমার আবার আপত্তি কি? ইচ্ছে হলেই দেবেন।

খুশী হয়ে সুসানা বললে

—তবে ওঁকে ডেকে পাঠাই, কি বলেন?

স্টীমারের বয় এসে বললে চা আনবে কি না। সুসানাকে জিজ্ঞেস করলাম

—বাইরেই চা দিক, কি বলুন?

সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে, তার চোখে কিন্তু বিরাজ বিশ্বাসকে ডাকার প্রশ্ন ফুটে আছে। আমি বললাম

—বিরাজ বিশ্বাসের কথা ভাবছেন বুঝি? বেশ তো আমিনগাঁয়ে পৌঁছেই যা দেবার দেবেন তাকে।

বেতের টেবিল আর তুটো চেয়ার কেবিনের কোণ ঘেঁষে সাজিয়ে রেখে বয় নীচে নেমে গেল চা আনতে। ডেকেব এদিকে হাওয়াব মাতামাতি কম, ওপবে টিনের ছাদ থাকায় হাওয়ার গতি কিছু প্রতিহত হয়েছে; এখান থেকেও বিস্তৃত জলরাশি চোখে পড়ে— ব্রহ্মপুত্রেব খরস্রোত দিকচক্রবাল পর্যন্ত চোখ টেনে নেয়। মনেব অনেক তলা দিয়েও যেন আরো এক স্রোত বইতে সুরু করেছে। তার নীরব কল্লোলে রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বয় চা নিয়ে এল!

সুনিপুণ হাতে সুসানা চা ঢালতে সুরু করলে, তার হাতেব ছোঁয়ায় ও পানীয় হয়তো জীবনের ঊষরতা কিছু মুছে দেবে! কিন্তু পাটের মোকাম চালু করতে এসে এ অবান্তর কথাই বা ভাবি কেন? তাড়াতাড়ি মোকাম চালু হওয়া দরকার, নইলে টাকার ঊষরতাই দেখা দিতে পারে।

ব্যবসায়ের খিদমৎ খাটতেই তো এতদূর আসা। নিজেকে অব্যবসায়ের কথায় জড়িয়ে বিব্রত করি কেন? সুসানার কথা ভেবে এই যে নিজেকে কণ্টকিত করে তুলেছি এর তো কোনো কারণ নেই! কারো গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ খোয়া গিয়েছিল কি না, তা

আমার চিন্তার বিষয় হতেও পাবে না। তাছাড়া সে ব্যাপার তো অনেক আগেই মিটে গেছে। বিবাজ বিশ্বাস ব্যাগ উদ্ধাব করে কৃতিত্ব পেয়েছেন, আমার লোক তিনি, তুচ্ছ এই কারণে আত্মশ্লাঘার প্রশ্রয় দেওয়া নেহাত বাতুলতা। এই তো দিব্যি অন্য কথা ভাবতে পারি, নাবি দরে পাট কিনে ব্যবসার মুনাফা বাড়িয়েছেন বিরাজ বিশ্বাস, একাজে তাঁর কৃতিত্ব আছে; এই পবিচয়টুকুতেই তাঁর যথাযথ পবিচয়। যাচাই কবা দরে তিনি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দাদন দিয়েছেন—সত্যিই এ কাজে মুন্সিয়ানা আছে তাঁর। তা থাকাবই কথা—সা-চৌধুরীদেব নানা মোকামে কাজ কবে পদ্ধতি আব পন্থায় পাকা হয়ে গেছেন তিনি।

আজই কলকাতা থেকে তার এল, পাটেব বাজাব গবম হতে সুরু করেছে কলকাতায়। ফেলা দাদনের মাল ঘবে উঠলেই মুনাফাব মোটা অংক চোখে দেখতে পাওয়া যাবে। আসাম আর পূর্ববংগ সফরে অমিতাভ চাটুয্যের ব্যবসায়ে মুনাফার অংক ফেঁপে উঠে তার আত্মশ্লাঘা বাড়ুক তাতে কোনো ক্ষতি নেই—তবে বিরাজ বিশ্বাসের ব্যাগ উদ্ধাবের ব্যাপার নিয়ে তার গর্ব করাব কিছু নেই।

সুসানা চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলে, পিবিচে দুটুকবো কেক্ও যে দিয়েছে আমাকে! জিজ্ঞেস করলাম

—আপনার কেক্ গেল কোথায়?

সে বললে

—কেক্ পছন্দ করিনে।

তৎবির তদারকের সুযোগ বুঝে বিরাজ বিশ্বাস ওপরে এলেন, জিজ্ঞেস করলেন

—কোনো অসুবিধে নেই তো হুজুর?

দুজনকেই এক সংগে প্রশ্ন করলেন বিরাজ বিশ্বাস, সুসানার দিকে অবশ্য আগেই তাকিয়ে নিয়েছেন তিনি। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে একটুও উদাসীন নন বিরাজ বিশ্বাস—এটাও গুণ বৈকি!

আমি বললাম

—না বিশ্বাস মশাই, কোনো অসুবিধে নেই আমাদের।

খুশী হয়ে তিনি বললেন

—সেই জন্যেই তো বয়কে ওপরে পাঠালাম। জানি চায়ের সময় হয়েছে হুজুরদের, তা ও ব্যাটাদের কি খেয়াল থাকে কিছু ?

সুসানা চাপা গলায় বললে

—সেই কথাটা কি একবার বলবেন ওঁকে ?

—হ্যাঁ ঠিকই তো !

বিরাজ বিশ্বাসের দিকে ফিরে বললাম

—আমিনগাঁওয়ে নেমে মেম সাহেবের সংগে একবার দেখা করবেন আপনি, ওঁর কাছে কিছু ইনাম পাওনা হয়েছে আপনার।

শ্রদ্ধায় সুসানাকে সেলাম জানালেন বিরাজ বিশ্বাস।

সুসানাও তাঁর ব্যবহারে হঠাৎ খুশী হয়ে বললে

—এখনই দিয়ে দিই না কেন ?

আমি বললাম

—তাড়া নেই, তবে ইচ্ছে হলে দিতে পারেন বৈ কি !

চায়ের পেয়ালা সরিয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে গেল কেবিনে। আমি বিরাজ বিশ্বাসকে বললাম

—একটু অপেক্ষা করুন আপনি, কাজটা এখুনি মেটাতে চান মেম সাহেব।

কেবিন থেকে ফিরে সুসানা দুখানা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে আমাকে বললে

—আপনিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন ওঁকে।

নোট দুটো আমি বিরাজ বিশ্বাসকে দিলাম, তিনি কিন্তু তখনও তাঁর চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারেননি।

॥ সাত ॥

সূর্যাস্তের শেষ আলো ঝলমল করে উঠল ব্রহ্মপুত্রের ধারাল স্রোতে। সময়ের গতির সংগে যেন একতালে এগিয়ে চলেছে এই বিপুল জলরাশি, এখন এই দিনান্তের সীমানায় দাঁড়িয়ে যেন স্বীকার করে নিচ্ছি অসীমের তহবিল থেকে আরো একটি দিন খরচ হয়ে গেল।

নিবন্ত দিনের শেষ আলোর ছটা গতিশীল জলের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। সময়ের গতি যে দিনটিকে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলার তোড়-জোড়ে ব্যস্ত, তারই স্বীকৃতিতে নতুন করে ঝলমল করে উঠে ওই গতিশীল জলরাশি যেন বলছে—আমি সব কিছুকেই তো স্বীকার করে নিয়েছি। এখান থেকে বহু বহু যোজন দূরে বরফে ঢাকা এক পাহাড়ের চূড়োকে নিজের স্বীকৃতি জানিয়ে এই দুর্গম পথে পাড়ি দিয়েছি, তাব পরে কত অবণ্য কত জনপদ আকাশ বাতাস প্রান্তর সব কিছুকে স্বীকাব করেই এগিয়ে চলেছি। দুই তটের মাঝে এই যে স্টীমার আমার গতিকে চিরে দিয়ে চলেছে—তারও স্বীকৃতি আছে আমাব ঢেউয়ের মাথায়।

কলোচ্ছ্বাসের ভাষায় জীবনের বীজমন্ত্র উচ্চারণ কবে বিপুল জলরাশি তার গতি আর শক্তিকে একই খাতে ধবে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এ ছোটার বিরাম নেই, বিশ্রামও নেই। এ যেন সেই মন্ত্র যা এককালে উচ্চারিত হত থামের সারি লাগান বাড়ীর মণ্ডপ ঘব থেকে। যেন ভাঙা ভাঙা সেই পুরোনো মন্ত্রেবই উচ্চারণ শুনতে পাচ্ছি এর উচ্ছ্বাসে—ওঁ ধর্মায় নমঃ, ওঁ অধর্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ।

পরম স্বীকৃতির মন্ত্র এ যে!

নিজের অবৈরাগ্যকে বুঝি এ মন্ত্রেই স্বীকার করে নিলাম!

বিগত দিনের মুছে যাওয়া অনেক স্মৃতির স্বপ্নে চোখ জুড়ে এল, নানা খুঁটিনাটি ঘটনা, ছোটখাট সুখ দুঃখ, আনন্দ উচ্ছলতা

সময়ের ব্যবধান পেরিয়ে মনে দোলা দিয়ে গেল ; আমি খুশী হয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—এই তো সব কিছুই নিজের ঠিক ঠিক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের আঘাতে কোনো কিছুই ভেঙে পড়েনি, বদলেও যায়নি। সেই শান বাঁধান সিঁড়িঘাট, সেই খিড়কি পুকুর, সেই সব পুরোনো লোকজন—মা, ক্ষীরিকাকী, হিমিদি এরা সকলেই তো আমার চোখের সামনে পুরোনো পরিবেশের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে।

চোখ মেলে দেখলাম বেতের চেয়ারে বসে আছে সুসানা ওমেরান—সূর্যাস্তের চমক-লাগা ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ভালমন্দে, আলো অন্ধকারে মেশা জীবন-স্রোতকে আমার মতই স্বীকার করে নিয়ে সে ও যেন বলছে—ওই সমাগত অন্ধকারে তো আলোর স্বীকৃতিই জড়িয়ে আছে। সারা জগৎব্যাপী ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, ঐশ্বর্য অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্যকে স্বীকার করেই তো আমাদের জীবন এগিয়ে চলেছে!

তার ভাবনারই জের টেনে আমিও যেন বলছি—হ্যাঁ, ঠিকই তো! তোমাকে স্বীকার করেছি বলেই তো সোনালী সূর্যাস্তের আলো এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে আজ!

এই দুর্বল ভাবনাগুলোকে এক সময় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে জিজ্ঞেস করলাম তাকে

—আপনি কলকাতার যাত্রী, তাই না?

সুসানা বললে

—হ্যাঁ, আর আপনি?

নিজের ভারিক্কি চাল বজায় রাখবার জন্যে বললাম

—আপাতত আমিনগাঁও পর্যন্ত, তার পরেরটুকু ঠিক করবেন বিরাজ বিশ্বাস।

পথ ঠিক করার গুরুভার যে বিরাজ বিশ্বাসের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে কাল কাটাচ্ছি সে খবর তিনি জানার আগে জানল সুসানা।

ওমেরান—তখনকার মত আমার মিথ্যাচারের অবলম্বন হলেন বিরাজ বিশ্বাস।

ম্লান-হয়ে-আসা দিনের আলো ব্রহ্মপুত্রের জলের আয়নায় সোনালী রক্তিমে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই দিকে চেয়ে সুসানা চুপ করে বসে রইল। সেই প্রতিফলিত বর্ণচ্ছটার ঝলক তার মুখে এসে লাগল, তার চোখের দীপ্তির সাথে মিশে গেল, আলোর বন্যায় তার দেহের বহিঃরেখাও যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠল। আমাদের স্টীমার সেই জলরাশিকে চিরে যেন কালের পদপাত অনুসরণ করে অপর তটের দিকে এগিয়ে চলেছে—আমরাও যেন তাকেই অনুসরণ করে এক নিশ্চিন্ততার তট থেকে জীবনের অন্য কোনো নিশ্চিন্ততর তটের দিকেই এগিয়ে চলেছি।

হ্যাঁ ঠিকই তো!

সারা জীবন ধরেই তো অবিশ্রাম ছুটে চলেছি—এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, এক তীর থেকে অন্য এক তীরে। তারই মধ্যে কত নতুন পরিচয় এসেছে—কত নর নারী, কত ভালমন্দ, কত দেশ-দেশান্তর, কত রাত্রি-দিন! এই চোখের সামনেই কত নতুন পুরাতনের সমাবেশ হয়েছে—আর সারাটা জীবন ধরে যেন তারই একটানা বিশ্লেষণ করে চলেছি!

এই তো এখনও সেই বিশ্লেষী মনের সামনে যেন আর এক নতুনের প্রকাশ হয়েছে। মনের গতিও তাই এলোমেলো হয়ে ছুটে যাচ্ছে—এক মূল থেকে আর এক মূলে; আবার কখনও বা শুধু শাখা থেকে শাখান্তরেই!

একবার উসমানি থেকে সুসানায়, আবার সুসানা থেকে উসমানিতে।

নিজেকে ব্যংগ করার জন্যেই এক সময় প্রশ্ন করলাম

—কি হে, নতুন কিছু আবার ঠাহর হল নাকি?

পরমুহূর্তেই আবার বিরক্ত হয়ে নিজেকে শাসন করে তেতো গলায় বললাম

—না জানিনে, ও সব জানিনে আমি!

হঠাৎ তারিফ উপচে উঠল বদরিকার গলায়, সে চীৎকার করে বললে

—বলিহারি যাই মহারাজ! কি বললেন আপনি, পাশা খেলা জানেন না? এই বুঝি নমুনা তার? এ যে একেবারে সেরা চাল—ছয়, তিন, নয়!

উসমানি পাশা তিনটের দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে ছকের ঘব গুনতে আরম্ভ কবল, এ যেন ভাগ্যেব ছকে সেরা চাল গুনে নিচ্ছে উসমানি!

হঠাৎ কিন্তু ভাবান্তব হল বদরিকার। সে উসমানির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তাব পরে খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল; উসমানি কিন্তু ততক্ষণে পাশাব ছক থেকে বদরিকার আর ফতিমাব কয়েকটা ঘুঁটিই নামিয়ে নিয়েছে। বদরিকা ছকের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বুঝে নিলে—ফতিমার আর তার খেলার শেষ জোরটুকু ছক থেকে মুছে নিয়েছে উসমানি। তার ভাবান্তর উসমানিও আড়চোখে দেখে নিল, কিন্তু কোনো কথা বললে না। বদবিকাই কথা কইলে আগে, সে বিরক্তি-ভবা গলায় বললে

—মাপ করতে হয় বিবিজান!

উসমানি জিজ্ঞাসু চোখে একবার তাকালে তাব দিকে।

বদরিকা বললে

—খেলা বন্ধ রাখ একটু, আমি নীচে থেকে ঘুরে আসি ততক্ষণে।

খেলা বন্ধ রাখার প্রস্তাবে উসমানি অবাক হল কিন্তু কোনো কথা কইলে না।

সহজে দমবার পাত্র নয় বদরিকা, তাছাড়া ভাঙন-লাগা খেলা তাকে কটু করে তুলেছে, সে বললে

—না বোঝার ভান করছ বুঝি? কিন্তু তোমার মাথা তো কোনো কালেই ভোঁতা নয় উসমানি!

তার শ্লেষ-মাখা কথা অগ্রাহ্য করে আমি অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা

করলাম। আর উসমানি মাথা নীচু করে সবুজে-লালে পাশার ছকের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। তার স্থৈর্যে আরো জ্বলে উঠে বদরিকা বললে

—কথা কইছ না যে বড় ?

ঠোঁটের কোণে তার হাসি ক্রূর হতে আরম্ভ করেছে, সে কটু গলায় আবার বললে

—পুরোনো কালের কোনো একটা নজির টানবে কি না তাই ভাবছ বুঝি ? কিন্তু সেকাল আর নেই উসমানি ! আজ আর বদরিকা মাতাল হয় না—বোতলে মদ থাকে ঠিক কিন্তু তাই বলে বোতল মাতাল হয় না কোনো কালে···বদরিকাও তেমনিই মাতাল হয় না আর ! কই, জবাব দাও বিবিজান !

উসমানি অনুযোগের সুরে বললে

—এ কি বাজে কথা তুললে বাদশা !

কিন্তু কোনো অনুযোগ অনুনয় মানতে রাজী নয় বদরিকা। নিষ্ঠুর আর তেতো হাসি হেসে সে বললে

—সে দিন পাতলা ছিল বদরিকাব গায়েব রক্ত। কথায় কথায় সে রক্তে দোলা লাগত—তার মুখ থেকে উচ্ছ্বাস-ভবা বেফাঁস কথাও ছুটত···আজ আর তা ছোটে না, তার দেহের রক্ত অনেক গাঢ় হয়ে গেছে, গাঢ় রক্তে কোনো তবংগই ওঠে না আর—শুধু প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ আছে, আর কিছু নেই !

তার গালে চোয়ালের হাড় দুটো অতিমাত্রায় দৃঢ় হয়ে বুঝিয়ে দিলে যে, নিষ্ঠুর ভাষায় সে আঘাত কববেই উসমানিকে।

কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই উসমানির, বদরিকার কোনো উক্তিই গ্রাহ্যের মধ্যে নেয়নি সে, কেবল একমনে ছকের ঘরগুলোই গুনে চলেছে।

ফতিমা বদরিকার হাত ধরে মিঠে সুরে বললে

—বাইরে যাবে কি করে ভাইজান ? এখনও বৃষ্টির মাতামাতি বাইরে। খেলার জন্যে ভাবছ বুঝি তুমি ? দেখ না আমিও আঠারোর চালে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিই কি না !

ফতিমার কথায় ভাব পালটাল তার, সে কৃত্রিম হেসে ফতিমার থুতনিতে নাড়া দিয়ে বললে

—তা না দিলে আমি কিন্তু টান মেরে ছক হটিয়ে দেব !

সত্যিই চঞ্চল হয়ে উঠেছে বদরিকা। পকেটে হাত চালিয়ে সে সিগারেট কেস বার করে নিজে একটা সিগারেট ধরালে, তার পরে আমার দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বললে

—মহারাজ, ধরিয়ে নিন একটা ! আপনার চোখে ধোঁয়া না ঢুকলে আর রক্ষে নেই আমার।

বাইরে তখনো অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছে, উসমানির ঘরে ঝালর-দারি পরদাআঁটা দরজাগুলো পাটে পাটে বন্ধ—একটা অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারে চারি ধার কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। বদরিকার গা ঘেঁষে আমি চাপা গলায় বললাম

—একটা আলোর ব্যবস্থা হয়না বদরিকা ? অন্ধকার যে গাঢ় হয়ে উঠল—

মুখের কথা লুফে নিয়ে চড়া গলায় বদরিকা বললে

—ঠিক বলেছেন, আলবাৎ আলো চাই ! উসমানি, তোমার ঘরে যতগুলো আলো আছে এক সংগে জ্বালিয়ে দাও আজ—তোমার ওই রূপের বহরখানা ভাল করে দেখে নিন মহারাজ !

সহিষ্ণুতাই কিন্তু উসমানির জীবনের মূল নীতি, সে রাগ করলে না বদরিকার কথায়—নীরবে অপমান সহ্য করে সহজ গলায় ফতিমাকে বললে

—আলো চাই ঘরে, ওদের কাউকে আলো জ্বালিয়ে দিতে বল বহেন।

ডেকের নীচু ছাদে হঠাৎ আলো জ্বলে তার অবস্থিতি জানিয়ে দিলে, বেতের চেয়ারে বসে আমরা দুজনে সেই আলোর দিকে তাকালাম ; আর সাথে সাথে স্টীমারের সব আলোগুলো এক সংগে

জ্বলে উঠল—অন্ধকার যেন স্টীমারের সীমানার বাইরে সরে গিয়ে আমাদের মতই অবাক চোখে আলোর দিকে তাকিয়ে রইল। জ্বলে উঠে আলোরই প্রয়োজনের কথা আমাদের মনে করিয়ে দিলে ওই আলোগুলো ; সুসানাও বললে তাই

—যতক্ষণ জ্বলেনি প্রয়োজনও বুঝিনি, জ্বলেই আমাদেব বুঝিয়ে দিলে আলোরই প্রত্যাশী হয়ে বসেছিলাম আমরা ; দেখুন একবাব, প্রয়োজনের কথা খেয়াল হল যখন সে প্রয়োজন মিটে গেছে!

আমি বললাম

—ঠিকই বলছেন, জীবনেব অনেক বড বড় সমস্যা মিটে যাওয়ার পরেই ধবা পড়ে !

এ ধবণের আলোচনা কিন্তু জড়তা ভাঙিয়ে মানুষকে হালকা করে না, আমাদেব ক্ষেত্রেও তা করলে না ; আড়ষ্টতাব গেরোগুলো যেন শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়ে আমাদেব অনেক বেশী আত্মসচেতন করে তুললে, আব মনেও সেই সংগে জমে উঠল অনেক কথা যা প্রকাশ না করলে তৃপ্তি নেই মোটে।

সুসানাব দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, মনে হল, আমাব মতই আত্মসচেতনতার জালে সে ও আটকা পড়ে গেছে, তাব মনও যেন অবলম্বন খুঁজছে, যে অবলম্বনের খুঁটি ধবে নিজেকে সে ব্যক্ত করে দিতে পারে। হাতেব কাছে কিন্তু তেমন কোনো অবলম্বন নেই আমাদের !

সেদিন কিন্তু তা ছিল, শশী বষ্টুমীর গানের আব তার দেহের অবলম্বন ছিল সেদিন। শশী গান গাইছিল, সেই থামের সারি লাগান বাড়ার দক্ষিণের নির্জন গলিতে দাঁড়িয়ে সে গাইছিল—

কে তোমায় সাজাল রমণী
ও শ্যাম কে তোমায় সাজাল বমণী ?
তোমার গলায় আছে বনমালা,
তুমি খুলেছ রাখাল-বালা,
বাহুতে শোভে এখন জহর-অনন্ত—

সরমে যাই গো মরি,
এ কি বেশ ধরলে হরি ?
কি বেশে দিলে দেখা
হে প্রাণকান্ত !

মিঠে গলা শশীর ।

ছাদের আলসের ধারে এগিয়ে গেলাম শশী বষ্টুমীর গান শুনতে আর ভাল করে তাকে দেখে নিতে ।

নির্জন ছাদ, লোকলজ্জার ভয় নেই, শশীর দিকে ভাল করে তাকান যাবে ! আলসের গায়ে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালাম, হ্যাঁ শশী নিজের জায়গাটিতেই এসে দাঁড়িয়েছে—জায়গার ভুল হয় না শশীর !

আমারই অপেক্ষায় ওপরে তাকিয়ে শশী তখন গাইছে

বাহুতে শোভে এখন জহর-অনন্ত
কি বেশে দিলে দেখা
হে প্রাণকান্ত

আমার দেখা পেয়ে তার ঠোঁটে হাসির ঝিলিক খেলে গেল, আমিও নির্ভয়ে তার চোখের ওপরে দৃষ্টি ধরে রাখলাম। চোখের ঠারেও শশী হাসতে জানে, তার চোখ থেকেও এবার হাসি ঠিকরে পড়ল !

নির্জন ছাদ। আগাছার জংগলে ভরা দক্ষিণের গলিও নির্জন, দ্বিধা সংকোচের কারণ নেই, প্রাণ ভরে শশীর দিকে তাকিয়ে আছি ; নজর দেওয়ার মতই দেহ শশীর ! তার স্বল্প আবরণ তাকে দীন করেনি—সুন্দরী করেছে, অনেক লাস্য এনেছে তার দেহে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বললে

—কি দেখছিস অমন বেহায়ার মত ?

চমকে উঠলাম, এ যে চেনা গলার স্বর ! ফিরে দেখি হিমিদি দাঁড়িয়ে আছে আমার পেছনে—যার উপস্থিতির কোনো সম্ভাবনা ছিলনা, সেই হিমিদি-ই পা টিপে ছাদে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে।

আলসের ধার থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নিজেকে খানিকটা সহজ করে নিয়ে বললাম

—হিমিদি! কবে এলে তুমি? আচ্ছা মানুষ যাহোক···! অনেক দিন পরে এলে এবার, না?

কথার জবাব না দিয়ে সে আলসের ধারে গিয়ে ঝুঁকে শশীকে দেখে নিলে, তার পরে আমার দিকে ফিরে বললে

—হ্যাঁ, অনেক দিন পরেই এলাম এবার।

অনেক্ষণ স্থির চোখে আমার মুখে তাকিয়ে কি যেন বোঝার চেষ্টা করলে, তার পরে বললে

—চারিধারের অদল-বদলগুলো ভাল করে বুঝতে পারছি তাই!

শ্লেষ ছিল তার কথায়, তাই কোনো জবাব দিলাম না। খানিকক্ষণ দুজনে চুপ করে কাটল, কারো মুখেই কথা যোগাল না। হিমিদি-ই কাঢ় গলায় এক সময় কথা কইলে,

—এত বেহায়া হলি কবে থেকে!

পাশ কাটাবার জন্যে আমি বললাম

—বেহায়াপনার কি হল আবার?

তার চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফুটে রইল, চুপ করে সে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। গুরুত্ব হালকা করার জন্যে আমি বললাম

—শশীকে দেখে তোমার এই মন্তব্য বুঝি? তুমিও যেমন! খুব ভাল গান গায় শশী ··সকলেই খুশী ওর গান শুনে ··

জড়তা কিন্তু সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারলাম না, হিমিদি ঠিক তেমনি কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; হঠাৎ ধমক দিয়ে সে বললে

—আবার মিথ্যে কথা বলছিস? তবে কি করছিলি তুই আলসের ধারে দাঁড়িয়ে? আমার চোখকে ফাঁকি দিতে চাস?

নিজেকে সহজ করে নেবার জন্যে পালটা জবাবে বললাম

—যত বাজে কথায় তুমি নাকাল কর মানুষকে! জানতে চাইলাম কবে এলে—তার জবাব নেই কোনো; দেখা হতে না হতেই যত চোটপাট আমার ওপরে!

আমার চোখের ওপর থেকে হিমিদি তার চোখ দুটো সরিয়ে অন্য মনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল, তাতে স্বস্তি পেলাম আমি, কারণ আত্মগোপন করার বোঝা খানিকটা হালকা হল।

সে আবার ফিরে তাকালো; আমি বুঝতে পারলাম এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মুখের ভাব পালটে গেছে। খাড়া সোজা দৃষ্টিতে চেয়ে সে জবাব দিলে

—কি জানতে চাস? কবে এসেছি, এই তো?

তার দ্রুত ভাবান্তরে অবাক হলাম, মনে হল, কোথায় যেন একটা ভীষণ গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে—আমার সহজ প্রশ্ন তাই তাব কাছে সহজ ঠেকেনি বরং সন্দিগ্ধই করে তুলেছে তাকে।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে

—আজ এসেছি, সকালে।

ভারি আবহাওয়া হালকা করার আশায় আমি হাসবার চেষ্টা কবলাম; কিন্তু একটা অজ্ঞাত ভয়ে হাসি এলনা, শুধু বললাম

—তুমি যে এসেছ, সান্নু সে কথা বলেনি আমাকে।

কথা শেষ হবার আগেই সে আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

নির্জন গলি থেকে তখন গানের কলি ভেসে আসছে

তুমি নূপুর ছেড়ে মল পরেছ
তোমাব ঘোমটা ঢাকা মু-খানি
কে তোমায় সাজালে রমণী!

সব জড়তা এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ আমার কাঁধে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে হিমিদি বললে

—আট বছরের বাঁধন টুকরো টুকবো করে ছিঁড়ে দিলাম, সহ্য হল না আর; নিজের মুখ পুড়িয়ে চলে এসেছি আজ, শ্বশুরঘর করার পাট মুছে দিলাম জীবন থেকে।

এ কি কথা শুনলাম! এর তাৎপর্য যে অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায়, এক নিঃশ্বাসে এর সবটুকু বোঝাও সম্ভব নয়—তবে এটুকু

বুঝে নিলাম যে তার জীবনের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে আর তার বিস্তারও দূরপ্রসারী; তার সিঁথিতে নজর পড়ল—দেখলাম সিঁদুরের দাগ কিন্তু জ্বলজ্বল করছে সিঁথিতে!

কাঁধে আবার ঝাঁকুনি দিয়ে হিমিদি জিজ্ঞেস করলে

—কি দেখছিস অমন করে, মাথায় সিঁদুর আছে তাই? ও দাগ মুছে দিলেই বেঁচে যেতাম, ওই টুকুই পারিনি এখনও!

অনেক জ্বালা ভরা ছিল তার মনে, অতর্কিতে তারই খানিকটা প্রকাশ পেল; তাব বিবর্ণ মুখে তাকাতে সাহস হয় না আর—তাই চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

গলি থেকে শশী হাঁক দিতে সুরু করেছে ততক্ষণে

—কিছু পাই গো, রাজাবাবু!

পিঠে সজোরে ঠেলা দিয়ে হিমিদি বললে

—কি দেবার আছে দিয়ে বিদায় কর ওই বেহায়া মাগীকে।

জড়তা ঝেড়ে আলসের ধারে গিয়ে সামান্য কিছু পয়সা ফেলে দিলাম শশীর কোঁচড়ে, তুচ্ছ দানে তার মুখে শুধু হাসি ফুটল না, চোখ থেকেও তার হাসি ঠিকরে পড়ল! সে চটুল হাসি হিমিদিকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেনি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে শশীর প্রাণ-চুরি-করা হাসি হিমিদিও দেখে নিলে; শশী মাথা নীচু করে চলে গেল—কারণ সে ও হিমিদির জ্বলন্ত চোখ দুটো দেখতে পেয়েছিল। তপ্তমুখে আমার দিকে ফিরে হিমিদি জিজ্ঞেস করলে

—কতদিন থেকে এই বেলাল্লাপনা চলছে ওই মাগীটার সংগে?

কি বিরক্তিকর প্রশ্ন তার! রাগে আমার সারা দেহ রিরিয়ে উঠল, তাই চোখ ফিরিয়ে নিলাম অন্য দিকে।

রাগের কিন্তু কোনো কারণই ছিল না ডেকে, শুধু শ্বাস-রোধ-করা অস্বস্তি নিয়ে একে অপরের সামনে বসে ছিলাম। সুনালা উসখুস্ করছিল অনেকক্ষণ থেকে; চেয়ার থেকে উঠে সে ডেকের রেলিং-এর

কাছে গেল একবার, তার পরে সেখান থেকে ফিরে আবার চেয়ারে বসে বললে

—স্টীমার ঘাটে লাগার সময় হল মিস্টার চ্যাটার্জি !

—তাই না কি ?

—দেখছেন না, এপারের আলোগুলো কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এখন !

আমিনগাঁও স্টীমার-ঘাটের আলো সত্যি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তবু কথা ঘুরিয়ে বললাম

—তা লাগছে বটে একটু, তবে ঘাটে পৌঁছতে এখনও দেরী আছে।

সুসানা আবাব চেয়ার ছেড়ে উঠল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম

—আবাব উঠলেন যে ?

—জিনিষপত্রের ঠিকঠাক করা দরকাব ··বেয়ারাকে খবর দিই !

আমি হাসতে হাসতে বললাম

—এত তাড়া কিসেব ? তদারক করাব জন্যে লোক তো আছেই। আপনার বকশিশের টাকা এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই বাসি হয়ে যায়নি ..তাছাড়া উপকারী মানুষ বিরাজ বিশ্বাস !

বকশিশের কথায় সুসানা লজ্জিত হয়ে বসল আবার, বললে

—নিজেই দেখাশোনা করে নেব ভাবছিলাম ! ভূতের মত বসে আছি এখানে···আপনি তো নিজের কারবারের চিন্তায় ব্যস্ত ! আপনাব বন্ধু তেয়ানাই বলেছিল সেদিন—খুব বড় কারবার আছে না কি আপনার, অনেক পাটের মোকাম, তাছাড়া আবো জমকালো নানা কাজকর্ম !

হাসতে হাসতে আমি বললাম

—তেয়ানা যে আমার সত্যিকারের বন্ধু তা বুঝতে পারলাম এতদিনে !

সুসানা একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলে

—কেন, নতুন কি ঘটল এমন ?

আমি বললাম

—পরিচয়টা আমার কেমন বাড়িয়ে-চাড়িয়ে দিয়েছে ; ভাল করে

আপনার সংগে পরিচয় হল বলেই তো জানতে পারলাম। বন্ধু বলেই অতিরঞ্জন করেছে, শত্রু এ কাজ নিশ্চয়ই করে না !

সুসানা বললে

—তেয়ানার কাছেই তো শুনেছি, অনেক হাংগামা পুইয়ে এই কাজ দাঁড় করিয়েছেন আপনি। ব্যবসায় কত কাজ করতে হয় মানুষকে, কত ভাবতে হয় • খরিদ দর, বিক্রি দর·· এই সব নিয়েই তো ব্যস্ত থাকে কারবারী মানুষ ! শুনেছি কত সময় ভাবনায় চিন্তায় তারা ঘুমোতেই পারে না রাতে···অনেক কিছু বুঝে দেখতে হয়, যাচাই করে নিতে হয় তাদের।

আমি বললাম

—তা তো হবেই ! নইলে টাকা আসবে কি করে ?

সুসানা বললে

—তাই আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল এতক্ষণ, নিশ্চয়ই আপনি পাট কেনা-বেচার কথা ভাবছিলেন, তাই না ?

দীর্ঘ অপেক্ষার পরে অবলম্বন জুটল এবার, লজ্জার মাথা খেয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে দিলাম

—গোল্লায় যাক পাট, আর গোল্লায় যাক তার কেনা-বেচা ! আপনি সামনে রয়েছেন আব আমি ভাবতে যাব কিনা পাটের কথা ?

কথার গতিতে আকস্মিক এই পরিবর্তনের জন্যে তৈরী ছিল না সুসানা, সে বিব্রত হল ; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে খুব সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলে

—তাই না কি ! আমার বিষয় কি ভাবছিলেন এত ?

আমি বললাম

—মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষ চিরকাল যে কথা ভাবে·· তার বেশী কিছু নয় !

সহজ নির্লিপ্ততার আড়ালে কথাগুলো ঢেকে আমি হাসার চেষ্টা করলাম। সুসানা কিন্তু এর জবাব দেবার সময় পেল না, তার আগেই বিরাজ বিশ্বাস ওপরে এসে বললেন

—জাহাজ ঘাটে লাগার সময় হল হুজুর!

পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমি বললাম

—তাই না কি? ভাল, আমিনগাঁওয়ে নেমে সব জিনিষপত্রগুলোই এক সংগে ওয়েটিংরুমে রাখার ব্যবস্থা করবেন তাহলে!

আরো সঠিক হবার জন্যে বিরাজ বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন

—মেমসাহেবের জিনিষগুলোও তো?

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে আমি বললাম

—হ্যাঁ, আমাদের লাগেজের সংগেই ওঁর লাগেজ নামিয়ে নেবেন।

সুসানার কাছে সম্মতি নেবার দরকার নেই আর, কারণ পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি তারও এতে কোনো অসম্মতির কারণ নেই।

স্টীমার ঘাটে এসে লাগল।

হট্টগোল-করা-যাত্রীদের ভীড় আর মোট-ঘাট টানাটানি ধীরে ধীরে হালকা হয়ে এল; বিরাজ বিশ্বাস আমাদের মালপত্র নিয়ে অনেক আগেই নেমে গেছেন। গ্যাংওয়েতে এখন আর ঠেলা ঠেলি নেই। সামনেই শালখুঁটির মাথায় পাটাতন বেছান লম্বা গ্যাংওয়ে, সুসানা নির্ভয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিলে এই পথটুকু তাকে পার করিয়ে দেবার জন্যে। বন্ধুর পথে তার হাত ধরে এগিয়ে চললাম! তার পরে পথ শেষ হল এক সময়, ব্রহ্মপুত্রের চঞ্চল জলরাশি তখন পেছনে পড়ে রইল; আমরা মাটিতে পা দিলাম, আর সেই সংগে নতুন করে বুঝে নিলাম মাটির সংগে মানুষের কি নিবিড় সম্পর্ক·· সুসানা তখনো তার হাত আমার হাতের বাঁধন থেকে সরিয়ে নেয়নি।

এগিয়ে এসে হাত দুটো চেপে ধরে হিমিদি বললে

—অমি, তুই যে এমনভাবে নষ্ট হয়ে যাবি কেউ কখনো কি কল্পনা করতে পেরেছিল? তুই এ কি করছিস বল তো! এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি—তবে তোর সংগে আমার শ্বশুর বাড়ীর জানোয়ারগুলোর তফাত রইল কোথায়?

আড়ষ্ট হয়ে আমি বললাম

—তুমি তিলকে তাল করে অযথা কটুকথা বলছ। নিজের মাথারই ঠিক নেই তোমার—

কথা শেষ হবার আগেই বাধা দিয়ে সে বললে

—চুপ কর বলছি ! আমার কথার ওপরে কেন কথা বলিস তুই ? আমাব কথার ওপরে কখনো কথা কইবি নে, তোকে বলে দিলাম ; আমার মাথা নিয়ে তোর মাথা ব্যথা কিসের ? মাথা খারাপ হয়েছে আমার ! এ কথা বলতে লজ্জা করলনা ? তুই-ও আজ ওদের মত কথা শোনালি আমাকে !

তার মুখে কথা সবল না, কান্নায় গলা বুজে এল—আব চোখের কোণ বেয়ে উদগত কান্না ঝরতে লাগল, তারই কাঁপুনিতে দুলে দুলে উঠল শরীর। তার মুখ থেকে আমি চোখ সরিয়ে নিলাম।

ছাদের আলসের বেষ্টনী এখন আমার চোখ আড়াল করে না, তাই অপ্রতিহত দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ভাগীরথীর স্রোতে।

আশ্বিনের কূলছাপান ভাগীরথী তার অপরিমেয় জলের বোঝা বয়ে চলেছে, সে ভার যেন বইতে পারে না আর—তার দুই তীর ছাপিয়ে উঠেছে তাই ! হিমিদিও সেই কূলছাপান উন্মাদনার দিকে তাকাল, তার মুখেও কথা নেই, কেবল চোখের কোল বেয়ে জলেব ধারা ভেঙে পড়ছে। বহুক্ষণ নীরবে কেটে গেল, এক আকবিস্ম আঘাতে হঠাৎ যেন আমরা মূক হয়ে গেছি। অনেকক্ষণ পবে সন্তর্পণে হিমিদি তার হাতের আঙুলগুলো আমার কাঁধে রাখলে একবার—সেই স্পর্শই যেন বলে দিলে তার শরীরে রাগের উত্তাপ নেই, গলার স্বরও অনেক নরম শোনাল, সে বললে

—রাগ করলি অমি ?

—কোনো দিন তো তোমার ওপরে রাগ করিনি হিমিদি···

কথা শেষ হবার আগেই গলা বুজে এল আমার, আর হিমিদির চোখেও নতুন করে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিলে, ভাগীরথীর স্রোতের চেয়েও জলোচ্ছ্বাসকে অনেক বেশী গতিশীল, অনেক বেশী শীতল মনে হল!

তার উদ্গত কান্না সে আর লুকোতে চাইলে না, আঁচলে চোখ মুছেও নিলে না, শুধু বললে

—তাই তো ছুটে এলাম তোদের বাড়ীতে, আমি জানি, তুই কোন দিন ভুল বুঝিসনে—রাগও করিসনে আমার ওপরে।

খানিক থেমে আবার সে বললে

—ও বাড়ীতে এক দণ্ড তিষ্ঠোতে পারলাম না। মনে হল, সকলে যেন আমার দিকে ব্যাংগ-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

মনের দ্বিধা এতক্ষণে আমার কমে গেছে, তার দিকে সহজ ভাবে তাকিয়ে দেখলাম; কিন্তু সেই পুরোনো হিমিদি কোথায়। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, এ মানুষের সঙ্গে তার মিল নেই—যেন ভিন্ন মানুষ এরা।

তাব মনের আবেগও ঝিমিয়ে এসেছিল, কিন্তু তখনো নিঃশ্বাস ঘনঘন ওঠাপড়া করছে; দমকা হাওয়ার চাঞ্চল্য নেই বটে, তবে তারই ঝাপটে অদৃশ্য জানলার আবরণ ক্ষণিকের জন্যে সরে গিয়েছিল—সেই অপরিসর ফাঁকে তার মনের এক রহস্যময় জায়গায় কি যেন দেখতে পেয়েছি! একটি ঝলক মাত্র, তারই ভেতরে সেই নির্জন মনের একাকীত্বের হাহাকার আমাকেও দিশাহারা করে তুলেছে।

প্রাণ-ছোঁয়া অনুনয়ে কথা কইলে হিমিদি, বললে

—কি দেখলি রে অমি! অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখলি তুই, বলবিনে আমাকে?

কিই বা উত্তর আছে এর। তাই মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলে উঠে হিমিদি বললে

—চাইনে শুনতে তোর কথা, দরকার নেই জবাবের; সানুও আজ কথা কয়নি আমার সংগে, মুখ ঘুরিয়ে সে চলে গেল আমাকে দেখে। সে ও জানিয়ে দিলে তার একটা মতামত আছে,সে স্বীকার করে না—আমার এই জ্বলে-পুড়ে-যাওয়া অস্তিত্ব স্বীকার করেনা সে।

তাকে শান্ত করার জন্যে আমি বললাম

—মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ছ তুমি…

দপ করে সে জ্বলে উঠে বললে

—কি বললি ! উত্তেজিত হয়েছি আমি ? শ্রান্ত হচ্ছি মিছিমিছি ? এ সব সস্তা ফাঁকা কথা তুই শিখলি কোথায় ?

তার মনেব কোনো দিশা নেই, ওঠা পড়ারও কোনো মাত্রা নেই ; বিদ্রোহের এক প্রচণ্ড আগুন জ্বলে রয়েছে তার মনে, কখনো তা নিষ্প্রভ, আবার কখনো জ্বলন্ত শিখায় তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেই জ্বালা ভোলাবার জন্যে নরম গলায় তাকে বললাম

—কি ভীষণ ভাবে তুমি বদলে গেছ হিমিদি !

আমার কাঁধের পেশীদুটো শক্ত মুঠোয় ধরে সে চীৎকার করে বললে

—বদল হয়নি তোর ! তবে তুই কি করছিলি ওই আলসেব ধারে দাঁড়িয়ে ?

আমার চোখে তাকিয়ে সে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ, তার পরে বললে

—মিছে কথা, একটুও বদল হয়নি আমার ! তুই ভাল করে চেয়ে দেখ অমি—নিশ্চয়ই বুঝতে পারবি, তুই নিশ্চয়ই দেখতে পাবি আমি ঠিক তেমনিই আছি—কোনো বদল হয়নি আমার।

আবার চুপ করলে খানিক, তার পর সে বললে

—তোরাই বদলে গেছিস ; মন, প্রাণ কুঁকড়ে গেছে তোদের, শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত তোরা, তাই অপরের দুঃখে তোদের প্রাণে সাড়া লাগে না।

বিকেল কোন ফাঁকে সন্ধ্যার দিকে ঢলে এল ; খিড়কি বাগানের গাছের ছায়াগুলো লম্বা হতে আরম্ভ করেছে ; ছাদের এই কোণ থেকে বাগানের অনেকখানি দেখা যায়, সারিবাঁধা কাঠ মল্লিকা গাছগুলো চোখে পড়ে, দেখা যায় ফুলের মেলা লেগেছে ওই গাছে গাছে—পর্যাপ্ত ফুলের আড়ালে গাঢ় সবুজ পাতাগুলো পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে।

হিমিদিও যেন ঢাকা পড়ে গেছে, তার অসহ্য যাতনা তাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। ভয়ে ভয়ে আমি বললাম

—তুমি রাগ করবে না কথা দাও, একটা কথা বলি তাহলে!

সে শান্ত ভাবে বললে

—তোর ওপরে কি সত্যি সত্যি কখনও রাগ করি আমি?

আমার পিঠে সে হাত রাখলে, তৃপ্তি-মাখা কথায় জানিয়ে দিলে, তার মনে উত্তাপের আগুন নেই আর। কানের কাছে মুখ এনে সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে

—বল কি বলতে চাস তুই!

আস্তে আস্তে আমি বললাম

—তুমি ঢাকা পড়ে গেছ, হিমিদি তোমার দুঃখের আড়ালে তুমি একেবারে হারিয়ে গেছ!

সে আব রাগ করলে না, অপরিসীম তৃপ্তির শ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে; আমাব কাঁধে তার হাত রাখলে, সে স্পর্শই যেন বলে দিলে, মনে তার রাগের আঁচ নেই, শরতের পড়ন্ত রোদের মতই তা স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে নিজেকে অনেক সংযত করে নিয়েছে, ধীরে ধীরে সে বললে

—বুঝতে পেরেছিস তুই কি জ্বালায় জ্বলে পুড়ে গেছি?

আমি বললাম

—বুঝেছি বৈ কি হিমিদি!

সে কি যেন ভাবলে অনেকক্ষণ, তার পরে নিজের খেয়ালেই বলতে লাগল

—বড় লোক দেখে আমার বিয়ে দিলেন বাবা। মা বললেন, তোর ভাগ্য ভাল হিমি, কুটোটিও নাড়তে হবেনা তোকে, ওদের ঘর ভরা ঝি-চাকর—তোর সুখের সীমা থাকবে না, বুঝলি? আট বছর ধরে সেই সুখ ভোগ করে এলাম।

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম সে নিজের

ভাবনার মধ্যে একেবারে ডুবে গেছে, কোন কিছুই খেয়াল নেই তার। সে বলতে লাগল

—আট বছর ধরে দেখলাম ও বাড়ীতে বউ এর চেয়ে ঝি এর কদর কত বেশী! তুই ভাবতে পারিস অমি, বয়েস হলেই ও বাড়ীর ছেলেরা ঝি পায়, কদর হবেনা ঝি এর? পুরোনো হলে ঝি পালটে আনা চলে, বউ তো আর পালটান চলে না! ঝি বলে দেবে, বাবু কি চান, কি চান না; কি ভাল বাসেন, বাসেন না—এই নিয়ম ও বাড়ীর, এই নাকি চলে আসছে ও বাড়ীর ধারায় আবহমান কাল থেকে! সহ্য করতে হবে বৈ কি···সব সহ্য করতে হবে ··সহ্য করার জন্যেই যে মেয়েমানুষের জন্ম···তুই জানিসনে সে কথা?

খাড়া সোজা দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকাল হিমিদি। শ্বাস বন্ধ করে আমি তার কথা শুনছিলাম এতক্ষণ - এ এক অদ্ভুত কাহিনী শোনালে সে; ত্রিসংসারে এমন ব্যাপারও ঘটে তাহলে! আমি জিজ্ঞেস করলাম

—তার পরে?

হিমিদি বললে

—মা বললেন, সহ্য করতে হবে বৈ কি!

—কেন?

—তাঁর মতে, আমার দুঃখ আমি ছাড়া আর কে সহ্য করবে আমার হয়ে?

—শুভকাকা?

ম্লান হেসে সে বললে

—বাবার মতামত! কি-ই বা বলতে পারেন তিনি? মা আছেন, তাঁর বলা কওয়ার উপায়ই বা আছে কতটুক!

দূরে ভাগীরথীর দিকে চেয়ে চুপ করে রইল হিমিদি। দুর্বার গতিতে নদীর স্রোত দুই তটকে যেন অগ্রাহ্য করে ছুটে চলেছে, আর আপন খেয়ালে কলকল্লোলে গর্জন করে উঠছে। ঊর্ধ্ব আকাশের অচঞ্চল স্তব্ধতা আর তার অপরিসীম স্থৈর্যকে নিজের বুকে

প্রতিফলিত করে নিজের আনন্দেই আবার তা খান্ খান্ করে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। সন্ধ্যার নানা বর্ণাভ আলোয় তার তরংগ-ভরা কৌতুক-চাতুরী চোখে ধাঁধাঁ লাগায়!

হিমিদি আবার কথা কইলে, বললে

—অমি, ওরা কেউ জানে না যে সহ্যেরও একটা সীমা আছে; আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে সেই সীমানা আজ উত্তীর্ণ হয়ে এলাম। কেউ জানেনা একথা—শুধু তোকে জানালাম; আমার সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, তাই নিজের ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আজ। দেখি আমার ভাগ্য আমাকে দিয়ে কোন পথ বাহিয়ে নেয়।

তার প্রতিটি কথা এক এক করে শুনে উদ্‌বেগ গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে আমাব শ্বাসরোধ কবে দিলে। হিমিদির কূলহারা দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ কি বুকভাঙা এক কাহিনী শুনলাম?

হঠাৎ আমার হাত দুটো চেপে ধরে সে জিজ্ঞেস করলে

—তোর কষ্ট হচ্ছে না অমি! এতটুকুও কষ্ট হল না তোর? একবারও তুই বললিনে সে কথা, একবারও বলতে পারলিনে—হিমিদি তোমার কষ্ট যে সহ্যের বাইরে চলে গেছে, আমিও সহ্য করতে পারছিনে তোমার ওই বুকভাঙা আর্তনাদ!

উৎকণ্ঠায় আমার গলা বুজে এসেছিল, তাই অস্পষ্ট স্বরে বললাম

—তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারনি আমার মনের কথা হিমিদি?

সে দুর্বার আকর্ষণে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললে

—বুঝতে পেরেছিস তুই! কাছে আয় আমার…একেবারে কাছে চলে আয়।

পরম তৃপ্তিতে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সে বললে

—চেয়ে দেখ অমি, তুই ভাল করে চেয়ে দেখ একবার—এত পীড়নের মধ্যেও কি সম্পদ লুকোনো আছে আমার ভেতরে!

তার চোখে জ্বালার আগুন জ্বলে উঠেছে তখন। আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম, তার উজ্জ্বলতা, তার বর্ণবৈভব, তার দেহ

সৌষ্ঠব ; কথা কইতে গিয়ে গলা থেকে বিকৃত শব্দ ফুটল, সেই বিকৃত স্বরে তাকে বললাম

—হিমিদি, আরো কাছে টেনে নাও তুমি, আঘাত কর, নিঙড়ে নাও আমাকে !

এ যেন আর এক ভাগীরথীর সামনে এসে দাঁড়ালাম—আব এক কূলভাঙা ভাগীরথী এ যে ! এর জলোচ্ছ্বাসে কূলছাপান প্লাবনই আনে না—পাড়ও ভেঙে নেয় !

চীৎকাব করে সেই পাড়-ভেঙে-দেওয়া স্রোতকে ডাক দিয়ে বললাম—হে সর্বগ্রাসী উন্মাদনা, তুমি তোমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ কবে দুর্বল এই পাড়টুকু নির্মূল কবে দাও ! তোমার গতির পাকে পাকে একেও গুলে নিয়ে তুমি মাটিব স্বাদ গ্রহণ কব ! তার পবে তোমাব গতিব সাথে টেনে নিয়ে তুমিও সম্পূর্ণ এক হয়ে যাও এব সাথে !

তাব সারা দেহে প্লাবনেব স্বাদ পেলাম, যে প্লাবনেব সংগে সৃষ্টির অভেদ্য যোগাযোগ !

সেই প্লাবনকে জিজ্ঞেস করলাম

—আমি কি পেলাম, কি পেয়েছি, তুমি তা কি জান না ?

প্লাবন নিজেব গতির কথা চিন্তা কবছে তখন, তাই কোন কথা কইলে না। আমি নিজের আনন্দেই তাকে আবার বললাম

—আমার স্বীকৃতির কথা শুনে নাও তুমি !

প্লাবন হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, বললে

—বল, তাড়াতাড়ি করে বল কি বলতে চাও তুমি ; সময় নেই আমার, এই গতির রাজ্যে দাঁড়িয়ে থাকার মত সময় নেই !

আমি বললাম

—জীবনের সমস্ত দুরাকাঙ্ক্ষা, সমস্ত আকাশকুসুমকে স্বীকার করে নিচ্ছি,—তুমি শুনে নাও সেই মন্ত্র !

প্লাবন বললে

—উচ্চারণ কর, তোমার স্বীকৃতির মন্ত্র উচ্চারণ করে দাও ; আমি কান পেতে রাখলাম।

তার কানে কানে বললাম

—জীবনের মণিমণ্ডপকে স্বীকার করে নিলাম, জীবনের মণি বেদিকাকে স্বীকার করে নিলাম, জীবনের রত্নসিংহাসনকে স্বীকাব করে নিলাম, জীবনের কল্পবৃক্ষকে স্বীকার করে নিলাম—জীবনের ক্ষীর সমুদ্রকেও স্বীকার কবে নিলাম! প্রতিটি দুরাকাঙ্ক্ষাকে প্রণাম জানাচ্ছি, তুমি শুনতে পেলে কি ?

প্লাবন আর কথা কইলে না, তার কলোচ্ছ্বাসের উন্মাদনায় তন্ময় হয়ে রইল।

দেহের চাবিদিকে সন্ধ্যাব অন্ধকাব ঘনাতে আরম্ভ কবেছে তখন, সেই অন্ধকাবের মধ্যে অপরিসীম তৃপ্তি খুঁজে পেলাম, আর তারই প্রাণবিন্দু খুঁজতে গিয়ে জানতে পাবলাম যে, অনেক পীড়নেব দংশন লুকোনো আছে তার ভেতরে।

ভাগীবথীব কলোচ্ছ্বাসকে তখন ভাগ্যেব অট্টহাসির মত শোনাল।

সুসানার চোখ ভাবে আধ-বোজা হয়ে এসেছিল, সে বললে

—ভাগ্যকে আমি কোনো দিনও অস্বীকার করতে পারিনি। আমাদের জীবনেব সংগে ভাগ্য ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে।

আমি বললাম

—আমি কিন্তু তাব উলটোটাই দেখি, ভাগ্যকে বাদ দিয়েই জীবন দিব্যি চলে যাচ্ছে! ভাগ্যেব দোহাই দিয়ে শুধু নিজেদের বিড়ম্বিতই কবেছি আমরা।

সুসানা মাথা নেড়ে বললে

—না তা নয়! বহুবার এর প্রমাণ পেয়েছি আমি ; মানুষের জীবনে যা ঘটবে তা আগে থেকেই ঠিক করা আছে। পৃথিবী একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়েই চলেছে। সময় মত শুধু ঠিক-করা জিনিষগুলো একে একে ঘটে যায়!

হালকা ভাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম

—তাহলে আমিও তো আপনার কাছে সেই নিয়ন্ত্রণেরই একটা পরিচয় ?

সে বললে

—অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই !

ধীরে ধীরে তার মুখে আত্মবিশ্বাসের রেখা ফুটল। সরল ভাবেই কিন্তু সে জিজ্ঞেস করলে আমাকে

—অস্বীকার করার কোন যুক্তি আছে নাকি আপনার ?

অস্বাভাবিক ওজন ছিল তার কথায়, বিশ্বাসের ভিত শক্ত করে পাতা তার মনের তলায় ; হাল্কা বিদ্রুপে তা টলার নয়—তবু হাল্কা ভাবেই আমি বললাম

—যা ঘটেছে তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এতে আপনার সংগে কোনো গরমিল নেই আমার।

প্রচ্ছন্ন ইংগিতটুকু সুসানা বুঝলে, তাই সে চুপ করে রইল। আমিনগাঁও রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে আবার এক অস্বস্তিকব পরিবেশেব সৃষ্টি হল। আমি নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিলাম এই বেফাঁশ কথা বলার জন্যে। তাল বুঝেই কিন্তু ঘরে ঢুকলেন বিরাজ বিশ্বাস—আমিও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ঘরের ভারি আবহাওয়া পালটে দেবার জন্যে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম

—কি ঠিক করলেন বিশ্বাস মশাই ?

—কলকাতায় যাওয়াই ঠিক হুজুর !

—যা ভাল বোঝেন করুন আপনি !

বিরাজ বিশ্বাস আমতা আমতা করে বললেন

—তাই বলছিলাম, পথে কবার গাড়ী বদল করা আছে—তার ওপরে মেম সাহেব সংগে রয়েছেন···দরকারও আছে হুজুর !

আমি জিজ্ঞেস করলাম

—দরকারটা কি ?

এতক্ষণে মনের কথা খুলে বললেন বিরাজ বিশ্বাস

—হুজুরের সংগে যাবার অনুমতি চাইছি ! মেয়ের বিয়ে দিয়েছি কলকাতায়, সব সময় যাওয়া আসার সুবিধে হয় না, আপনার অনুমতি পেলে সংগে যেতাম এবার।

আমাকে আশ্বস্ত কবার জন্যে তিনি আরো বললেন

—পাটের কাজের জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না হুজুব, মাসখানেকেব মধ্যেই মোকামগুলো চালু হয়ে যাবে !

আমি বললাম

আপত্তি নেই তাহলে ; নিশ্চিন্তে টিকিট কেনার ব্যবস্থা করুন !

ওয়েটিংরুম থেকে যাবাব আগে বিরাজ বিশ্বাস সুসানাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন

হুজুবের কাছে অনুমতি পেয়েছি ; পথে আপনাদের দেখাশোনা কবাব সুযোগ পেলাম আবাব !

সুসানা খুশী হল তাঁব কথায়। তার খুশীতে আমিও তৃপ্তি পেলাম ; কিন্তু এব আড়ালে অনেক আকাঙ্ক্ষার জ্বালা লুকোনো ছিল।

মেহেবুব আলিব চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় চকচক করছিল, তিনি মুখ টিপে আমাব দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁটিয়ে দেখে নেবাব চেষ্টা কবছিলেন, আমার সংগে চোখোচোখি হতেই দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। আমি কিন্তু চোখ সরালাম না—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে সুরু কবলাম, তাঁর গালেব চাপ দাড়ি পরিপাটি করে ছাঁটা, দুই প্রান্ত ছাড়া গোঁফের বাকী অংশ ঠোঁটের ওপবে নেই বললেই চলে। ঠোঁটের চাপা ভাবে, যে পবিস্কার বোঝা যায় তিনি নিজের মতামত যত্ন করে চেপে বেখেছেন। আমি কিন্তু এ সব গ্রাহ্যের মধ্যেই নিলাম না, সোজাসুজি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম

—কিছু বলতে চান নাকি আলি সাহেব ?

সটকায় টান দিয়ে মেহেবুব আলি বললেন

—হ্যাঁ, ফলাফলটা কি দাঁড়াল শেষে ?

এতক্ষণে চমক ভাঙল আমার ; বুঝতে পারলাম, বদরিকার

হালকা ভাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম

—তাহলে আমিও তো আপনার কাছে সেই নিয়ন্ত্রণেরই একটা পরিচয় ?

সে বললে

—অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই !

ধীরে ধীরে তার মুখে আত্মবিশ্বাসের রেখা ফুটল। সরল ভাবেই কিন্তু সে জিজ্ঞেস করলে আমাকে

—অস্বীকার করার কোন যুক্তি আছে নাকি আপনার ?

অস্বাভাবিক ওজন ছিল তার কথায়, বিশ্বাসের ভিত শক্ত করে পাতা তার মনের তলায়; হাল্কা বিদ্রুপে তা টলার নয়—তবু হাল্কা ভাবেই আমি বললাম

—যা ঘটেছে তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এতে আপনার সংগে কোনো গরমিল নেই আমার।

প্রচ্ছন্ন ইংগিতটুকু সুসানা বুঝলে, তাই সে চুপ করে রইল। আমিনগাঁও রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে আবার এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হল। আমি নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিলাম এই বেফাঁশ কথা বলার জন্যে। তাল বুঝেই কিন্তু ঘরে ঢুকলেন বিরাজ বিশ্বাস—আমিও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ঘরের ভারি আবহাওয়া পালটে দেবার জন্যে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম

—কি ঠিক করলেন বিশ্বাস মশাই ?

—কলকাতায় যাওয়াই ঠিক হুজুর !

—যা ভাল বোঝেন করুন আপনি !

বিরাজ বিশ্বাস আমতা আমতা করে বললেন

—তাই বলছিলাম, পথে কবার গাড়ী বদল করা আছে—তার ওপরে মেম সাহেব সংগে রয়েছেন···দরকারও আছে হুজুর !

আমি জিজ্ঞেস করলাম

—দরকারটা কি ?

এতক্ষণে মনের কথা খুলে বললেন বিরাজ বিশ্বাস

—হুজুরের সংগে যাবার অনুমতি চাইছি! মেয়ের বিয়ে দিয়েছি কলকাতায়, সব সময় যাওয়া আসার সুবিধে হয় না, আপনার অনুমতি পেলে সংগে যেতাম এবার।

আমাকে আশ্বস্ত করার জন্যে তিনি আরো বললেন

—পাটের কাজের জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না হুজুর, মাসখানেকের মধ্যেই মোকামগুলো চালু হয়ে যাবে!

আমি বললাম

আপত্তি নেই তাহলে ; নিশ্চিন্তে টিকিট কেনার ব্যবস্থা করুন।

ওয়েটিংরুম থেকে যাবার আগে বিরাজ বিশ্বাস সুসানাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন

হুজুরের কাছে অনুমতি পেয়েছি ; পথে আপনাদের দেখাশোনা করার সুযোগ পেলাম আবার।

সুসানা খুশী হল তাঁর কথায়। তার খুশীতে আমিও তৃপ্তি পেলাম ; কিন্তু এর আড়ালে অনেক আকাঙ্ক্ষার জ্বালা লুকোনো ছিল।

মেহেবুব আলির চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় চকচক করছিল, তিনি মুখ টিপে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁটিয়ে দেখে নেবার চেষ্টা করছিলেন, আমার সংগে চোখোচোখি হতেই দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। আমি কিন্তু চোখ সরালাম না—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে সুরু করলাম, তাঁর গালের চাপ দাড়ি পরিপাটি করে ছাঁটা, দুই প্রান্ত ছাড়া গোঁফের বাকী অংশ ঠোঁটের ওপরে নেই বললেই চলে। ঠোঁটের চাপা ভাবে, যে পরিস্কার বোঝা যায় তিনি নিজের মতামত যত্ন করে চেপে রেখেছেন। আমি কিন্তু এ সব গ্রাহ্যের মধ্যেই নিলাম না, সোজাসুজি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম

—কিছু বলতে চান নাকি আলি সাহেব?

সটকায় টান দিয়ে মেহেবুব আলি বললেন

—হ্যাঁ, ফলাফলটা কি দাঁড়াল শেষে?

এতক্ষণে চমক ভাঙল আমার ; বুঝতে পারলাম, বদরিকার

কথা বলতে গিয়ে অনেক জটিলতর সমস্যার খেই-এ টান দিয়েছি। উসমানির ভাগ্য যাচাই-এর কাহিনী বলতে একি অনাসৃষ্টি ঘটে গেল ?

সুসানাকে নিয়ে দুর্ভাবনা নেই, উসমানিকে নিয়েও নয়; কিন্তু হিমিদি ? কোন আচ্ছন্নতার ঘোরে তাকে এই নোংরা পরিবেশে টেনে আনলাম ?

আশ্বস্ত হবার কিছু কারণ জুটল। এই মানসিক আচ্ছন্নতার মধ্যেও দুর্যোগময় সেই শীতের রাতের কথা ফাঁস হয়ে যায়নি।

সে রাতটাই যেন সম্পূর্ণ জীবন একটা—আজকের জীবনের সংগে তার কোনো যোগাযোগ নেই। সে যেন অন্য জগতের কথা—এ জগতের সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই !

হিমিদিও একবারে আলাদা ধাতুতে গড়া মেয়ে মানুষ, তার সাথে কারো মিল নেই !

মেহেবুব আলির চোখে আবার কৌতূহল জাগতে আরম্ভ করছে, নিজেকে তাই শক্ত করে নিলাম। মনে হল, তিনি আবার খুঁটিয়ে দেখতে চান আমার মনের গতিবিধি—আমি কিন্তু আর ধরা দিচ্ছিনে, মন থেকে এক এক করে সব পুরোনো স্মৃতি মুছে দিচ্ছি ··এই তো স্টেশান প্ল্যাটফরমের কেরসিনের আলোগুলো মন থেকে মুছে গেল, তাদের ম্লানমুখী ধোঁয়াটে আলোয় আর হিমিদিকে দেখা যাবেনা। সে আলোর ঝলকও আর গিয়ে পড়বে না চলন্ত ট্রেনের জানলার গায়ে, নিশ্চিন্ত মনে যে জানলায় মাথা ঠেস দিয়ে সে বসেছিল। অতীতকে এক ফুঁ-এ উড়িয়ে দিয়ে মেহেবুব আলিকে জিজ্ঞেস করলাম

—বদরিকার ভাগ্য যাচাই-এর ফলাফলের কথা শুনতে চান বুঝি ?

ফিকে হেসে মেহেবুব আলি বললেন

—হ্যাঁ, সেদিন কোথায় গিয়ে ঠেকলেন আপনারা ?

আমি বললাম

—বদরিকা চিরকাল ভেসেই বেড়াবে ! কোথাও দুদণ্ডের বেশী তার দাঁড়াবার সময় নেই।

মেহেবুব আলি সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন

—কেন ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম

—পাশার ছক পায়ে উলটে দিয়ে বদরিকা চীৎকার করে উঠল। উসমানি কিন্তু হায় হায় করে বললে—তোমার এমন সাজান ভাগ্য তুমি নিজের পায়ে উলটে দিলে বাদশা ?

তপ্ত হয়ে মেহেবুব আলি জিজ্ঞেস করলেন

—তার পরে ?

আমি বললাম

—বদবিকা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল, ঈর্ষায় তাব মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, হঠাৎ সে বললে—অনেক বুজরুকির কথা এতকাল ধরে আমাকে শুনিয়ে এসেছ বিবিজান ! বদবিকাব ভাগ্যের চেয়ে যে-কোনো শাঁসালো মক্কেলেব সান্নিধ্য তোমার কাছে অনেক বেশী দামী···এই খাটি সত্যিটাই জানতে পারলাম আজ !

উসমানি কিন্তু কোনো কথা কইলে না। ইতস্তত ছড়ান পাশার ঘুঁটিগুলোর দিকে চেয়ে সে বসে বইল।

॥ আট ॥

হীবাজুলি এস্‌টেটের নথিপত্রগুলো টেনে নিলেন মেহেবুব আলি। আবাব তাঁর কপালে চিন্তাব রেখা ফুটে উঠল, নথিতে জড়ান লাল ফিতের বাঁধন খুলতে খুলতে তিনি বললেন

—বাদী আর্থাব ম্যালকমের জবানবন্দিটা আপনার পড়ে দেখাই ভাল ! কি বলেন আপনি ?

জবানবন্দির কাগজগুলো উলটে দেখতে সুরু করলেন মেহেবুব আলি। এক চিন্তারাজ্য থেকে যেন আর এক চিন্তারাজ্যে তিনি এগিয়ে চলেছেন। মামলার জটিল সমস্যাগুলো যেন মুখব্যাদান করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম

—প্রয়োজন মনে করলে পড়ে দেখতে হবে অবশ্যই ; তবে তার দরকার আছে বলে মনে হয় না !

কথা শেষ হবার আগেই মেহেবুব আলি নিজের চিন্তার জের টেনে বললেন

—মনে হচ্ছে সহজ পথে চলতে বদরিকা রাজী নয় ; আজই চিঠি পেয়েছি তার।

আমি জিজ্ঞাসু ভাবে তাকালাম, তিনি বললেন

—সেই কথাই তো বলছিলাম তখন ! অতিরিক্ত চুক্তিপত্র, যা সম্পাদন করে দিতে স্বীকার করেছিল বদরিকা, আজ তা ফেরত পাঠিয়েছে আর জানিয়েও দিয়েছে সেই সংগে যে, কোনো অন্যায় চাপ সহ্য করতে সে বাধ্য নয় !

এ যে দেখি চুক্তি ভাঙার কথা ! এতে কি মতামত দিতে পারি আমি ? জরুরী সমস্যার আলোচনার সময় ওতপ্রোত ভাবে তারই সংগে জড়িয়ে মেহেবুব আলি এক আলাদা ধরণের মানুষ হয়ে ওঠেন, এখনো তার ব্যতিক্রম হল না ; তিনি শংকা-মেশা গলায় বললেন

—বদরিকার সব চিঠিগুলোই মজুদ আছে, তাই অসুবিধা নেই আমাদের ; ব্যাপার দুশ্চিন্তার পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে না এ আশ্বাস এখনই দিতে পারি আপনাকে। তবে দুঃখ এই যে, বদরিকা নিজেই বিভেদের পথটা চওড়া করে দিলে।

বদরিকার চিঠিগুলো নথিতে এক জায়গায় জড়ো করে নিয়ে তিনি আবার বললেন

—আমাদের দুর্ভাবনা কি বলুন ? তার ব্যবহারের জন্যেই ভবিষ্যতে চক্ষুলজ্জার কোনো বালাই থাকবে না আমাদের !

বদরিকার সংগে একটা মনান্তর ধুঁইয়ে উঠছে। আর সেই মনান্তরকে কেন্দ্র করে বিবাদও যে একদিন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে এতে ভুল নেই ! কিন্তু উপায়ই বা কি ? নিজের দিক থেকে বিচার করে দেখি, এর প্রয়োজনই ছিল না, আর বদরিকার দিক থেকেও

কোনো যুক্তি ছিল না এই নোংরা সমস্যা সৃষ্টি করবার—তবু তাই-ই করেছে সে !

তার সম্পত্তিগুলোয় কোনো ঈপ্সা নেই আমার; মামলা-সংকুল আর ঝঞ্চাটে ঝঞ্চাটে অতি ভারাক্রান্ত তার বিষয়-আশয়, ঝঞ্চাট ছাড়া যে বাঁচতেই পাবে না বদবিকা !

আর্থার ম্যালকমের জবানবন্দির জায়গায় জায়গায় দাগ দিচ্ছিলেন মেহেবুব আলি, কাজ বন্ধ রেখে আমার দিকে তাকালেন। আমিও তাই উড়ো ভাবনাগুলোকে মন থেকে হটিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম

—কিছু বলবেন নাকি আলি সাহেব ?

মেহেবুব আলি মাথা নেড়ে বললেন

—না, আর বিশেষ কিছু বলার নেই, তবে আজ থেকে আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে, মামলা থেকে খেয়াল-খুশী মত হাত আর গুটিয়ে নেওয়া চলবে না। আমাদের চুক্তির বাঁধনে বদবিকা যেমন বাঁধা পড়েছে, আমাদের নিজের বাঁধনে আমরাও বাঁধা পড়েছি তার কাছে ! শুধু দাবি কায়েম রাখার জন্যেই চুক্তির নির্দেশগুলো আমাদেরও মেনে চলতে হবে।

দৃঢ় ভাবে আমি বললাম

—তা না মানার কোন কারণ নেই।

মেহেবুব আলি হাসতে হাসতে বললেন

—তা জানি, আবার তার উলটোটাও তো সন্দেহ হয় কখনো কখনো !

নেহাত হালকা উক্তি; কিন্তু এরই আড়ালে তাঁর নিজের চরিত্রের ওজন, আর অপরের চরিত্র-জ্ঞান সম্বন্ধে গভীরতা লুকিয়ে ছিল। খানিক চুপ করে, মনে মনে নিজের বক্তব্য গুছিয়ে তিনি আবার বললেন

—বদবিকার সংগে আপনার বন্ধুত্ব অগভীর নয়, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তা টেকসই হয়েছে বলেই বিশ্বাস। আপনার বন্ধুত্বই না শেষে মামলার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়···এই আশংকা, আর কিছু নয় !

জবাবের অপেক্ষা না করেই তিনি জবানবন্দির পাতায় মন দিলেন। আমি কিন্তু তাঁরই কথার জের টেনে চিন্তার এক গভীর বনে পথ হারালাম।

বদরিকাকে নিয়েই এই ভাবনা! সমস্যার পেছনে বদরিকাই তো দাঁড়িয়ে আছে! বিচিত্র খেয়াল খুশীর জীবন তার, ভ্রূক্ষেপহীন চলা ফেরা, উর্দু বয়াতের শূন্যগর্ভ দার্শনিক তত্ত্বে জীবনের মাপ কষা, আর ঠুংরি গজলের চালে শিস্ দিয়ে জীবনের সমস্ত জটিল সমস্যাকে যেন-ফুঁ'এ উড়িয়ে রেসের ঘোড়ার গতিতে সময়ের দাম ধরে নেওয়া; আর তারও ওপরে হল, পাশার ছকের সামনে গণিকাকে বসিয়ে ভাগ্যের অন্ধি-সন্ধির কিনারা করা…এই যে অদ্বিতীয় বদরিকা, একে কেন্দ্র করেই সারা মন যেন চিন্তার এক ব্যাপক অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

চোখের সামনে বদরিকার জলো ভ্যাপসা চোখ দুটো হঠাৎ ভেসে উঠল। দ্রুত পলক ওঠা পড়া করছে তার চোখে; সেই সংগে সে যেন উর্দু বয়াতের ভাষায় বলছে—কুছ্ পরওয়া নেই মহারাজ, কোনো ভয়ও নেই! আপনার সংগেই হয়ে যাক না এক হাত! কপালে অত চিন্তার রেখা কেন? কপালে শুধু রেখা ফুটিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ কি ভাগ্য পালটাতে পেরেছে? বলুন, কিসে অভিরুচি আপনার, তেজী না মন্দী? বদরিকার জীবনে কিন্তু অভিরুচির বালাই নেই; হলেই হল একটা! চাল আপনিই বেছে নিন না কেন? আপনার পরিত্যক্ত চালই বিনা দ্বিধায় তুলে নিয়ে আপনার ওপরেই তা ছুঁড়ে দেবে বদরিকা!

কোনো সংকোচ নেই, কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই তার জীবনে। সে ভ্যাপসা চোখ দুটো সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে প্রশ্ন করছে, তেজী না মন্দী? বাঁধা-ধরা সড়ক, না গলি-ঘুঁজি? মহারাজ কোনটায় অভিরুচি আপনার?

সত্যিই নিজের ওপরে বিরক্ত হলাম! কেনই বা এত প্রশ্রয় দিই তাকে? সেই মুহূর্তেই মেহেবুব আলিকে বলে দিলাম

—আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন আলি সাহেব, বদরিকাকে নিয়ে কোনো দুর্বলতা নেই আমার! প্রয়োজনের সামনে আমার বন্ধুত্ব প্রতিবন্ধক হবে না কখনো।

বাইরে নজর পড়ায় বুঝলাম রাত্রি গভীর হতে সুরু করেছে। পকেট থেকে ঘড়ি তুলে দেখি, দশ মিনিট আগেই রাত এগারোটা পেরিয়ে গেছে—আর দেরী করা উচিত নয়! মেহেবুব আলিকে বললাম

—বেরোবার তোড়জোড় করতে হয় যে এবার!

মেহেবুব আলি বললেন

—গাড়ী ডাকতে পাঠাচ্ছি, তার ভেতরে এক পেয়ালা কফি চলতে পারে নিশ্চয়ই?

ব্যস্ত হলেও নিজের ভাব গোপন করে বললাম

—আপত্তি নেই!

আর্থার ম্যালকমের জবানবন্দির নকল নথিতে আলাদা করে রাখা ছিল, সেটা এগিয়ে দিয়ে মেহেবুব আলি বললেন

—সময় মত পড়ে দেখবেন এটা মিষ্টার চ্যাটার্জি। সাধারণ জ্ঞান থেকেই আইনের উৎপত্তি! আপনি কৃতী মানুষ, তাই আপনার মতামতের দাম অনেক!

ঠিকে গাড়ী আর কফি এক সাথেই হাজির হল।

আর্থার ম্যালকমের জবানবন্দির পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে শেষ হল কফি খাওয়া। তার পরে অভিবাদন জানিয়ে আমাকে গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন মেহেবুব আলি।

এ যে একেবারে রোথো মার্কা গাড়ী এনেছে! কিন্তু উপায়ই বা কি? এত রাতে অন্য গাড়ী ডাকতে বলাও যে বাতুলতা হবে।

গাড়ীতে সওয়ার হয়ে বাদশাহী চালে হুকুম দিলাম

—চল, রাজা বাজার চৌরাস্তা।

গাড়ী এগোতে সুরু করলে।

সুসানার কথা যে একেবারে ভুলে বসে আছি?

এই তো সন্ধ্যার সময় তাকে কথা দিয়েছি, ফিরতি পথে আবার দেখা করবো, আর রাতের খাওয়াও সেরে নেব তার ওখানে। কিন্তু এত রাতে সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করাও যে বাতুলতাই হবে মনে হয়!

ওই কূটবুদ্ধি আইনজীবীব সামনে বসে নানা কথায় আর অনেক এলোমেলো আবর্তে ঘুরে এক আচ্ছন্ন অবস্থায় এসে ঠেকেছি। এখন কেবলই মনে হচ্ছে, কে কার কড়ি ধারে? আমার তুচ্ছ প্রতিজ্ঞার কড়ি ধবে সুসানা এই গভীব রাত পর্যন্ত বসে আছে না কি? তা থাকলেও আমাকে যে সে-প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্যে এই ছ্যাকড়া গাড়ী হাঁকিয়ে তার কাছে হাজির হতে হবে এব কোনো হেতু নেই। তুচ্ছ কথার খেলাপে এ পৃথিবী উলটে যাবে না নিশ্চয়ই!

তাছাড়া এই মুহূর্তটাই তো জীবনেব সবটুকু নয়, এবও আগামী আছে। সুসানাব জীবনেও আগামী কাল আছে, আব সেই আগামী কালের জন্যে আমারও উপযুক্ত কৈফিয়ৎ আছে তাব কাছে!

তাছাড়া, সুসানা তো সেই মেয়েমানুষদেরই একটি—আমরা যাদের নিরন্তর কথার মায়া-জালে ভুলিয়ে রাখি। নকল আব্দার, মেকি অনুনয়ের কৌশলে, নির্বিচারে যারা আমাদের কথা মেনে নেয়! তাই আমার পথ-চেয়ে-বসে-থাকা কোনো এক সুসানাকে নিশ্চিন্তে মন থেকে হটিয়ে দিতে পাবি এখন।

এই তো কড়েয়ার আঁকাবাঁকা পথ ধরে অপূর্ব শব্দের তরংগ তুলে ছ্যাকড়া গাড়ী এগিয়ে চলেছে! এ গাড়ীর চাকায় লোহার হাল মারা। গাড়ীর ভেতরে তাই নির্মম ঝাঁকুনি, আর বাইরে কর্কশ শব্দের উৎকট মাতামাতি! হ্যাঁ, এই জন্যেই কুক্ কোম্পানীর গাড়ীগুলো এত পছন্দসই ঠেকে! খাসা রবারের হাল-আঁটা চাকা, এতটুকু ঝাঁকুনি নেই, শব্দও নেই—বাছাই করা ঘোড়া ওদের; তাই বিদ্যুত বেগে গাড়ী ছুটে যায়, আর সেই সংগে ঘোড়ার পায়ের শব্দে পথ গম্‌গম্ করে ওঠে। পথচারীরা কেমন এক সম্ভ্রম-মেশা চোখে তাকায় সওয়ারির দিকে!

কিন্তু এই রোখো গাড়ীতে বসে আরামের চিন্তাও যে বাতুলতা! না, কোনো আত্মসুখকর চিন্তারও দরকার নেই এখন। এই তো হাতেই আর্থার ম্যালকমের জবানবন্দির নকল রয়েছে, নিম্ন আদালত যাকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছে, আমরা শত চেষ্টায় যার বনেদ থেকে একটি ইটও খসিয়ে নিতে পারিনি! তাই আইনের ধারালো ছুরি দিয়ে এখন সেই জবানবন্দিকে ফালা ফালা করে কেটে ফেলার আশায় আপীল রুজু করতে উদ্যত হয়েছি আমরা। এই নকলেব বয়ান খুঁটিয়ে পড়ে নিতে হবে আমাকে। তার পরে এরই বিপক্ষে এক জোরালো মত খাড়া করে দিতে হবে, কারণ আমার মত কৃতী মানুষেব মতের মূল্য দেন মেহেবুব আলি!

কিন্তু এও এক ভুয়ো উক্তি তাঁর! আইনের ব্যাপারে আমাব মতামতের কোনো দামই নেই। এ কেবল মক্কেল খুশী করার জন্যেই মিঠে বুলি বলেছেন আলি সাহেব! তিনিও ব্যবসায়ী মানুষ, তাই ভাল করেই জানেন যে, তোয়াজে মক্কেল টাকা জোটায়। আর টাকাই তো হল জীবনের পবমার্থ!

এই গেল একদিক, এব অপর দিকও একটা আছে কিন্তু! সেই অপর দিকে এ মামলায় ঘাটতি অনেক, অনেক মাল-মশলার ঘাটতি—তাই আমার মতামত আদায় করে নিজের দায়িত্ব হালকা কবতে চান মেহেবুব আলি। আইন-অনভিজ্ঞের মতামত তাই এত মূল্যবান হয়ে উঠেছে আজ তাঁর কাছে!

এ ধরণের মনোভাব গজিয়ে ওঠা মেহেবুব আলির পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়!

কিন্তু বদরিকা?

তার এই অহেতুক দুর্ব্যবহারের হেতু কি? আর তাৎপর্যই বা কি থাকতে পারে এর!

না কিছুই নেই এর পেছনে···একেই মানুষ স্বভাব বলে!

সেদিন কি নিদারুণ অভাবের তাড়নায় পংগু বদরিকা; শুধু বন্ধুত্বের খাতিরেই বিনা দ্বিধায় তার মামলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে

নিয়েছিলাম। তাই তো সেদিন সে বলতে পেরেছিল, তার ইমান ঠুনকো নয়!

আজ সে ইমান ঠুনকো হলেও কোনো ক্ষতি নেই বদরিকার। কথার খেলাপে আজ তার কিছুই যায় আসে না! তাই এই অর্থহীন, তাৎপর্যহীন ব্যবহারে কোনো কুণ্ঠা নেই তার।

কিন্তু হীরাজুলি এস্‌টেট? তার আয়ের অধিকারটুকু শক্ত মুঠোয় ধবতে পারলেই যে সারা জীবনের হিল্লে হয়ে যায় বদরিকার! কিন্তু বদরিকা যে বদবিকাই—তার জোড়া নেই এ সংসারে! আকাশ বৃত্তির পুঁজি নিয়ে কারবার তার। হাড়ে মজ্জায় তার এ-ব্যাধি সেঁধিয়ে গেছে, তাই পাকাপোক্ত কিছুই করা সম্ভব নয় তাব পক্ষে!

কিন্তু এ বিবাদ বাধিয়েই বা তার লাভ কোথায়? অমিতাভ চাটুয্যে তার মুখাপেক্ষী নয়; হীরাজুলি এস্‌টেটে তার লোভও নেই কিছুমাত্র। তবু এই বিবাদই বদরিকার জীবনে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে আজ!

এদিকের পথ যেন আরো বেশী অসমতল ঠেকে! চাকাব কর্কশ শব্দও তাই ক্রমেই বেড়ে উঠছে! মেরামতেব যত্নবঞ্চিত পথে গাড়ীর ঝাঁকুনি তো বাড়বেই!

জানলার খড়খড়িগুলো গাড়ীর ফাঁকা দেওয়ালের ভেতরে নিদারুণ দোল খাচ্ছে আর অসহ্য শব্দ তুলছে। ওগুলোকে কিন্তু টেনে জানলার খাপে এঁটে দেবার পথ নেই; মেয়ে সওয়ারি নেই গাড়ীতে! তা থাকলে অবশ্যই খড়খড়িগুলো তুলে দিতাম জানলাব খাপে খাপে, শব্দের হাত থেকে কিছুটা রেহাই অন্ততঃ পাওয়া যেত!

এই শব্দময় গাড়ীতে কোনো স্ত্রীলোক নেই; অমিতাভ চাটুয্যে একাই আর্থার ম্যালকমের জবানবন্দি হাতে নিয়ে বসে আছে; নানা এলোমেলো চিন্তা তাকে ব্যস্ত করেছে। যা ইচ্ছে হয় সে ভাবুক, তাতে কোনো ক্ষতি নেই…………সুসানার কথা ভাবলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সারা দেহে ঝাঁকুনির পীড়া, আব

গাড়ীব লোহার হালমারা চাকাব শব্দ মাথায় যে হাতুড়ির ঘা দিয়ে চলেছে !

গাড়ীটাও নেহাত পুরোনো তাই পথে বেরোবাবই অযোগ্য ; কোনো স্বস্তি নেই এতে বসে—সুখ নেই, তৃপ্তি নেই, পথ চলাব যত কষ্ট আছে এই মুহূর্তে গাড়াটা যেন তারই প্রতীক হয়ে উঠল। এর চাল-চলন যেন বদবিকার চালের মতই খাপছাড়া আতিশয্যে ভরা ! কিন্তু কি এমন পীব-পয়গম্বর হয়ে উঠেছে বদরিকা যে, এই কণ্টক-আসনে বসে তার কথা ভাবতে হবে আমাকে ?

চুলোয় যাক বদরিকা !

তাকে নিয়ে মাথা গরম করার দরকার নেই।

এই অসহ্য ঝাঁকুনির মধ্যে সুসানাকে টেনে এনেই বা লাভ কি ? না, লাভও নেই, যুক্তিও নেই তাতে !

এই তো আজ সন্ধ্যায় তার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এখনও অপূর্ণ রয়েছে ! তাই সুসানার চিন্তাও এখন মোটেই সুখকর নয়।

কিন্তু অনেক মাদকতা আছে তাকে নিয়ে !

এই তো আজই বিকেলে দেখা হল, লম্বা ঝুলেব একটা জোব্বা না কি যেন তাব পবনে—সারা মুখে তৃপ্তিমাখা, চোখে বুদ্ধিব দীপ্তি ঝলমল করছে !

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম

—জামাব ঝুল এত লম্বা হল যে হঠাৎ ?

সে অপ্রস্তুত হয়ে বললে

—কই, লম্বা কোথায় ? এ তো রোজ-দিনের পোষাক আমার।

তার পরে কি যেন ভেবে সুব বদলে হাসতে হাসতে বললে

—তোমার জন্যেই !

আমি জিজ্ঞেস করলাম

—তাই নাকি ? আমাব অপরাধ !

সুসানা বললে

—অনেক।

—ও যে ফাঁকির কথা সুসানা, কারণের সংখ্যা যখন শূন্যের অংকে পেঁছয়, তখন 'অনেক' দিয়ে তাকে ঢাকা দেবার কায়দাটা নতুন নয়, তাই না ?

তার ঠোঁটের কোণে শুধু হাসির ঝিলিক খেলে গেল, সে জবাব দিলে না।

আমি বললাম

—ও হাসিরও মানে জানি আমি !

সে জিজ্ঞেস করলে

—কি মানে ?

স্বর ভারী করে আমি বললাম

—ও হল সবজান্তার হাসি। অজ্ঞতা লুকোবার জন্যে সময়ে সময়ে ভারি কাজে লাগে ও হাসি ; আবার অনেকের জীবনে ও হাসির দামও অনেক !

সুসানা জিজ্ঞেস করলে

—কার ?

তার উজ্জ্বল চোখ দুটোর দিকে আমি তাকালাম, মনে হল তার ঠাণ্ডা চোখেও আগুন লুকোনো আছে। হাসবার চেষ্টা করে আমি বললাম

—কার আবার।

তার চোয়ালের হাড় দুটো দৃঢ় হল, সে জিজ্ঞেস করলে

—সেই কথাই তো জানতে চাইছি তোমার কাছে !

শান দেওয়া বুদ্ধির চমক ছিল তার প্রশ্নের আড়ালে। নিজের দুর্বলতা গোপন করে আমি বললাম

—অন্যের কাঁধে নিজের বোঝা চাপিয়ে বুঝি হালকা হতে চাও ?

সে বললে

—নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছ তুমি ; আমিও তাই ঢাকা পড়ে যাচ্ছি তোমার চোখে।

কথা শেষ করেই সে হাসতে লাগল ।

আমি বললাম

—এ বদনাম শত্রুও যে দিতে পারে না আমাকে!

—বন্ধুর দিতে তাই বাধা নেই অমিতাভ!

নিজেকে শক্ত করে জিজ্ঞেস করলাম

—কি বলতে চাও তুমি?

সে সহজ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার মুখে, তার পরে বললে

—তুমিই যে নিজেকে লুকিয়ে রাখ আমার কাছে!

কোনো ঢাকা-ঢাকা নেই, সরল কথা তার। কিন্তু কি-ই বা লুকিয়ে রাখার আছে? ওই হীরাজুলি এস্টেটের তুচ্ছ মামলা, আর বদরিকার সাথে হৃদ্যতা আমার—এইটুকুই তো শুধু গোপন আছে তার কাছে!

জীবনের গোড়ার দিকের অধ্যায়গুলোর আর দাম নেই—একদিন অমূল্য ছিল সেই সব স্মৃতি; প্রাত্যহিকতার টানা-পোড়েনে আজ আর তা শ্রেণীবদ্ধ নেই, হয়তো আমারই অবজ্ঞায় স্থানভ্রষ্ট হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া সেদিন আর এদিন! নিজের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় ভাবি, কোন আবর্তের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে আজকের এই ডাঙায় এসে লেগেছি? এখানেও কিন্তু শান্তি নেই; এখানে বদরিকা আছে, তার চাতুরি-ভরা চোখে তাকিয়ে সে বারবার জিজ্ঞেস করছে—তেজী না মন্দী? বাঁধা-ধরা রাজপথ, না গলিঘুঁজি?

আবার ঘুরে ফিরে সেই বদরিকার কথায় এসে পড়লাম? সুসানাকে তার কথা জানাইনি এই খেদের জন্যেই কি তার কথা এত বেশী করে ভাবছি?

বদরিকা যদি অজ্ঞাতই থেকে যায় তার কাছে তাতেও তো কোনো ক্ষতি নেই।

শব্দময় গাড়ীতে বসে হঠাৎ নিজেকে কড়া সওয়াল করলাম

—তা না হয় হল! কিন্তু বদরিকাকে নিয়ে তোমার এই লুকোচুরির কারণটাই বা কি অমিতাভ?

জবাব মেলাব আগেই গাড়ীব চাকাগুলো কর্কশ শব্দ করা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম; এতক্ষণে সমতল পথের সন্ধান মিলল তাহলে!

তবু কিছু শব্দ আছে। লোহাব হালের জন্যেই এ বিপত্তি! রবারেব চাকাওয়ালা কুক্ কোম্পানীর গাড়ীতে এ শব্দও হয়না! তাই অনেক আবাম আছে ওদেব গাড়ীতে।

কিন্তু এই সামান্য আবামে আসল কথা থেকে হটে এলে চলবে না। দ্বিগুণ জোবে তাই আবাব সওয়াল করলাম

—অমিতাভ, তোমাব এই লুকোচুবিব হেতুটা কি?

আড়ম্বর দেখে নিজেবই হাসি এল! তবুও কঠিন গলায় জবাব দিলাম

—দেখতে পাচ্ছনা, তোমার আগাগোড়াই যে ঢাকা থেকে গেছে নিরীহ ওই স্ত্রীলোকটিব কাছে!

আগাগোড়া?

না এও যে ভুল কথা, এও তো সত্যি নয়! তাই এক ছিদেমও দাম নেই এর।

সহজ বুদ্ধিতেই তো দেখতে পাচ্ছি, বিশাল এই পৃথিবীতে কোন কিছুই পুরোপুবি ঢাকা নেই! এর কিছু জ্ঞাত, কিছু অজ্ঞাত। তবু এই অসম্পূর্ণতার সম্পদ নিয়েই তো আদি অনাদি কাল থেকে সন্তুষ্ট মনে পৃথিবী নিজের চারিধাবে পাক টেনে চলেছে? এই যে সংখ্যাহীন এত মানুষ, এবাও যে আধা-সত্যের জ্ঞানেই তৃপ্ত!

কিন্তু কেন এই তৃপ্তি?

এরও জবাব মিলেছে এই জগতেব কাছেই। এব অর্ধেকটুকুতে আলো, বাকীটুকু অন্ধকাব। আগাগোড়া আলোও নয়, অন্ধকাবও নয়। তাই ও কথার দাম দিতে মন সরে না। এই তো আধা-জানা এক অমিতাভকে নিয়ে সুসানা তার দিন কাটিয়ে চলেছে, আর আধা-জানা এক সুসানাকে নিয়ে অমিতাভ! তাই বলে কি তাদের মধ্যে আকর্ষণ নেই? আছে, অনেক তৃপ্তি, অনেক অতৃপ্তি নিয়ে এই প্রেম!

কিন্তু বদরিকা যে আধা-সত্যের জ্ঞানে তৃপ্ত নয়? সে জীবনের সবটুকু জেনে নিতে চায়; ভাগ্যকে খুঁজে বেড়ায় বদরিকা। বর্ষনোম্মুখ আকাশের নীচে পথের মাঝে গাড়ী দাঁড় করায় সে; উসমানির ফবাশে পাশার ছক বিছিয়ে ভাগ্যের অন্ধিসন্ধি জেনে নিতে চায়—জীবনকে মুঠোর ভেতবে ধরে রাখতে চায় বদরিকা!

তবু কি-ই বা জুটেছে তাব বরাতে? ভাগ্যের কোনো কিনারাই হয়নি, আর কোন কালেও তা হবেনা! কেবল পথের মাঝে চলন্ত গাড়ী দাঁড় কবানই সাব হবে। ভাগ্যের খেলায় ফাঁকি নেই··· জীবনের কোথাও যে এতটুকুও ফাঁক নেই···এ মূঢ়তার দাম দিতেই হবে বদবিকাকে!

আব হিমিদি?

অন্ধকাব সেই শীতেব বাতে হিমিদি চাপা গলায় ডাকলে

—অমি?

—কি!

—শীগ্‌গিব গাড়ী দাঁড় কবাতে বল ওদের! এই খোয়া-ওঠা পথে লোহাব হাল-আঁটা গাড়ীর চাকা যে সহবের সব ঘুমন্ত লোককে জাগিয়ে দেবে; দাঁড় করাতে বল গাড়ী এখুনি।

চাপা গলায় আমি বললাম

—এখনও যে অনেক পথ বাকী হিমিদি!

সে বিবক্ত হল, বললে

—হেঁটে যাব, আর গাড়ীতে নয়।

—জিনিষপত্তর?

—জিনিষ নিয়ে গাড়ী স্টেশানে যাক। আমরা অন্ধকার ওই বাগানের পথ ধরি, কেউ দেখতে পাবে না তাহলে।

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম

—যদি খোয়া যায় জিনিষ?

—তাতেই বা দুঃখ কি? দেখলিনে, সব কিছুই পেছনে পড়ে রইল আমাদের!

—সে কথা ঠিক!

হঠাৎ বিরক্ত হয়ে হিমিদি বললে

—কিচ্ছু ঠিক নয়…এখুনি গাড়ী থেকে নেমে পড়…নিশুত রাতে উৎকট শব্দ-তোলা গাড়ীতে আর যাব না আমি।

কোচম্যানকে গাড়ী দাঁড় করাতে বললাম।

গাড়ী দাঁড়াল; নেমে দরজা খুলে দিলাম। হিমিদিও পথে নামল।

ওপর থেকে গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করলে

—ইস্টিশান যে অনেক দূর এখান থেকে, কম করে কোশ খানেক পথ; গাড়ী ফিরে যাবে না কি?

আমি বললাম

—না, ফিরবে না। তোমরা জিনিষগুলো নিয়ে স্টেশানে এগিয়ে যাও; ঝাঁকুনিতে শরীর খারাপ হয়েছে। আমরা পেছনেই আছি—ভয় নেই তোমাদের।

কুয়াশা-ভরা অন্ধকারে রাতের জড়তা ভাঙিয়ে লোহার হাল-আঁটা ঠিকে গাড়ী অদৃশ্য হল। কিন্তু চাকার কর্কশ আওয়াজ ভারী হিমেল হাওয়ায় ভেসে রইল অনেকক্ষণ। তার পরে এক সময়ে তাও মিলিয়ে গেল।

হিমিদি চাপা গলায় আবার ডাকলে

—অমি?

—কি?

—এত কি ভাবছিস বল তো?

—কিছু না, কি আর ভাবব বল!

সে কাছে সরে এসে বললে

—অমি তুই কথা লুকোচ্ছিস আমার কাছ থেকে?

আমি বললাম

—না, কথা লুকোতে যাব কেন ?

সে খানিক চুপকরে রইল, তার পরে বললে

—তা যে হয় না অমি ! এত বড় অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে ভাবনাকে কি কেউ ফাঁকি দিতে পারে ? কি ভাবছিস বল আমাকে !

অনিশ্চয়তাব কথা শুনে বুক আবার দুরদুব করে উঠল। হিমিদির দিকে ফিরে দেখলাম, কিন্তু অন্ধকাবে সব কিছুই আবছা ঠেকে। হঠাৎ মনে হল, এই রাতের চেয়ে গাঢ়তব অন্ধকাব এক অনিশ্চয়তার দিকে আমবা পা বাড়িয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে কিন্তু সহজ গলায় বললাম

—আমাদের কথাই ভাবছি হিমিদি।

—কি কথা রে ?

—এই যে বাডী ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমবা।

—তোর বুঝি ভয় কবছে ?

আমি বললাম

—না, বেরোবার আগে ভয় ছিল, এখন আর নেই।

কথা এগোলো না আব, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আমবা কিন্তু অন্ধকার ভেঙে এগিয়ে চললাম, কাবো মুখে কথা নেই, শুধু মনের ভেতরে অনিশ্চয়তা দানা পাকিয়ে উঠছে।

প্রগাঢ় অস্বস্তি কাটিয়ে হিমিদি বললে

—আর কি ভাবছিস তুই ?

হিমেল হাওয়ায় তার চাপা স্বরও থমথম করে উঠল। খোয়া-ওঠা অসমতল পথ ছেড়ে আমরা তাড়াতাড়ি বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

অজস্র জোনাকির টুকরো টুকরো আলো বাগানের অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে ঘুরছে। গাছের অস্পষ্ট বহিরেখা ছাড়া আর কিছুই ঠাহর হয় না চোখে। গাছের পাতায় জমা শিশির বিন্দু চুঁইয়ে গাছের তলায় শুকনো পাতার ওপরে পড়ার শব্দও কানে আসে কখনো

কখনো : স্তব্ধতা আর অন্ধকার যেন পরস্পরকে মৌন আলিংগনে জড়িয়ে নিয়েছে এখানে।

হিমিদি বললে

—চুপ করে রইলি যে ?

আমি বললাম

—কাল সকালে কি ঘটবে তাই ভাববার চেষ্টা করছি হিমিদি।

—বড় জ্যেঠিমার কথা তো ?

—হ্যাঁ, সকলের কথাই ভাবছি ; মা, শুভোকাকা, ক্ষীবিকাকী··· সকলের কথাই !

হঠাৎ জড়তা কাটিয়ে সে বললে

—মায়ের কথা ভেবে লাভ কি ? অমন নিষ্ঠুর মেয়ে মানুষের কথা না ভাবাই ভাল !

প্রতিবাদের সুরে আমি বললাম

—তবুও ··

কিন্তু কথা শেষ করতে দিলে না সে, বিরক্ত হয়ে বললে

—চুপ কর, আমার কথার ওপরে কেন কথা বলিস তুই !

পায়ে চলার পথ আঁকাবাঁকা গতিতে এগিয়ে গেছে বাগানের মধ্যে দিয়ে। অন্ধকারে সেই পথ-রেখার অনেকখানি চোখে পড়ে। কনকনে শীত আর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা যেন এক সাথে মিশে এই পথের রূপ নিয়েছে ; এর আকৃতি নেই, শেষ নেই, আরম্ভও বোধ হয় জানা নেই আমাদের। অশরীরী প্রেতের দল বুঝি জোনাকির আলোয় ভ্রূকুটি হেনে জটিল ভবিষ্যতের কথা মনে করিয়ে দেয়! চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত বাতাস শুকনো পাতায় ছড়িয়ে পড়ে বুকের ভেতরটাও হিম করে দিলে।

হিমিদিও ভয় পেয়েছিল, আরো চাপা গলায় সে কথা কইলে,

—তুই আমার ওপর রাগ করলি অমি ?

অস্বস্তি কাটিয়ে জবাব দিলাম

—তুমিও ভীষণ নিষ্ঠুর হিমিদি !

সে কাছে টেনে নিলে আমাকে, কাঁধে হাত রেখে বললে

—তাই বুঝি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাস তুই ?

কি বা জবাব আছে এর ! সে কি সত্যিই জানে না যে তাকে ছেড়ে দূরে চলে যাবার কোনো ক্ষমতা নেই আমার ? এই তো তার স্পর্শে শীতের নিষ্ঠুর হাওয়া আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা দূরে সরে গেল। তার মনও স্পর্শের আনন্দে মধুময় হয়ে উঠেছে, অনিশ্চয়তার মধ্যেও তাই আমরা অন্ধকার ভেঙে এগিয়ে যেতে পারছি।

এক ফাঁকে মনের সব ঘোর কেটে গেল, যেন ভয়কে আমরা জয় করে নিলাম ! কালের মধ্যে দিয়ে অফুরন্ত পথ চলে কালান্তরের কাছে এসে পৌছলাম এক সময়ে—যেখানে নতুন সম্ভাবনায়, নবতর চেতনায় মানুষের কাছে মানুষ প্রতি নিয়ত প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়ে উঠেছে : সেই কালান্তরিত যুগের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক দুঃখ-জয়-করা হাসি হেসে হিমিদি যেন বলছে

—এই দেখ অমি, আমাদের কোনো কষ্ট নেই, কোনো উদ্‌বেগ নেই—কোনো যাতনাও নেই আর।

এই ভাবরাজ্যে কত সময় কেটে গেল কে জানে ! হিমিদি আমার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিতে চমক ভাঙল।

সে চাপা গলায় আবার বললে

—আমার কিন্তু কোনো দুঃখ নেই, কোনো অনুশোচনাও নেই।

—আমারও নেই হিমিদি !

—সমাজকে ভয় করিসনে তুই ?

খানিক ভেবে আমি বললাম

—করি, সমাজে থাকতে হয় বলেই ভয় করা !

হালকা সুরে হিমিদি বললে

—আমি কিন্তু একটুও ভয় করিনা, ভুয়ো নিয়মে গড়া সমাজ… ভয় করতে যাব কোন দুঃখে ?

হালকা এই মতের আড়ালে কিন্তু তার ভয়ই লুকিয়ে ছিল ; একজনের মতবাদ কোনো নিয়মকেই উড়িয়ে দিতে পারেনা,

ভুয়ো হলেও নিয়মের বেড়া-জালেই তো আটকা পড়ে আছে সমাজ !

এই দুঃসাহসিক পথ বেছে নেওয়ার কথাই আমাদের মনে নিরন্তর যাওয়া আসা করছিল, এ প্রশ্ন থেকে হটে যাওয়ার উপায়ই বা কোথায় ? দুর্ভাবনায় দিশাহারা হয়েই হিমিদি ডাকলে

—অমি

—কি বলছ হিমিদি ?

—তুই ভেবে দেখেছিস একবার, আজ থেকে ঘর নেই, আশ্রয় নেই আমাদের। অন্ধকার আমাদের যেমন করে ঘিরে ধরেছে এখন আমরাও অনিশ্চয়তাকে ঠিক অমনি ভাবেই আঁকড়ে ধরেছি।

—তা জানি হিমিদি।

সে চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল, তার পরে বললে

—এই অল্পটাকার পুঁজি শেষ হবে একদিন।

আমি বিচলিত হলাম না, সহজ ভাবেই বললাম

—তাও জানি !

—তখনকার কথা ভেবে দেখেছিস একবার ?

তেমনি ভাবেই আমি বললাম

—না।

চলা বন্ধ করে হিমিদি অবাক হয়ে দাঁড়াল, বললে

—তুই কিরে অমি ! এতবড় বিপদের কথা ভাবিস নি এখনও, দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস ?

ওকথায় কান না দেওয়ার ভান করে আমি বললাম

—এগিয়ে চল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মত সময় নেই আমাদের।

বিরক্তি ফুটল তার গলায়, সে বললে

—আমার কথার জবাব দে আগে, নয়তো এক পা-ও নড়ব না আমি।

আমি বললাম

—জবাব খুবই সোজা, একটু ভাবলে নিজেই বুঝতে পারবে।

অনিশ্চয়তার কোনো রূপ নেই, আকার নেই, আর কিনারাও নেই, প্রতিপদে মানুষকে এর সংগে লড়াই করে এগোতে হয়।

হঠাৎ সে দুঃসহ রাগে জ্বলে উঠে বললে

—কি দিয়ে লড়াই করবে মানুষ?

আমি বললাম

—সাহস দিয়ে, আর কোনো হাতিয়ার নেই!

সে চড়া গলায় ধমক দিয়ে বললে

—এ সব ফাঁকা কথা শিখলি কোথায়? তোকে মানা করে দিচ্ছি, ওই বাজে কথাগুলো আমাকে শোনাতে চাসনে কোনো দিন।

যেটুকু সাহস এতক্ষণে জমা হয়েছিল, এক ফুৎকারে তা নিবিয়ে দিলে হিমিদি। আবার উত্তপ্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করলে

—সাহস আসবে কোথা থেকে? নির্ভর করার মত কি-ই বা আছে, টাকার নির্ভরতা চাই! কোথায় সে জোর আমাদের?

নিজের সামান্য পুঁজিটুকু হাতে নিয়ে বেরিয়েছি। হিমিদির তহবিলের কথা জানা নেই, আর তারই বা আয়ু কতটুকু? হিমিদি আমার সংগে আছে সে-ই আমার সাহস, সে-ই তো সম্বল! সাহসে ভর করে বললাম আমি

—তুমি দেখে নিও, সব কিছুই ঠিক করে নেব আমি। সাহসের কোনো অভাব নেই আমার।

হিমিদি বললে

—কি ঠিক করবি। কে সাহায্য করবে? কি শক্তি আছে—সম্বলই বা কতটুকু আমাদের?

সত্যিই তো, কতটুকুই বা শক্তি আর কি অকিঞ্চিৎকর সম্বল দুজনের! শুধু অনিশ্চয়তার বিরাট পুঁজি সম্বল করে এগিয়ে যেতে হবে; ঘর নেই, স্থিতি নেই, কারো আশীর্বাদও নেই···পরিচিত মানুষের ক্রূর দৃষ্টি এড়িয়ে, সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতের মধ্যে এগিয়ে যেতে হবে। উন্মুক্ত পথের আশ্রয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকাই হবে শুধু সম্বল আমাদের।

এই তো চোখের সামনে দিয়ে ভাবনার একটা মিছিল এগিয়ে চলেছে…শুধু ভাবনারই নয়—যুগ যুগান্তের অতিকায় এক মিছিল, অগুনতি মানুষের মিছিল, সময়ের মিছিল, আশার মিছিল, উন্মাদনার মিছিল—মূঢ়তার মিছিল! একই ধারায় নানা স্রোত এসে মিশেছে, কিন্তু লক্ষ্য একই! এ মিছিলেরও দিশা নেই, সময়ের ভ্রূক্ষেপ নেই—এ কালেরও মুখাপেক্ষী নয়! এ জরাকে গ্রাহ্য করে না, মৃত্যুকেও স্বীকার করে না। আদি-অনাদি কালের সংগে একে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়, এর জীবনে থমকে দাঁড়াবার কোনো নির্দেশ নেই। এই যুগপ্রসারী গতির মিছিলে হিমিদিকে সংগে নিয়ে নিজের অজ্ঞাতে কখন ঢুকে পড়েছি; তাকে পথ চিনিয়ে সংগে নিতে হবে, ক্লান্তিতে আশ্বাস দিতে হবে, তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে—এই তো তোমার কাছেই আছি হিমিদি!

বহুকালের জন সমাগমে পুষ্ট মিছিল, এর প্রাণ আছে, এর ভাষা আছে, সেই ভাষার অস্ফুট শব্দ কানে এসে পৌঁছেছে; দীর্ঘ কালের নানা বৈচিত্র্যে ভরা শব্দ, মানুষের সুখ দুঃখের কথা, সময়ের ক্ষিপ্রতার ধ্বনি—এক সাথে মিশে অস্ফুট গুঞ্জন তুলেছে··আমরা কান পেতে আছি, যদি ওই গুঞ্জনের এক টুকরো ছেঁড়া কথাও যোগাড় করে নিতে পারি! তাই একমুখী হয়ে উঠেছে মন, ওই বিশালতার দিকে তাকিয়ে আছে আমাদের একমুখী দৃষ্টি। বোবা মন আর বোবা চোখ ওই বিশালতার দিকে তাকিয়ে আরো বোবা হয়ে গেছে। তাই তো পরস্পরকে কাছে টেনে নিয়েছি আমরা, আঁকড়ে ধরে আছি একে অপরকে; নিজেদের সাবধান করে দিয়েছি বারবার—এ বাঁধন শিথিল করো না যেন, একের আকর্ষণে অপরকে নির্মম ভাবে টেনে রাখ, দেখছ না গতির ওই বিশাল স্রোতে অগুনতি ঘূর্ণির গহ্বর আছে? বাঁধন শিথিল হলেই তলিয়ে যেতে হবে, একের কোনো চিহ্নই থাকবে না আর অপরের কাছে।

আতংকের চেতনায় সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি চোখের পাতা দুটো এঁটে দিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই

আকর্ষণের সুতোয় টান পড়ল; চোখ মেলে দেখলাম হিমিদি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে—অন্ধকারে শুধু তার দেহের বহির্রেখাটুকই দেখা গেল—সেখানেও কিন্তু সে রহস্যময়ী!

চাপা গলায় আমি ডাকলাম

—হিমিদি?

—কি বলছিস?

—তুমি কথা কইছনা যে, ভয় করছে বুঝি?

বোজা বোজা গলায় সে বললে

—বড় ক্লান্তি! শীতেও শরীব অবশ হয়ে এল।

কাঁধেব ওপরে তার একখানা হাত তুলে নিয়ে বললাম

—কোনো ভয় নেই, আমি আছি তো! কাঁধে ভব দিয়ে চল, পথও বাকী নেই আর।

এই সান্নিধ্যটুকুতেই অনেক তৃপ্তি, অনেক আরাম···তাবই স্বাদ নিয়ে এগিয়ে চললাম দুজনে।

—হিমিদি?

—কি?

—কোথায় যাব আমবা?

—আমি তো কিছু ঠিক কবিনি, যেখানে নিয়ে যাবি তুই!

—কলকাতায়?

—তাই ভালো!

—কিন্তু উঠব কোথায়?

—কোথায় উঠতে চাস তুই?

—একেবারে অচেনা দেশ....শুনেছি কালীঘাটে পাণ্ডাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া যায়!

—যায় বটে, তবে ওদের আশ্রয়ে ভয় আছে!

—তবে?

কি যেন ভাবলে খানিক হিমিদি, তার পরে বললে

—অনেক হোটেল আছে কলকাতায়; আমার কর্ত ওই সব হোটেলে ফূর্তি করতে যান।

—ঠিকানা জান তুমি ?

—ভেবে দেখতে হবে।

—তাই ভাল, হোটেলেই উঠব আমরা !

—হ্যাঁ, তাই হবে।

—তোমার কর্তার সংগে যদি দেখা হয়ে যায় !

—তুই বাড়ী ফিরে যাবি।

—আব তুমি ?

—মেয়ে মানুষের সে পথ বন্ধ....চিরকালের জন্যে তাদের কাছে বাড়ীর দবজা বন্ধ হয়ে যায় এভাবে বাড়ী থেকে একবার বেবোলে !

অনিশ্চয়তা যেন আবাব কঢ় চোখ মেলে তাকালে আমাদের মুখে। হিমিদিও অন্যমনস্ক হল, আর কথায়ও ছেদ পড়ে গেল তাই।

আদি-অনাদি কালের মিছিলে নির্বাক হেমাঙ্গিনী চক্রবর্তী আব অমিতাভ চাটুয্যে ঢুকে পড়ল; অনিশ্চয়তা আবার তাদেব বোবা করে দিলে।

ওপবে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে কখনো বা টুকবো আকাশ দেখা যায়, আবাব ঘন পাতাব রাশি দৃষ্টিও রোধ কবে কখনো। বাগানেব অন্ধকারে অজস্র জোনাকিব মেলা, আর ওপবে টুকরো আকাশের গায়ে রাত-জাগা তাবা জ্বলে ! সামনে গাছের আঁকাবাঁকা গুঁড়িগুলোর ফাঁকে রেল স্টেশানের ম্লান কেরসিনেব আলো দেখা যায়, চকিতে তা ঢাকাও পড়ে আবার। বেশী পথও বাকী নেই, একটা বাঁক ঘুরেই শেষ হবে বাগানের সীমা—তার পরে রেল লাইনের কোল ঘেঁষে অল্প এগোলেই স্টেশান।

হিমিদি কথা কইলে, তার স্বরে ক্লান্তির আভাষ নেই এখন, সে ডাকলে

—অমি !

আমি জবাব দিলাম

—বল!

—কেন ঘর ছেড়ে পথে বেরোলাম সে কথা তো তুই জানতে চাইলিনে?

—তার কারণ জানি যে।

—কি জানিস?

—ক্ষীরিকাকী যে তোমাকে আবার শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে চাইলেন!

খানিক চুপ করে রইল সে, তার পরে জিজ্ঞেস করলে

—শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে এসেছি কেন তা জানিস?

—জানি বৈ কি, তুমিই তো বলেছ!

হিমিদি কি ভাবতে লাগল। তার মনে লুকোনো বাধা আছে তাই বুঝি সে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারছে না। সে-বাধা সহজ করার আশায় জিজ্ঞেস করলাম

—আরো কিছু কারণ ছিল না কি হিমিদি?

হঠাৎ নিজেকে বাধা থেকে মুক্ত করবার শক্তি খুঁজে পেয়ে দৃঢ় হয়ে সে বললে

—ছেলে না হওয়ার অপবাদে ও বাড়ী ছেড়েছি একদিন, আর তারই বিপরীত কারণে পথে বেরোলাম আজ।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম

—কি কারণে?

নিজেকে সংযত করে সে বললে

—যে সন্তানের জন্ম দেব⋯তার বাপ⋯

উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম

—কে, আমি?

সে কোনো জবাব দিলে না শুধু চুপ করে রইল।

মনের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত জ্বলন্ত আগুনের জ্বালা ছুটে গেল। গলার দলা পাকান শ্বাস ঠেলে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম

—আমি?

সে কোনো জবাব দিলে না। তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম

—কে ? আমি নাকি !

এতক্ষণে তার বুকের চাপা শ্বাস বার হয়ে এল, সে বললে

—যে কথা চিরকাল গোপনে রাখব ভেবেছিলাম তা গোপন রইল না আর !

মাথা নীচু করে সে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার পা দুটো যেন হঠাৎ পাথরের মত ভারী হয়ে উঠল। শরীরে শক্তি নেই, ভাবারও ক্ষমতা নেই এতটুকু।

এ কথা আমার কাছে আকস্মিক, হিমিদিকেও কিন্তু তা নতুন করে জেনে নিতে হয়েছে ! তার গোপন কথা প্রকাশ হওয়ার সময়ে নতুন করেই সে রূঢ়তা তাকে ছুঁয়ে দিয়েছে !

নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে সে বললে

—তোকে কষ্ট দিলাম অমি ?

—না, এতে আর কষ্ট কি !

—বাড়ীতে আর একদিনও থাকা উচিত হত না তাই তো তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি। আজ পর্যন্ত যে মায়ের চোখে পড়েনি···তাই আশ্চর্যি !

আমার মুখে কথা সরল না। কিন্তু মনে হল হিমিদি যেন তার সংকোচ দূরে সরিয়ে দিয়েছে, সে বললে

—এ কি দায়িত্ব তোর ওপরে চাপল অমি ?

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই আবার কান্নায় গলা ভারী হয়ে এল তার।

নিজেকে শক্ত করে আমি বললাম

—দায়িত্ব আছে বৈ কি হিমিদি....অস্বীকার করার বয়সও নেই আমার···!

কান্না-ভরা গলায় সে বললে

—অমি, এই অল্প বয়সে বাপ হওয়ার দায়িত্ব তুই বইবি কি করে ?

বুকে সাহস জুটিয়ে আমি বললাম

—দুঃসাহস দিয়ে !

দুঃসহ কান্নায় তার সারা দেহ ভেঙে পড়ল, আমার কাঁধে তার মুখ চেপে অজস্র কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল সে।

সে কান্না কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারলে না, রূঢ় বাস্তব কোনো ভাবোচ্ছ্বাসকেই গ্রাহ্য করে না; তাছাড়া নিষ্ঠুর শীতের হাওয়ায় তার বুকের ভেতরটাও হিম হয়ে এসেছে। আলিংগন ভেঙে সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু কোনো কথা কইলে না—শুধু স্টেশান প্লাটফরমের ম্লান আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলে একবার; তার পরে আপন খেয়ালেই এগিয়ে চলল। শরীরে তার ক্লান্তির চিহ্ন নেই, মনে হল আমার মত সে-ও অনিশ্চয়তার সংগে লড়াই করার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠেছে।

খানিক পরে সে আবার আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল, রূঢ়স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলে

—কি বললি তখন? তোর দুঃসাহস দিয়ে এই দায়িত্ব বইবি?

তার আকস্মিক পরিবর্তনে আমি ভয় পেয়ে আর কথা কইলাম না। সে কিন্তু চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলে

—কি বলেছিলি! মনে নেই সে কথা?

শান্ত স্বরে আমি বললাম

—আছে।

সে আরো রুখো হয়ে বললে

—কোনো দায়িত্ব নেই তোর—তোকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম আমি। তুই শুনে নে, কোনো দায়িত্ব নেই তোর…

আমি প্রতিবাদ করে বললাম

—তুমি নেই বললেই হল না! আমার দায়িত্ব কি তা জানি আমি!

অসহ্য জ্বালায় জ্বলে উঠে সে বললে

—আমাকে নিয়ে তোর কোনো দায়িত্ব নেই; কতটুকু যোগ্যতাই বা আছে তোর এই ভার বওয়ার?

রুখে দাঁড়িয়ে আমি বললাম

—আছে, একশো বার আছে, বাপের অধিকার…

কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝাঁপিয়ে আমার কাঁধের পেশী দুটো শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে সে বললে

—কোনো বাজে কথা শুনতে চাইনে! আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সব দায়িত্ব শেষ করতে হবে; আর কোনো দায়িত্বই থাকবে না তোর।

শিউরে উঠে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম

—কি বলতে চাও তুমি?

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললে

—সংগে যাবার দরকার নেই আর!

ধীরে ধীরে তার শক্ত মুঠো শিথিল হয়ে এল, নিজের খেয়ালেই সে এগিয়ে চলল আবার।

আদি-অনাদি কালের মিছিলে দুটি যাত্রীর বাঁধন শিথিল হল হঠাৎ; স্রোতে অগুনতি ঘূর্ণীর কথা ভুলে গিয়ে নিষ্ঠুর হাতে হিমিদি আমাদের জীবনের দুশ্ছেদ্য বাঁধন ছিঁড়ে দিলে।

শ্রীরামপুর স্টেশানের একটি টিকিট কিনে সেই দূরত্বের তুচ্ছ মাশুল আমি গুনে দিলাম।

ছ্যাকড়া গাড়ীর মধ্যে থেকে ডাক দিলাম

—কোচম্যান?

গাড়ীর সামনের দিক থেকে সাড়া এল

—হুজুর!

লোকটা কোন ফাঁকে গাড়ী থেকে নেমে পড়েছে দেখছি! কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম

না বলে মাঝ পথে গাড়ী দাঁড় করালে কেন?

সে বললে

—লাগাম ছিঁড়ে গেছে হুজুর!

—তোমার লাগাম ছেঁড়ে কেন?

—পুরোনো লাগাম তাই ছিঁড়ে গেছে মালিক!

—তোমার গাড়ীর নম্বর কত?

—আজ্ঞে, দুশো উনোআশী মালিক।

—এত রাতে এ ধরণের হাংগামা বাধালে কি ফল হয় জান? গাড়ী থানায় নিয়ে চল।

লোকটা যে কথা কয়না আর! ভয়েই জবুথবু বুঝি? হঠাৎ কেমন করুণা এসে গেল। বোধ হয় বদ-বুদ্ধি নেই ওর, ব্যাপারটা সত্যিই আকস্মিক! তাই আশ্বাস দিয়ে তাকে বললাম

—আচ্ছা ভয় নেই তোমার, থানায় যেতে হবে না আর।

কোচম্যান খুশী হয়ে বললে

—হুজুর ধর্মাবতার; গরীবের মা-বাপ!

আমি বললাম

—ঠিক আছে! সওয়ারি যেখান থেকে উঠিয়েছ সেখান থেকে রাজা বাজার চৌরাস্তা পর্যন্ত ভাড়া কত?

—রাতের?

—দিনের ভাড়া তোমার কাছে জানতে চায়নি কেউ! রাতের ভাড়া কি তাই বল।

—সাত সিকে; তবে হুজুরের কাছ থেকে দেড় টাকা পেলেই খুশী থাকব!

—বেশ, গাড়ীর দরজা খুলে দাও তাহলে।

কোচম্যান গাড়ীর দরজা খুলে জড়-সড় হয়ে সরে দাঁড়াল এক পাশে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম

—এতক্ষণ ঝাঁকুনি খাইয়ে কোন চুলোয় হাজির করলে?

—পার্ক ষ্ট্রীটের মোড় হুজুর।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছে লোকটা! এই তো পার্কষ্ট্রীট আর সার্কুলার রোডের মোড়। চেনা জিনিষগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। পকেটে হাত চালিয়ে কটা টাকা তুলে তার হাতে ফেলে দিয়ে বললাম

—বক্‌শিস্!

তখনো ব্যাপারটা ধরতে পারেনি, তাই কোচম্যান জিজ্ঞেস করলে

—কাব হুজুর ?

—কাব আবাব ? তোমাব !

কথা শেষ করেই এগোতে সুরু কবলাম, পেছন থেকে সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে

—লাগাম জুড়ে এখুনি গাড়ী আনছি হুজুব !

আমি বললাম

—না আর দবকার নেই গাড়ীব !

এই তো ফাঁকা পথে পায়ে হেঁটে দিব্যি চলে যাওয়া যায় ! লোক জন নেই, হাঁটলে ঠুনকো মান খোয়া যাবাব ভয়ও নেই তাই !...আব পথই বা কতটুকু ? এক মাইল .. দু মাইল... !

গ্যাসের আলোয় নির্জন পথ যেন আমাবই অপেক্ষা কবে আছে ! কথা বলে না, কিন্তু চোখের ইশাবায যেন বলতে চায়—তোমাবই অপেক্ষায় বসে আছি রাজা।

এ যে উসমানিব সম্বোধন ?

তাব কথাই বা কেন ভাবতে সুরু কবলাম এখন ?

এখান থেকে তো অনেক দূবে তাব আস্তানা ! অনেক পথ পেবিয়ে তবে তার ঘবে পৌছম যায় ..তবু তাব কথাই ভাবছি !

তাতেই বা ক্ষতি কি ?

না, কোনো ক্ষতি নেই, এই নির্জন পথটুকু উসমানিব কথা ভেবেই কাটিয়ে দেব !

এই তো তার কথাই ভাবছি—কাব পথ চেয়ে বসে থাকে উসমানি ? কার অপেক্ষায় তার চোখ উদাস হয় ? কি প্রিয় নামে সে ডাকে তাকে ? তাব প্রিয়তমকে কোন গান শোনায় উসমানি ? কে তার প্রিয়তম...? কাব জন্যে তাব আকুল চোখ পলক ভোলে...? 'পল না লাগে মোবা আঁখিয়া পিয়া বিনু'!

কে সেই প্রিয়তম ?

এ কি! আবার বদরিকার কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে সুরু করলাম না কি? তাকে তো দূর করে দিয়েছি মন থেকে! কোনো ঠাঁই নেই, কোনো সম্পর্কও নেই···আর দরকারও নেই তাকে! মামলা চালাবাব জন্যে মেহেবুব আলি আছেন। কড়া লোক তিনি, কোনো কিছুর এদিক ওদিক করবাব উপায় নেই তাঁর কাছে! আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে বদবিকার সংগে....তাব সব কিছুতেই ইস্তফা দিয়েছি।

এই তো পার্কষ্ট্রীট আর সার্কুলাব বোডেব মোড় দেখতে দেখতে পেছিয়ে পড়ল। ফাঁকা পথে নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলেছি; ঠিক এমনি কবেই রাজা বাজার পর্যন্ত যতগুলো মোড় আছে একে একে পেছিয়ে পড়বে। তাব পবে, এই দীর্ঘ পথ উত্তীর্ণ হয়ে রাতের কোনো এক নিঝুম প্রহবে বাড়ীর দরজায় এসে পৌছব। কোনো ক্ষতি নেই তাতে। কারো ক্ষতি বৃদ্ধি জড়িয়ে নেই; কোনো জবাবদিহি করতে হবে না কাবো কাছে··জীবনেব এই সৌভাগ্য নিয়েই তো বেঁচে আছি!

গ্যাসেব আলোব জড়োয়া মালা পরে পথ যেন উসমানির চোখের ইশাবা দেয়। বলে, তোমার অপেক্ষায়ই তো বসে আছি রাজা!

আবার উসমানিব কথা ভাবছি?

হ্যাঁ ভাবছি তার রূপ, তাব পোষাক, তাব বেলোয়ারি চুড়ির গোছা, সায় তাব আলবোলা পর্যন্ত!

উসমানি এখান থেকে কত দূরে থাকে?

অনেক অনেক দূরে!

তবু?

এক মাইল, দুমাইল, তিন মাইল···

হ্যাঁ তাই হবে! তিন মাইল দূরেই বাড়ী তার। সে বাড়ীর দোতালায় টানা বারান্দা আছে। তার ঘরের দরজায় ঝালরদারি

পরদা ঝোলান। তার ফরাশের ওপরে গাঢ় লাল রঙের ফুলদারি গালচে পাতা।

এত রাতে কি জেগে আছে উসমানি ?

এত রাতে কি গান গায় সে !

যদি তাকে এখন গাইতে বলি . ! বলি, উসমানি বিবিজান তোমার সেই গানখানা শোনাবে একবার ? বিবিজান তোমার সেই গানটি শোনাও....!

উসমানি মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করবে নিশ্চয়ই, তার অপূর্ব দেহভংগী সেই সেলামের দ্যোতনা করে উঠবে সংগে সংগে !

তার পরে ?

তার চোখের তারায় রাতের বিস্ময় ফুটিয়ে হয়তো সে জিজ্ঞেস করবে

—কোন গান মেহেরবান ?

যদি বলি···তখন যদি বলি তাকে

—সেই মধুক্ষরা গান তোমার, 'ম্যায়কো না জিয়া না লাগাও শ্যাম গাবি ঢুংগি।'

উসমানির কালো চোখে বিদ্যুৎ খেলে যাবে নিশ্চয়ই।

একি ! যাট বাজার কবরখানার পাশে এসে পড়লাম যে ?

এতকাল পথ চলে শেষকালে এই কবর খানায় এসে ঠেকেছি ; এই কি জীবনের শেষ পরিণতি ?

জীবন আর তার পরিণতির তত্ত্ব আলোচনা করার দরকার নেই ! এই অল্প পথটুকু এগোতে এত যে সময় লেগে গেল এর হিসেব মিলবে কি করে....?

না, এও যে এক অবাস্তব জিজ্ঞাসা থেকে আর এক অবাস্তব জিজ্ঞাসায় ছুটো-ছুটি করছি ! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে মেশা সময়ের আবরণেই তো এ জগৎ ঢাকা রয়েছে ! তাই সময়ের হিসেব

করাও যে এখানে মূঢ়তারই নামান্তর ...! কালোহ্যয়ং নিরবধি···পৃথিবীও বিশাল···! তাই না ?

তবে এই বিশাল পৃথিবীতে মৃত্যুর বিজ্ঞাপন জাহির করে জীবনকে পংগু করার অর্থ কি ? এক চিলতে মাটির ওপর মৃত মানুষদের জন্যে কতকগুলো খেলা ঘর গড়ে জীবনকে খেলো করি কেন ?

এই তো এখন সেই খেলা ঘরেরই বেড়া ধবে দাঁড়িয়ে আছি। এ বেড়া নির্মূল কবে দিতে হবে—এর কোনো চিহ্নই রাখা চলবে না : অখণ্ড জীবন-মিছিলে মৃত্যুব কোনো দাম নেই ··তাই ভুয়ো বিজ্ঞাপনের এক ছিদেম দাম দেবেনা কেউ !

কানেব কাছে ফিস্ ফিস্ করে কথা কয় কে আবার ?

বাজে ভাবনাগুলো গুটিয়ে নিয়ে তখুনি কড়া সওয়াল করলাম

—কে তুমি ?

—চাপা গলায় কি যেন বললে সে। আমার মনে হল, যেন আমি নিজেই অস্পষ্ট স্বরে কথা বলছি···কিন্তু পার্থক্যও ছিল... আত্মবিশ্বাসের পার্থক্য ছিল তাব গলার স্ববে !

তাই ভাবিক্কি চালে জিজ্ঞেস করলাম আবার

—কে তুমি ?

কোন জবাব নেই ; সুব চড়িয়ে বললাম

—কথাব জবাব দাও—পরিচয় দাও নিজের।

এতক্ষণে সে জবাব দিলে

—তোমার সারা জীবনের সেঙাৎ....তোমার মতলব আমি !

চীৎকার করে আমি জিজ্ঞেস করলাম

—কেন এসেছ, কি করতে এসেছ এখানে ?

সে বললে

—কথা কইতে !

—কি কথা ?

প্রাণ খোলা হাসি হেসে সে বললে এবার

—এরই মধ্যে ভুলে বসলে ? তোমার কাছে যে জানতে চাইলাম

সুসানার দুঃখের সামনে দাঁড়িয়ে কার কথা তোমার মনে পড়েছিল ?

নিমেষের মধ্যে সারা দেহে বিষ ছড়িয়ে গেল, রূঢ় হয়ে আমি বললাম

—তুমি নেহাত ছোটলোক। কখন কি বলতে হয় জাননা ? এখুনি চলে যাও এখান থেকে....এক মুহূর্তও দেরী নয় আর। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

এ কি ব্যাপার ?

এ যে আর এক মূর্তি এগিয়ে আসে এদিকে !

এক পলক দেবী না করে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম

তুমি আবার কার বার্তা বয়ে আনলে হে দেবদূত ?

সে বললে

—হুজুর, আমি এস্‌রার।

হঠাৎ চমক ভাঙল। এত রাতে এস্‌বার এখানে কি করে ? এক ঝলক রক্ত ছুটে গেল মাথায়। তাকে জিজ্ঞেস করলাম

—তুমি কি করতে এসেছ এখানে এত রাতে ? কি মতলব তোমার !

এস্‌রার বললে

—মেম সাহেব পাঠিয়েছেন !

—কি চান তোমাব মেম সাহেব ?

—হুজুরকে সংগে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—গাড়ী আছে সংগে ?

—আছে হুজুর !

—কুক্‌কোম্পানীর গাড়ী ?

—হ্যাঁ মালিক !

এস্‌রারের কথায় সত্যিই তৃপ্তি আছে। কুক্‌কোম্পানীর গাড়ীর চাকায় লোহার হাল মারা নয়, তাই ঝাঁকুনি নেই গাড়ীতে; আর কর্কশ শব্দও ওঠে না চলার সময় !

এই ভাল।

বেশ আছি! মন থেকে সমস্ত উদ্‌বেগ সরিয়ে দিয়েছি....উঁকি-ঝুঁকি দেবারও উপায় নেই আর ; নিজেও উদ্‌বিগ্ন হই না, অপরেবও উদ্‌বেগ নেই। সকলের নিশ্চিন্ততার মধ্যে আরামে দিন কাটে। এখন আর সেই চিল-কোঠাব অতিথি নয়—সুসানার খাস-কামরায় আস্তানা আমার!

ইদরীশ সকালে চা আনে।

চা তৈবী করে সুসানা। তার পবে প্রাতরাশ আর চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে

—ভাল আছ তো?

মন্দ থাকার পথই বা কোথায়? তাই বলি

—ভালই তো আছি!

খুশী হয় সুসানা।

বাঁধা-ধবা, মাপা-জোখা সময়ে স্নান আহার আর বিশ্রাম। অনিয়মের ফাঁক নেই, ফাঁকি দেবাব উপায়ও নেই! সুসানাব লালন-স্নিগ্ধ পবিচর্যায় দিন কাটে।

কদিনের মধ্যে বাইবের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে বিলকুল আত্মকেন্দ্রিক করে নিয়েছি! পাকা-পোক্ত ঘরোয়া জীবন; কোনো অপচয় নেই, অনিয়ম নেই, নিজেব উদ্‌বেগ নেই, অপরেরও উৎকণ্ঠা নেই!

এই তো আদালত থেকে ফেরার পথে মেহেবুব আলি দেখে গেলেন আমাকে। তিনি বললেন

—কড়া নজরের পরিচর্যাই দবকার, নইলে ভাঙা শরীর জোড়া লাগা শক্ত!

আমি ম্লান হেসে জবাব দিলাম

—নিবিবাদে তাই তো করছি!

ঠোঁটের কোণে চতুর হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল মেহেবুব আলির তিনি বললেন

—ক্ষতি কি ? ভালই তো আছেন !

কথা ঘুরিয়ে আমি বললাম

—সেই জবানবন্দির কাগজগুলো দেখে আজই ফেরত পাঠাব, আর আমার মতামতও জানিয়ে দেব সেই সংগে।

মেহেবুব আলি বললেন

—না পারলে ক্ষতি নেই। কালকেই আপীল রুজু করে দিচ্ছি ; মোসাবিদা তৈরী হয়ে গেছে।

সুসানা ঘরে এল। এ-কদিনে নিশ্চয় সে আঁচ করে নিয়েছে এ-গণ্ডগোলের উৎস কোথায়···জানলেও ক্ষতি নেই আর !

অভিবাদন জানিয়ে মেহেবুব আলি বিদায় নিলেন, যাবার আগে বললেন

—আল্লার কাছে দোয়া চাইব আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে মিস্টার চ্যাটার্জি

মেহেবুব আলি চলে গেলে সুসানা কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু ভাবে সে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

আমি বললাম

—মোসাবিদা আর আপীল, এরও ওপরে দোয়া চাইবেন আমার জন্যে আল্লার কাছে···মানুষ ভাল আমাদের আলি সাহেব !

সুসানা কিন্তু কথা কইলে না, আর আমিও কথা বাড়তে না দিয়ে বললাম

—সেই কাগজের মোড়কটা এনে দিও তো সুসানা, এই ফাঁকে ও কাজটা চুকিয়ে ফেলি !

সে অন্যমনস্ক হয়ে বললে

—অনেক কথা লুকিয়ে রাখ তুমি ! তাতে নিজেও কষ্ট পাও, আর আমাকেও কষ্ট দাও।

আমি বললাম

—সে কথা ঠিক!

—কোন কথা?

—কত কথাই তো গোপন করতে হয় জীবনে…কারণ থাকুক আর নাই থাকুক! মানুষের প্রবৃত্তিই এ কাজ করায়!

আরো সংকুচিত হয়ে সে বললে

—এখনও ফাঁকি দিতে চাও!

—কাকে?

—নিজেকে আর সেই সংগে আমাকেও!

আমি হাসতে হাসতে বললাম

—বিলকুল ভুল! কাগজটা তুমিই পড় না কেন? আমি দিব্যি শুয়ে শুয়ে বদরিকার মারপ্যাঁচের ফলাফলগুলো শুনতে থাকি!

—কে এই বদরিকা?

—কেন, সেই দ্বোয়ারকা প্রসাদের আত্মীয়।

—তোমার সংগে কিসের যোগাযোগ?

—যোগাযোগ? হীরাজুলি এস্‌টেটের মামলা নিয়ে।

—কার সম্পত্তি এই হীরাজুলি?

—এক সাহেবের।

—তুমি জড়ালে কি করে এতে?

—মামলার খাতে বদরিকাকে টাকা যুগিয়ে।

—আর কোনো সম্পর্ক নেই তার সংগে?

—আছে বৈ কি!

—কি সম্পর্ক?

—জুটিবেঁধে উসমানির বাড়ীতে পাশা খেলে ভাগ্য যাচাই করা…

সুসানা শক্ত হয়ে তাকাল, তার পরে বললে

—ঠাট্টা নয় অমিতাভ!

আমি বললাম

—কে ঠাট্টা করছে? ওই কাগজের মোড়কটায় এর সব ইতিহাসই লেখা আছে; পড়লেই জানতে পারবে।

দেওয়াল-আলমারি খুলে জবানবন্দির নকল এনে সুসানা পড়তে বসল। কাগজের ভাঁজ খুলে সে বললে

—একি? এ যে মিস্টার ম্যালকমের জবানবন্দি! বদরিকার জবানবন্দি কই?

আমি বললাম

—ওতেই বদরিকার সব কেরামতি লেখা আছে, পড়লেই জানতে পারবে।

সুসানা পড়তে আরম্ভ করলে

"আমি আর্থার অমিট্ ম্যালকম, পরলোকগত মিস্টার হেন্‌রি আর্থার ম্যালকমের একমাত্র ওয়ারিশ।

"ডুন স্কুলে বাল্য-শিক্ষা পাবার পরে উচ্চ-শিক্ষার জন্যে আমি ইংলণ্ডে যাই এবং সেই সূত্রে দশ বৎসর কাল ইংলণ্ডে কাটাই।

"হীরাজুলি এস্‌টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসে থাকা কালীন বর্তমান গোলযোগের সূচনা ঘটে। পরে মিস্টার স্মিথের ম্যানেজারির আমলে এবং তাঁর কাজের বিচ্যুতির জন্যে নানা গোলযোগের প্রকাশ হয় এবং পরিশেষে তা এই মামলায় পরিণতি পেয়েছে।

"কৌঁশুলি মহোদয় আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এবং তার ধারাবাহিকতার প্রসংগ উত্থাপন করায় আমি বলি যে, পরলোকগত মিস্টার হেন্‌রি আর্থার ম্যালকম আমার প্রতিপালক পিতা, আমি তাঁর সন্তান নই। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, খৃষ্টীয় আইনে আমি তাঁর পুত্রের অধিকারে বঞ্চিত নই; এবং সে অধিকার আমার আইন-সংগত!

"মায়ের কাছে যে কথা জানার সুযোগ হয়েছিল, তা থেকে আমি জ্ঞাত হই যে, আমার স্বাভাবিক পিতা হিন্দু; এবং আমার উদ্ভব হিন্দু সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। খৃষ্টমতে বিবাহের পূর্বে আমার মায়ের পরিচয় ছিল হেমাঙ্গিনী চক্রবর্তী। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ ও খৃষ্ট মতে বিবাহের পরে তিনি জুলিয়া হেমাঙ্গিনী ম্যালকম নামে পরিচিতা থাকেন।

"তিনি স্বেচ্ছায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। আমার জন্মের সূচনা

এবং সমাজভীতি যদিও ধর্মান্তর গ্রহণের মুখ্য কারণ, তবু একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, পরবর্তী জীবনে তিনি করুণাময় খৃষ্টের কৃপায় প্রভূত শান্তি পেয়েছিলেন।

"উনিশ শো বাইশ সালের বিশে জুন তারিখে খৃষ্টচরণে লীন হওয়ার পরে, এই সহরের ঘাট বাজার কবর খানায় তাঁর অন্ত্যেষ্টি যথা বিহিত সম্পন্ন হয়।

"পরবর্তী জীবনে পরলোকগত মিস্টার ম্যালকম—"

ক্ষিপ্রগতিতে উঠে জবানবন্দির কাগজ সমেত সুসানার হাত চেপে তাকে বাধা দিয়ে, বললাম

—বন্ধ কর। ও জবানবন্দি পড়ার কোনো দরকার নেই আর।

জবানবন্দির কথাগুলো আমাব কানে যেন গরম শীসে ঢেলে দিয়েছে।

এই আকস্মিক অসংলগ্নতায় সিঁটিয়ে উঠল সুসানা; ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করলে

—আবার তোমার শবীর খাবাপ হল নাকি?

আমি বললাম

—না, ইদরীশকে ডেকে পাঠাও এখুনি।

আরো ভীত হয়ে সে জিজ্ঞেস করলে

—কেন?

আমি বললাম

—জবানবন্দি এখুনি ফেরত পাঠাতে হবে মেহেবুব আলির কাছে। তাঁকে খবর দিতে হবে, আপীল আর রুজু করা হবে না। চুক্তি ভাঙার জন্যে বদরিকাকেই আগে নোটিশ দেওয়া দরকার!

সে অবাক হয়ে তাকাল; হয়তো বোঝবার চেষ্টা করলে আকস্মিক এই মত পরিবর্তনের কারণ কি? কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ ভাবে সে বললে

—তাই ভাল! অকারণে পরের মামলায় নিজেকে জড়িয়ে কোনো লাভ নেই!

আমি বললাম

—এস্‌রারকেও দরকার ; গাড়ী ডাকাতে হবে এখুনি।

এবার সত্যি সত্যি উৎকণ্ঠিত হল সুসানা, বললে

—এই শরীর নিয়ে কোথায় বেরোবে তুমি ?

আমার ব্যবহারে কোনো মাত্রা খুঁজে না পেয়ে সে শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম

—ষাট বাজার কবরখানায় যেতে হবে আমাকে।

চিন্তিত হয়ে সে আরো কাছে এগিয়ে এল ; কপালে হাত রেখে দেহের তাপ দেখলে, তাব পবে বললে

—না, জ্বর নেই। এমনিই তোমাকে কাহিল দেখাচ্ছে অমিতাভ !

সে ভাষাহীন চোখে তাকিয়ে রইল ; বোধ হয় বুঝে নিতে চাইলে, হঠাৎ কি অঘটন ঘটে গেল—কে এই আর্থার অমিট্ ম্যালকম আর কে-ই বা তার মা হেমাঙ্গিনী ?

তার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম

—ও দৃষ্টির অর্থ জানি সুসানা !

সে নিস্তেজ গলায় জিজ্ঞেস করলে

—কি ?

—আমাকে আর চোখের আড়াল করতে চাও না, ঠিক বলি নি ?

তার চোখে জল-কণা জমে উঠেছিল, তার ভেজা চোখের দিকে চেয়ে আমি বললাম

—এই তো তোমার চোখের সামনেই রয়েছি ··আর বাকী দিন-গুলোও তাই থাকব !

সে নত মুখে বসে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিলে ; কথা বলার শক্তি নেই আর, উদ্‌গত কান্নায় তার গলা বুজে এসেছে।

তার চোখের ওপর থেকে তাই নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম।

[illegible] খোলা জানলার পরদার ফাঁকে এক টুকরো আকাশ দেখা গেল, অনন্ত সৃষ্টি জোড়া আকাশের একটি টুকরো মাত্র ! ওই সামান্য খণ্ডটুকুই যেন বিরাট ব্যাপ্তির অনন্ত গভীরতার ইংগিত ধরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

মনের ভেতর [illegible] তখনও ধ্বনিত হচ্ছে, জুলিয়া হেমাঙ্গিনী ম্যালকম, জুলিয়া হেমাঙ্গিনী ম্যালকম !